হাদীস শরীফ
১ম খণ্ড
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

লেখকের আরয

আমার সংকলিত 'হাদীস শরীফ' নামক গ্রন্থমালা বিরাট পরিকল্পনার ফসল। ব্যবহারিক জীবনে হাদীস অনুসরণ সহজসাধ্য করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বিশাল হাদীস সমুদ্র হইতে প্রয়োজনীয় সহীহ হাদীসসমূহ তালাশ করিয়া বাহির করা এবং উহার তরজমা ও জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা প্রদান এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। মূলত ইহা হাদীসের এক নবতর সংকলন। ইহার প্রথম খণ্ড (১ম ও ২য় ভাগ) সর্ব প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৬৪-৬৭ সময়ে। পরে ১৯১৭৫ সনে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডও (১ম ও ২য় ভাগ) প্রকাশিত হয়।

'হাদীস' ইসলামী সংস্কৃতি ও কর্মবিধানের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। হাদীস অধ্যয়ন যেমন ইসলামী আমল ও নৈতিকতা গ্রহণে প্রেরণাদায়ক, তেমনি ইহার মাধ্যমে ইসলামী সংবিধানের সহিত সরাসরি পরিচয় লাভ সম্ভব। এই কারণে কুরআনের পরে হাদীসের মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। হাদীসের সাহায্য না হইলে যেমন কুরআনের নির্ভুল ও সঠিক তাৎপর্য লাভ করা সম্ভব নয়, তেমনি ইসলামী জীবন-বিধানও সক্ষম হয় না সম্পূর্ণতা অর্জন করিতে। এই কারণে কুরআনের বাংলা তাফসীর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসের ব্যবহারিক ব্যাখ্যাও ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে একান্তই অপরিহার্য। ব্যাখ্যাসহ সহীহ্ হাদীস সংকলন প্রকাশের মূলে ইহাই আমার মনের প্রেরণা ও তাকীদ। ইহা হইতে কেহ সামান্য উপকৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

যে খালেস নিয়্যতে আমি হাদীসসমূহের সংগ্রহ, বিন্যস্ত, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, আশা করি, পাঠকগণ সেইরূপ আন্তরিকতা সহকারে তাহা পাঠ করিবেন। বিশেষ করিয়া যাহারা উস্তাদের নিকট হইতে হাদীস শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, দ্বীন ইসলামে কুরআন মজীদের পরে-পরে ও সঙ্গে-সঙ্গেই অত্যন্ত জরুরী হাদীস শিখিবার সুযোগ এই গ্রন্থপাঠে লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমি আশা রাখি।

লেখক

প্রসঙ্গ কথা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অবয়ব নির্মাণে হাদীস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। কুরআনী নির্দেশাবলীর মর্মার্থ অনুধাবন এবং বাস্তব জীবনে উহার যথার্থ অনুশীলনে হাদীসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। এ কারণেই যুগে যুগে দেশ-দেশে হাদীসের সংকলন, অনুবাদ ও বিশ্লেষণের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সময়ের চাহিদা মোতাবেক হাদীসের বিন্যাস ও ভাষ্য রচনার দুরূহ কাজও অনেক মনীষী সম্পাদন করিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় হাদীসের কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ হইলেও উহার যুগোপযোগী বিন্যাস ও ভাষ্য রচনার কাজটি প্রায় উপেক্ষিতই ছিল দীর্ঘকাল যাবত। ফলে এতদাঞ্চলের সাধারণ দ্বীনদার লোকেরা এসব অনুবাদ পড়িয়া খুব বেশি উপকৃত হইতে পারিতেন না; উহা হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লাভও অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হইতনা। সৌভাগ্যক্রমে, একালের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) সুদীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বৎসরব্যাপী অশেষ সাধনাবলে 'হাদীস শরীফ' নামক গ্রন্থমালা প্রণয়ন করিয়া বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের দীর্ঘকালের এক বিরাট অভাব পূরণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে তিনি হাদীসের বিশাল ভান্ডার হইতে অতি প্রয়োজনীয় হাদীসসমূহ চয়ন করিয়া একটি নির্দিষ্ট ধারাক্রম অনুসারে সাজাইয়া দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আগাগোড়াই তিনি ইসলামের মৌল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আধুনিক মন-মানসের চাহিদার প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ইহাতে সন্নিবিষ্ট হাদীসসমূহের তিনি শুধু প্রাঞ্জল অনুবাদ ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং ইহার আলোকে প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধানগুলিও অতি চমৎকারভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই দিক দিয়া তিনি একই সঙ্গে মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ উভয়ের দায়িত্বই অতি নিপুনভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন।

'হাদীস শরীফ' নামক এই গ্রন্থমালার প্রণয়নের কাজ তিনি শুরু করিয়াছিলেন ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। ইহার প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে আইয়ুব শাহীর কারাগারে তাঁহার অবস্থানকালে আর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। অতঃপর বিগত দুই যুগে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা হইতে ইহার পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একইভাবে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডও প্রথমত ঃ দুই ভাগে এবং পরে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা হইতে। এক্ষণে 'খায়রুন প্রকাশনী' ইহার তৃতীয় খণ্ডসহ গ্রন্থটির সকল খন্ডের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

বর্তমানে কাগজ-কালির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির দরুণ মুদ্রণ ব্যয় বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশক গ্রন্থটির মূল্য যথাসম্ভব যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য গ্রন্থের কলেবর সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়া ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে অন্যদিকে, ইহার মুদ্রণ পারিপাট্য পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থের এই সংস্করণটি পাঠকদের নিকট অধিকতর সমাদৃত হইবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রন্থকারের এই দ্বীনী খিদমত কবুল করুন এবং তাঁহাকে জান্নাতুল ফিরদৌসে স্থান দিন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

নভেম্বর ১৯৯১ ইং

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
সেক্রেটারী
মওলানা আবদুর রহীম (রহ) ফাউন্ডেশন

সূচী পত্র

হাদীস শরীফ

প্রথম খণ্ড

কুরআন ও হাদীস পাঠ করে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সরাসরি
জ্ঞান অন্বেষণকারীদের হাতে

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِیْ فَحَفِظَهَا اَوْ وَعَاهَا وَ اَدَّهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلُ فِقْهٍ اِلٰی مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ - (ابوداؤد)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই লোকের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত করিবেন, চির সবুজ চির তাজা করিয়া রাখিবেন, যে আমার কথা শুনিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিবে কিংবা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখিবে এবং অপর লোকের নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবে। জ্ঞানের বহু ধারকই প্রকৃত জ্ঞানী নহে, তবে জ্ঞানের বহু ধারক উহা এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইয়া দেয় যে তাহার অপেক্ষা অধিক সমঝদার। — আবূ দাঊদ

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ (ترمذی)

আল্লাহ তা'আলা ধন্য করিবেন সেই ব্যক্তিকে, যে আমার নিকট হইতে কোন কিছু শুনিল এবং উহা যেভাবে শুনিল সেই ভাবেই অন্য লোকের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। কেননা প্রথম শ্রোতার অপেক্ষা উহা পরে যাহার নিকট পৌঁছায় সে-ই উহার সংরক্ষণকারী হইয়া থাকে। — তিরমিযী

নিয়্যতের গুরুত্ব

عَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رض قَالَ سمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ الٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا فَهِجْرَتُهُ الٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ – (بخارى ج -١- ص-١)

وَزَادَ مُسْلِمٌ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰه وَرَسُوْلِهِ – (مسلم٢ - باب قول صلعم انما الاعمال بالنيات - كتاب الامارة)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি হযরত রাসূলে করীম (স) কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত কাজ-কর্মই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তাহাই হইবে, যাহার সে নিয়্যত করিয়াছে। অতএব, যাহার হিজরত হইবে দুনিয়া লাভের দিকে কিংবা কোন মেয়েলোকের জন্য তাহাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তাহার হিজরত সেই দিকেই (গণ্য) হইবে, যাহার দিকে সে হিজরত করিয়াছে। — বুখারী

মুসলিম শরীফে فمن كانت هجرته 'যাহার হিজরত হইবে' এর পর অন্য একটি বাক্য অতিরিক্ত উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহা হইতেছে ঃ "অতএব যাহার হিজরত হইবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে, তাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকেই (গণ্য) হইবে।"

হাদীসটির পরিচয়

উপরে বুখারী বর্ণিত (শব্দ ও ভাষায়) হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা সহীহ বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস। মুসলিম শরীফের ২য় খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ-এ উপরিউক্ত অতিরিক্ত বাক্যটি সহ হাদীসটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। আবূ দাউদ 'তালাক' অধ্যায়ে, তিরমিযীর আবওয়াবুল হুদুদ- এ, নাসায়ীর ঈমান, তাহারাত, ইতাক ও তালাক অধ্যায়ে, ইবনে মাজাহর জুহ্দ অধ্যায়ে এই হাদীসটি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুসনাদে আহমদ, দারেকুতনী, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখও হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায় ইমাম মালিক সংকলিত 'মুয়াত্তা' ব্যতীত অপরাপর সব কয়খানি হাদীস গ্রন্থেই ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

—১/২

এই হাদীসটি 'মুতাওয়াতি'র বলিয়া অনেকেরই ধারণা; কিন্তু তাহা সত্য নয়। কেননা ইহা নবী করীম (স) হইতে হযরত উমর (রা) ছাড়া অপর কোন সাহাবীই বর্ণনা করেন নাই। তবে তাহা না হইলেও উহা এক আশ্চর্যজনকভাবে প্রসদ্ধি ও সর্বজনজ্ঞাত হাদীস।

বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত এই হাদীসটির শব্দের কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের বাক্য পাওয়া যায়। বুখারী শরীফেই এই হাদীসটি সাত স্থানে শব্দের সামান্য পার্থক্য সহকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ এবং اَلْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ
اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ - اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

কোথাও আবার اِنَّ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে শব্দের এই পার্থক্য সত্ত্বেও হাদীসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোনই পার্থক্য নাই।

হাদীসটির কেন্দ্রীয় বিষয় হইতেছে নিয়্যত। 'নিয়্যত' শব্দের অর্থ বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে করিয়াছেন। এখানে কয়েকজনের উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

'নিয়্যত' শব্দের আভিধানিক অর্থ القصد والارادة —ইচ্ছা, স্পৃহা, মনের দৃঢ় সংকল্প। শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহার অর্থ ঃ

تَوَجُّهُ الْقَلْبِ جِهَةَ الْفِعْلِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَامْتِثَالاً لاَمْرِهِ -
(الفتح الربانى ج - ٢ ص ١٧)

আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ ও তাঁহার আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার দিকে হৃদয় মনের লক্ষ্য আরোপ ও উদ্যোগ।

ইমাম খাত্তাবী বলিয়াছেন ঃ

هُوَ قَصْدُكَ الشَّيْءَ بِقَلْبِكَ وَتَحَرِّىُ الطَّلَبِ مِنْكَ لَهُ -

তোমার মনের দ্বারা কোন জিনিসের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা এবং নিজের দ্বারা উহার বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া।

বায়যাভী বলিয়াছেন ঃ

اَلنِّيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ انْبِعَاثِ الْقَلْبِ نُحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَا فِقًا لِغَرْضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ اَوْ دَفْعِ ضَرَّحَالاً اَوْمَالاً -

বর্তমান কি ভবিষ্যতের কোন উপকার লাভ, কি কোন ক্ষতির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অনুকূল কাজ করার জন্যে মনের উদ্যোগ উদ্বোধনকেই বলা হয় নিয়্যত।[১]

হাদীসটির একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ও উপলক্ষ্য রহিয়াছে। নবী করীম (স) মক্কা হইতে মদীনা হিজরত করিবার পর চতুর্দিকের সকল মুসলিমকে হিজরত করিয়া মদীনায় উপস্থিত

১. عمدة القارى - ج ١ - ص ٦٣

হইবার জন্য নির্দেশ দেন। তখন কিছু লোক হিজরত করা হইতে বিরত থাকে। কিন্তু মুখলেস ঈমানদার লোকগণ চারিদিক হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় উপস্থিত হন। তন্মধ্যে একজন লোক এক মহিলা মুহাজিরকে বিবাহ করার নিয়্যতে মদীনায় হিজরত করেন। এই মহিলাটির নাম 'উম্মে কায়স' কিংবা 'কাইলা'। এই হিজরতকারীর মক্কা হইতে মদীনায় উপস্থিত হওয়ার মূলে উক্ত মহিলাকে বিবাহ করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। হিজরতের ব্যাপারে রাসূলের নির্দেশ পালন ও সওয়াব লাভ করিবার দিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তখন নবী করীম (স) এই হাদীসটি বলেন। ঠিক এই কারণেই হাদীসটিতে কোন নারীকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীসটির গুরুত্ব

এই হাদীসটি ইসলামে এইকটি মূল ফর্মূলা হিসাবে গণ্য। কোন কোন লোকের মতে ইসলাম সম্পর্কিত ইলম-এ ইহার গুরুত্ব এক-তৃতীয়াংশ। কেননা বান্দাহর সমস্ত কাজ যদিও তাহার অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মুখ দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু তবুও 'অন্তর' দ্বারা সম্পাদিত কাজ তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য। কেবলমাত্র নিয়্যত বা অন্তরের কাজ দ্বারাই 'ইবাদত' সম্পন্ন হয়। কিন্তু অপর দুইটির কোন একটি দ্বারাও এককভাবে কোন কাজ হয় না।[১]

এই হাদীস হইতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের সমস্ত কাজেই নিয়্যত এক শর্ত বিশেষ, উহা ছাড়া কোন কাজ করিলেও তাহা গণ্য হইতে পার না।[২]

আল্লামা খাত্তাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ 'সকল কাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল'— এই কথার অর্থ এই যে, সমস্ত কাজের বিশুদ্ধতা এবং উহার ফল লাভ নিয়্যত অনুযায়ীই হইয়া থাকে। কেননা নিয়্যতই মানুষের কাজের দিক নির্ণয় করে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, নিয়্যত ছাড়া মূল কাজটিই অসম্পাদিত থাকিয়া যায়। কেননা কাজ তো করিলেই হয়— নিয়্যত না করিলেও উহা সঙ্ঘটিত হয়।[৩]

ব্যাখ্যা সকল প্রকার কাজ-কর্মের ভাল ও মন্দ এবং গ্রহণযোগ্য ও গ্রহণ-অযোগ্য হওয়া একমাত্র নিয়্যতের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল— এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলাই এই হাদীসের মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ যে কাজ সৎ নিয়্যতে ও সৎ উদ্দেশ্যে করা হইবে তাহাই সৎ কাজরূপে গণ্য হইবে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে একমাত্র উহাই মূল্য ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু কোন ভাল কাজও যদি খারাপ উদ্দেশ্যে দুষ্ট নিয়্যতে করা হয়, তবে তাহা কখনও ভাল কাজরূপে গণ্য হইবে না ও আল্লাহ্‌র নিকট তাহা গৃহীতও হইবে না— বাহ্যদৃষ্টিতে তাহা যত ভাল ও সৎকাজ বলিয়া মনে হউক না কেন।

মোটকথা আল্লাহ তা'আলা কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিয়্যতের এবং আঙ্গিকের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকতারও বাস্তব প্রমাণ পাইতে চান। তাঁহার নিকট প্রত্যেক কাজের নিয়্যত অনুযায়ী উহার হিসাব ও ওজন হইয়া থাকে এবং সেই অনুসারেই উহার ফল দান করা হয়।

---

১. نیل الاوطار ج ١ - ض ١٢٦
২. فتح الربانی ج ٦ - ص ١٩
৩. معالم السنن ج ٣ - ص ٢٤٤

একটি সন্দেহের অপনোদন

নিয়্যত দৃষ্টেই যখন কাজের মূল্য হয়, তখন ভাল নিয়্যতে খারাপ কাজ করা হইলে তাহাও ভাল কাজরূপে গণ্য হওয়া উচিত এবং তাহাতেও সওয়াব লাভ হওয়া উচিত বলিয়া কাহারও মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এবং কাহারও মনে এই ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, চুরি কিংবা ডাকাতি করিয়া লব্ধ সম্পদ দ্বারা গরীব-মিসকীন লোকদের সাহায্য বা অন্য কোন ভাল কাজ করিলে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সওয়াব পাওয়া যাইবে।

আসল কথা এই যে, যে কাজ মূলত খারাপ, যে কাজ আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে ভাল নিয়্যতের তো কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। কারণ তাহা তো মূলতই খারাপ এবং পাপের কাজ। এমতাবস্থায় উহার সহিত সৎ উদ্দেশ্য যোগ করা এবং তাহা হইতে সওয়াবের আশা করাই বরং অধিকতর অন্যায় ও পাপের কাজ। কেননা এইরূপ করিলে তাহাতে আল্লাহ্র দ্বীনের সহিত তামাশা ও বিদ্রূপ করা হয়। হাদীস হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ভাল কাজ যদি খারাপ নিয়্যতে করা হয়, তবে তাহা আর 'সৎ কাজ' থাকিবে না; বরং খারাপ নিয়্যতের কারণে উহার পরিণাম ফলও অত্যন্ত খারাপ হইবে। যেমন, এক ব্যক্তি খুব বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতা সহকারে নামায পড়ে। এইরূপ নামাযের দ্বারা তাহার নিয়্যত যদি লোকদের উপর নিজের তাকওয়া, পরহেযগারী ও ধার্মিকতার প্রভাব বিস্তার করা এবং এই সবের মধ্য দিয়া লোকদের নিকট হইতে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সুনাম অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়, তবে এই হাধক্কসের দৃষ্টিতে তাহার এই কাজের কোন মূল্যই আল্লাহ্র নিকট হইবে না।

অথবা কোন ব্যক্তি যদি কাফির দেশ হইতে ইসলামের দেশে হিজরত করিয়া আসে এবং এই হিজরত ব্যপদেশে সে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ঠ ভোগ করে; কিন্তু তাহার এই সবকিছুর মূলে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভই যদি তাহার উদ্দেশ্য না হয়, বরং কোন বৈষয়িক স্বার্থ লাভ কিংবা ইসলামী রাজ্যের কোন নারীর সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করাই যদি হয় তাহার এই হিজরতের মূল কারণ, তবে ইহা ইসলামী হিজরত হইবে না এবং আল্লাহ্র নিকটও ইহার কোন মূল্য হওয়া সম্ভব নয়। বরং ইহার দরুন তাহার অধিক গুনাহ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই জন্যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র বিচারে বহু 'শহীদ' ব্যক্তিও সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া জাহান্নামে যাইতে বাধ্য হইবে এবং বহু 'আলেম' আলেম নামে অভিহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্বীনী ইল্‌ম শিখিয়াছে বলিয়া আল্লাহ্র নিকট অভিযুক্ত হইতে বাধ্য হইবে।

বস্তুত যে দুনিয়ায় আমরা বর্তমানে বাস করিতেছি তাহা প্রাকৃতিক দুনিয়া, বাহ্যিক ও দৃষ্টিগোচর দুনিয়া। আমাদের অনুভূতি তথা পঞ্চেন্দ্রিয় ইহার শুধু বহির্ভাগকে আয়ত্ত করিতে পারে। অর্থাৎ এখানে আমরা প্রত্যেকটি মানুষের শুধু বাহ্যিক চালচলন দেখিয়াই তাহার সম্পর্কে ভাল কিংবা মন্দ ধারণা করিয়া লইতে পারি এবং উহারই ভিত্তিতে আমরা এক একজনের সহিত ব্যবহার ও লেনদেন করিতে পারি। বাহ্যিক কাজের অন্তরালে মানুষের কি নিয়্যত ও মনোভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা সহজে জানিতেও পারি না আর সেই সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতেও পারি না। এই জন্যই হযরত উমর ফারূক (রা) বলিয়াছেন ঃ

কেবল বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টেই কোন মত প্রকাশ করার আমাদের ক্ষমতা আছে কিন্তু উহার অন্তরালে যে গোপন রহস্য রহিয়াছে তাহা একমাত্র আল্লাহ্‌রই নিকট সোপর্দ।

কিন্তু পরকালের একমাত্র বিচারক আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাজের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে বিচার করিবেন না। তিনি সকলের নিয়্যত, সকলের সঠিক মনোভাব প্রত্যক্ষ ও নির্ভুলভাবে জানেন এবং প্রত্যেকের আমলনামায় তাহা প্রতিফলিত থাকিবে বলিয়া উহারই ভিত্তিতে প্রত্যেকের কাজের বিচার করিবেন ও প্রতিফল দিবেন।

হাদীসটির বিশেষত্ব

নবী করীম (স) খুব সংক্ষেপে অল্প শব্দে এবং ব্যাপক অর্থ ও ভাববোধক যত মূল্যবান বাণীই বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসটি উহার অন্যতম। ইহাকে 'ছোট্ট ঘটিতে সমুদ্র' সংকুলান হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। কোন কোন হাদীস পারদর্শী বলিয়াছেন ঃ ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ এই হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। আর এই কথা যে সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা নীতিগতভাবে ইসলামের তিনটি প্রধান বিভাগ রহিয়াছে। প্রথম— ঈমান অর্থাৎ আকীদা ও মতবাদ, দ্বিতীয়— কাজ-কর্ম ও তৃতীয়— নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থতা। এই হাদীসে যেহেতু নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থতা সম্পর্কে কথা বলা হইয়াছে, এই জন্য ইহাতে ইসলামের এক-তৃতীয়াংশের উল্লেখ হইয়াছে বলা খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

উপরন্তু নিষ্ঠার প্রয়োজন হইতেছে প্রত্যেক কাজে; বিশেষত কোন বান্দাহ যখন কোন কাজ শুরু করে, তখনই তাহাকে রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসের কথা স্মরণ করিতে হইবে, এই জন্যই বিশেষ হাদীস গ্রন্থসমূহের শুরুতেই এই হাদীসের উল্লেখ দেখা যায়।

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ - قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرٰكَ - قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ - قَالَ مَاالْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ - قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ يَاعُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرَئِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - (مسلم)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমরা এক দিন নবী করীম (স)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। [এই হাদীসেরই অপর এক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তখন এই মজলিসে বহু সংখ্যক সাহাবী উপবিষ্ট ছিলেন এবং নবী করীম (স) তাহাদেরকে কিছু বলিতেছিলেন]। সহসা এক ব্যক্তি সম্মুখ দিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পোশাক অত্যন্ত সাদা ও পরিচ্ছন্ন ছিল, মাথার চুল কুচকুচে কালো ছিল এবং দূরদেশ হইতে সফর করিয়া আসার কোন চিহ্নও তাহার উপর পরিস্ফুট ছিল না। (সেই জন্য তাহাকে দূরদেশের লোক বলিয়াও সন্দেহ করা যায় নাই)। অথচ আমাদের মধ্যে

কেহই এই নবাগতকে চিনিত না। (ফলে তাহাকে দূরদেশের লোক বলিয়াই মনে করা হইল)। এই ব্যক্তি উপবিষ্ট লোকদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া নবী করীম (স)-এর সম্মুখে আসিয়া দুই হাঁটু বিছাইয়া বসিল এবং নিজের দুই হাঁটু নবী করীম (স)-এর দুই হাঁটুর সহিত মিলাইয়া দিল ও নিজের দুই হাত নিজের দুই উরুর উপর রাখিল। অতঃপর সে বলিল ঃ হে মুহাম্মাদ (স)! বলুন, ইসলাম কাহাকে বলে ? উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেন ঃ ইসলাম (অর্থাৎ উহার স্তম্ভ হইতেছে) এই যে, (১) তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ— উপাস্য ও আনুগত্য করার যোগ্য নাই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁহার রাসূল (২) নামায কায়েম করিবে, (৩) যাকাত আদায় করিবে, (৪) রমযান মাসের রোযা রাখিবে এবং (৫) আল্লাহ্র ঘরের হজ্ব করার সামর্থ থাকিলে হজ্ব পালন করিবে। এই নবাগত প্রশ্নকারী হযরত (স)-এর উত্তর শুনিয়া বলিল ঃ আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত উমর (রা) বলেন ঃ এই নবাগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে ও উহার উত্তরকে সত্য ও ঠিক বলিয়া ঘোষণা করিতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিলাম। অতঃপর সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ঃ এখন বলুন, ঈমান কাহাকে বলে ? নবী করীম (স) উত্তরে বলিলেন ঃ ঈমান হইতেছে এই যে, তুমি আল্লাহ্কে, তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব, পয়গম্বর ও পরকালকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে ও সত্য বলিয়া মানিবে এবং প্রত্যেক ভাল-মন্দ সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্ধারণ (তকদীর)-কে সত্য জানিবে ও মানিবে। ইহা শুনিয়া নবাগত লোকটি বলিল ঃ আপনি ঠিক বলিয়াছেন। ইহার পর সে বলিল ঃ আমাকে বলিয়া দিন ইহসান কাহাকে বলে ? উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেন ঃ ইহসান বলা হয় এমনভাবে আল্লাহ্র বন্দেগী করাকে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ (এই কথা মনে জাগরূক রাখা)। সেই লোকটি বলিল ঃ কিয়ামত কবে হইবে সেই সম্পর্কে আমাকে বলুন। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ যাহার নিকট প্রশ্নটি করা হইয়াছে, সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নকারী অপেক্ষা অধিক কিছু জানে না। সে বলিলঃ আপনি উহার নিদর্শনসমূহ বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ (উহার একটি নিদর্শন এই যে) দাসী নিজের সম্রাজ্ঞী ও মনিবকে প্রসব করিবে। (দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে) তুমি দেখিতে পাইবে, যাহাদের পায়ের জুতা ও গায়ে কাপড় নাই, যাহারা শূন্যহাত ও ছাগলের রাখাল, তাহারা বড় বড় প্রাসাদ রচনা করিতেছে এবং এই কাজে তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। হযরত উমর (রা) এই সব কথা বলিবার পর এই নবাগত লোকটি চলিয়া গেল। ইহার পর আমি বসিয়া থাকিয়া কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিলাম। তাহার পর নবী করীম (স) আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে উমর! এই প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ছিল তাহাকি তুমি জান ? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই তাহা ভাল জানেন। নবী করীম (স) বলিলেন ঃ "এ ছিলেন জিবরাঈল। তিনি তোমাদিগকে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তোমাদের এই মজলিসে আসিয়াছিলেন।" — মুসলিম

ব্যাখ্যা ইহা একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। এই হাদীসটি "হাদীসে জিবরাঈল" নামে খ্যাত। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) আগন্তুক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার উত্তরে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। (১) ইসলাম (২) ঈমান (৩) ইহসান (৪) কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্কীকরণ যে, উহার নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও জানা নাই এবং (৫) কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশিতব্য বিশেষ নিদর্শনসমূহ। এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট হাদীসে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

এক, ইসলামঃ 'ইসলাম' শব্দের অর্থ নিজেকে কাহারও নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া ও সম্পূর্ণ রূপে তাহারই অধীন ও অনুগত হইয়া থাকা। আল্লাহ্‌র প্রেরিত 'দ্বীন'কে ইসলাম বলা হয়-এই জন্য যে, তদনুযায়ী মানুষকে নিজের সত্ত্বাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করিয়া দিতে হয়; আল্লাহ্‌র নিরংকুশ আনুগত্যকেই নিজেদের জীবনের আদর্শ ও পন্থারূপে গ্রহণ করিতে হয়। আর প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-ইসলামের মূল কথা ইহাই এবং ইসলাম আমাদের নিকট ইহারই দাবি করে মাত্র।

বলা হইয়াছে ঃ وَالٰهُكُمْ الٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا —তোমাদের আল্লাহ্ এক ও একক, অতএব তোমরা একমাত্র তাঁহারই অনুগত হও। ইসলাম সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ —যে ব্যক্তি নিজেকে এক আল্লাহর নিকট সোপর্দ করিয়া দিল ও পূর্ণ মুসলিম বান্দা হইল, তাহার অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি আর কে হইতে পারে! এই ইসলাম সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -ال عمران - ١٩ "জীবন যাপনের যে ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় তাহাই একমাত্র ইসলাম।" বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ –

যে ব্যক্তি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিবে তাহা তাহার নিকট হইতে কখনই গ্রহণ করা হইবে না, সে পরকালে ভয়ানকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আলে-ইমরান ঃ ৮৫

মোটকথা নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করা ও সর্বতোভাবে তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকা এবং তাঁহার দেওয়া আইন-বিধান পালন করাই হইতেছে ইসলামের মূল ও মর্মকথা।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মারফত আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে ইসলামের যে পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ বিধান আমাদের প্রতি নাযিল হইয়াছে তাহাতে (১) আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, (২) মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ রাসূল স্বীকার করা (৩) নামায (৪) রোযা ও (৫) কাবা ঘরের হজ্ব করা— এই পাঁচটি উহার স্তম্ভ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই পাঁচটি জিনিস— ইসলাম সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে যাহা পেশ করা হইয়াছে, তাহা ইসলামের প্রথম বাস্তব রূপ। আলোচ্য হাদীসে এই কথাটির দ্বারাই ইসলামের পরিচয় দান করা হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে এখানে অন্যরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে ঃ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَدِّقْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَسْلِمَ وَجْهَكَ لِلّٰهِ–

হে রাসূল (স)! আমাকে ইসলামের তত্ত্ব বলিয়া দিন। নবী করীম (স) বলিলেন ঃ ইসলাম হইতেছে এই যে, তুমি তোমার পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করিয়া দিবে, আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণ অনুগত করিয়া দিবে।

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত বাক্যাংশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যত আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম পালন করাই ইসলাম নয়, বরং নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহ্‌র নিকট

একান্তভাবে সোপর্দ করিয়া দেওয়াই হইতেছে ইসলাম। এই ইসলাম কবুল করিলে ব্যক্তির জান-প্রাণ ও ধনমাল সবকিছুই আল্লাহ্‌র মর্জির অধীন করিয়া দিতে হয়। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই ইসলামই কবুল করিতে বলা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ -

আমি নিজেকে সমগ্র জাহানের মালিক, প্রভু— আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণ সোপর্দ করিয়া দিয়াছি, মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছি, তাঁহার কেহই শরীক নাই।

দুই, **ঈমানঃ** 'ঈমান' শব্দের মূল অর্থ কাহারও প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া তাহার কোন কথাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া। দ্বীন-ইসলামের নিজস্ব পরিভাষা অনুযায়ী 'ঈমান' অর্থঃ আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যে জ্ঞান ও হেদায়েতের বাণী বিশ্ববাসীর নিকট পেশ করিয়াছেন তাহা সবই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা ও সর্বতোভাবে কবুল করা। বস্তুত শরীয়ত অনুযায়ী ঈমানের প্রকৃত সম্পর্ক হইতেছে সেই সব অদৃশ্য বিষয়ের সহিত যাহা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় বা অন্য যন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। এইসব দিক দিয়া নবীর প্রচারিত একটি কথারও অবিশ্বাস বা অমান্য করাকেই বলা হয় 'কুফর'।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান-এর অর্থ ফেরেশতাকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এক স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে বিশ্বাস করা। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিতে পারেন না। তাঁহারা আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করিতে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত থাকেন।

আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে এই কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ মানুষের জন্য বিভিন্ন সময়ে জীবন বিধান নাযিল করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বশেষ বিধান হইতেছে কুরআন মজীদ। এই কুরআন একাধারে পূর্ববর্তী যাবতীয় আসমানী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণ করে এবং উহাদের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ শাশ্বত বিষয়সমূহ নূতনভাবে জগতের সম্মুখে পেশ করে। পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থ বিকৃত ও বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র এই সর্বশেষ গ্রন্থ চিরসত্য হিসাবে অক্ষয় ও অবিকৃত হইয়া শেষ দিন পর্যন্ত মওজুদ থাকিবে।

আল্লাহ্‌র রাসূলগণের প্রতি ঈমানের অর্থ, এ সত্যকে মন-প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব মানবের নেতৃত্ব প্রদান ও মুক্তির পথে পরিচালনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থানে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান অনুযায়ী পূর্ণ দায়িত্ব ও আমানতদারী সহকারে জনসংগঠনের কাজ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে এই কথাও নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র সর্বশেষ প্রেরিত নবী ও রাসূল। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রাসূল-ই এই দুনিয়ায় আসিবেন না। অতএব ইহার পর সমগ্র মানুষের মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণ লাভ একমাত্র সর্বশেষ নবীর অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। পরকালের প্রতি ঈমানের অর্থ এই অকাট্য সত্যকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যে, এই বিশ্বভুবন একদিন না একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতার বলে এক নূতন জগত সৃষ্টি করিবেন এবং সমগ্র মৃত মানবকে পুনর্জীবিত করিবেন ও দুনিয়ার জীবনে যে যেরূপ কাজ করিয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেককে শাস্তি কিংবা পুরস্কার দান করিবেন।

বস্তুত দ্বীন ও ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার ভিত্তি এক হিসাবে পরকালীন শাস্তি বা পুরস্কার সম্পর্কীয় বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। কেননা ইহা বিশ্বাস না করিলে কোন মানুষই আল্লাহ্র বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে পারে না, অনুরূপভাবে চলিবার প্রয়োজনীয়তাও কেহ বোধ করিতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক ধর্মাদর্শেই পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে ভিত্তিগত বিশ্বাসের উপর অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তবে মানুষের মনগড়া ও স্বকল্পিত ধর্মে উহা নানাভাবে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে।

কদর বা তকদীর-এর প্রতি ঈমানের অর্থ এই কথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করা ও পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া যে, বিশ্বভুবনে যাহা কিছু হইতেছে— ভাল হউক বা মন্দ হউক— তাহা সবই আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী হইতেছে, তাঁহার অনুমতিক্রমে ও তাঁহার নির্ধারিত স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে হইতেছে এবং ইহার সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হইতেই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। সৃষ্টিলোকের এই বিরাট কারখানায় আল্লাহ্র মর্জির বিপরীত কিছু হইতে পারে না।

তিন, ইহ্সান ঃ ইসলাম ও ঈমানের পর ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ইহ্সান কাহাকে বলে অর্থাৎ ইহ্সানের প্রকৃত তত্ত্ব ও তাৎপর্য কি ? 'ইহসান'ও ঈমান এবং ইসলামের ন্যায় একটি বিশেষ কুরআনী পরিভাষা। বলা হইয়াছে ঃ

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰه وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّه – (البقرة - ١١٢)

হাঁ, যে ব্যক্তি নিজের পূর্ণ সত্ত্বাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করিয়া দিবে এবং সেই সঙ্গে ইহ্সান-এর মহান গুণাবলীতে ভূষিত হইবে, তাহার জন্য তাহার আল্লাহ্র নিকট বিশেষ পুরস্কার রহিয়াছে।

নবী করীম (স) আলোচ্য হাদীসে এই ইহ্সান-এর ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সর্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে হাজির-নাজির জানিয়া তাঁহার দাসত্ব করাকেই ইহ্সান বলা হয়। বলা বাহুল্য, ইহা কেবল নামাযের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং সমগ্র জীবন— জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই এইরূপ ভাবধারাসহ আল্লাহ্র দাস হইয়া জীবন যাপন করারই নাম 'ইহ্সান'।

চার, কিয়ামত ঃ ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সানের পর নবী করীম (স)কে জিজ্ঞাসা করা হইল 'কিয়ামত কবে হইবে ? নবী করীম (স) উত্তরে বলিলেন— জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারী অপেক্ষা এই সম্পর্কে অধিক কিছু জানে না।

পাঁচ, কিয়ামতের আলামত ঃ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম (স) দুইটি বিশেষ নিদর্শনের উল্লেখ করেন। প্রথম, দাসী তাহার নিজের মনিব বা মালকিনীকে প্রসব করিবে। দ্বিতীয়, নিঃস্ব, ভুখা, নাঙ্গা ও ছাগলের রাখালী করাই যাহাদের কাজ তাহারা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করিবে।

প্রথম নিদর্শনের ব্যাখ্যা হাদীস শাস্ত্র পারদর্শিগণ কয়েকভাবেই দিয়াছেন। তবে তন্মধ্যে এই অর্থটি অধিক গ্রহণযোগ্য হইতে পারে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হইলে পিতামাতার নাফরমানী ব্যাপক আকার ধারণ করিবে। এমন কি মেয়েরা— বাপ-মাদের সঠিক আনুগত্য ও আদেশ পালনের জন্য যাহারা সাধারণত সর্বাধিক প্রস্তুত বলিয়া মনে হয় ও যাহারা মা'দের বিরুদ্ধাচরণ খুব কমই করিয়া থাকে তাহারা পর্যন্ত— শুধু মা'দেরই নাফরমানী করিতে শুরু করিবে না;

বরং তাহারা মায়ের সহিত ঠিক তেমনি ব্যবহার করিবে যেমন সম্রাজ্ঞী তাহার চাকরাণী-দাসীদের সহিত ও মনিব তাহার চাকর-গোলামের সহিত করে।

এই জন্যই নবী করীম (স) বলিয়াছেন— "দাসী তাহার মনিব সম্রাজ্ঞীকে প্রসব করিবে।" অর্থাৎ নারীর গর্ভে যে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হইবে, সে বড় হইয়া তাহার সেই মায়ের উপরই নিজের হুকুমত ও কর্তৃত্ব চালাইবে এবং তাহার সহিত চাকরের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

দ্বিতীয় নিদর্শনস্বরূপ বলা হইয়াছে— "নিঃস্ব, ভুখা, নাঙ্গা ও রাখালরা উঁচু উঁচু প্রাসাদ রচনা করিবে।" অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী সময়ে পার্থিব ধন-সম্পদ, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সমাজের সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের হস্তগত হইবে, যাহারা প্রকৃতপক্ষে উহার যোগ্য নয়। তাহারা কেবল উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের দিকে বাহ্যিক বড়ত্ব ও চাকচিক্য প্রকাশের দিকে মনোনিবেশ করিবে। ইহাতেই উন্নতি নিহিত বলিয়া ধারণা করিবে। ফলে এই ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবে। ইহাকে কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে গণ্য করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কিয়ামত বিশ্ব নিখিলের চরম ও চূড়ান্ত বিপর্যয়ের নাম; আর নিম্ন শ্রেণীর অযোগ্য লোকদের হস্তে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য চলিয়া গেলে মানব সমাজের বিপর্যয় অনিবার্য। নীচু স্বভাব, হীন প্রকৃতি ও মূর্খ লোকদের মনে ধনমাল আয়ত্ত করার চিন্তা ছাড়া আর কিছুই জাগিতে পারে না। সকল সময় এই সব লোক নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে থাকে। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের পথে জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা প্রতিবন্ধক হইলে জাতীয় স্বার্থকেই তাহারা প্রত্যাখ্যান করিবে, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে একবিন্দু ক্ষুণ্ন হইতে দিবে না। ইহার অনিবার্য ফলে জনগণের অধিকার বিনষ্ট হইতে ও তাহাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা জাগ্রত হইতে শুরু করে। দ্বীনের শিক্ষা প্রচলিত ও কার্যকর না থাকার ফলে দ্বীনের প্রভাব দিনশেষের সূর্যরশ্মির ন্যায় ম্লান ও ক্ষীণ হইয়া আসে। মূর্খতা ও বর্বরতার অন্ধকার সমগ্র জগতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ইহাতে দ্বীন ও দুনিয়ার সবই নষ্ট হয়। দুনিয়ার অবস্থা যখন এইরূপ হইবে, বুঝিতে হইবে যে, দুনিয়ার চূড়ান্ত ধ্বংস কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী। ইহা হইতে এই কথাও জানা গেল যে, এই কার্যকারণের জগতের প্রত্যেকটি জিনিস কার্যকরণের সহিত জড়িত। কিয়ামতের কার্যকারণসমূহ পূর্ণমাত্রায় সংগৃহীত ও বাস্তবভাবে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতও সঙ্ঘটিত হইতে পারে না।

কোন কোন হাদীস হইতে জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর এই আগমন নবী করীম (স)-এর জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সাক্ষাতকার দ্বারা তেইশ বছরে অবতীর্ণ ইসলামের সারনির্যাস সকলের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কেননা প্রকৃত পক্ষে দ্বীন-ইসলামের মূল হইতেছে তিনটি কথা— একঃ বান্দা পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করিবে, তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবে, সর্বক্ষেত্রে তাঁহার দাসত্ব করাকে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে— ইহারই অপর নাম ইসলাম। ইসলামের 'স্তম্ভ'সমূহ মানুষকে ঠিক এই কাজের জন্যই তৈয়ার করে। দুইঃ আল্লাহ্‌র পয়গম্বরগণ যে সব গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য তত্ত্বকথা পেশ করিয়াছেন এবং যাহা মানিয়া লইবার দাওয়াত দিয়াছেন তাহা সবই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে ও মানিবে— ইহাকেই বলা হয় ঈমান। তিনঃ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ইসলাম ও ঈমানের অধ্যায় অতিক্রম করার পর তৃতীয়, শেষ ও পূর্ণ পরিণতির অধ্যায়ে আল্লাহ্‌কে এমনভাবে মনে করিতে পারা যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ট, সর্বদর্শী, বাহ্যিক কাজকর্ম ও গতি-প্রকৃতিই শুধু নয়, মানুষের মনে আভ্যন্তরীণ ভাবধারা সম্পর্কেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে
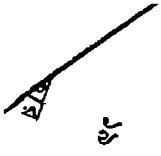
হার যাবতীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধ পালন করার জন্যে পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী পূর্ণজীবন যাপন করা— ইহাকেই বলা

২০। ঐ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - (بخارى - مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত করা হইয়াছে। প্রথম, এ মৌলিক সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহই মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁহার বান্দাহ ও রাসূল। দ্বিতীয়, নামায কায়েম করা, তৃতীয়, যাকাত দান করা, চতুর্থ, হজ্ব করা এবং পঞ্চম, রমযান মাসের রোযা রাখা। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসে নবী করীম (স) দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইসলামকে পাঁচটি স্তম্ভের ভিত্তিতে স্থাপিত এক প্রাসাদের সাথে তুলনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইসলামের এই প্রাসাদটি এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। কাজেই কোন মুসলমানই এই পাঁচটি মৌলিক কাজ যথাযথরূপে সম্পন্ন করা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা বা অবহেলা দেখাইতে পারে না। যদি দেখায়, তবে সে ইসলামের মূলকেই উৎপাটিত করে।

ইসলামের প্রথম কথা, আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য স্বীকার করা এবং সেই সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সর্বশেষ নবুয়তের প্রতি ঈমান আনা ও তাঁহার নিকট হইতে যে বিধি-বিধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা সর্বতোভাবে স্বীকার করা।

একজন মানুষ যখন আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়তকে স্বীকার করিয়া লয়, তখন সর্বপ্রথম দিনরাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাহার উপর পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার নামায পড়ার কর্তব্য আরোপিত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, এখানে নামায পড়ার কথা বলা হয় নাই। হাদীসে বলা হইয়াছে নামায কায়েম করার কথা। অর্থাৎ একজন লোক আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়া ব্যক্তিগতভাবে নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িয়াই দায়িত্ব এড়াইতে পারে না, বরং সমগ্র দেশ ও পরিবেশে নামাযের ন্যায় পবিত্র ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা কায়েম করা— কোন মুসলমানই যাহাতে নামায পড়া হইতে গাফিল থাকিতে না পারে এবং সমগ্র দেশ ও পরিবেশে নামাযের ন্যায় পবিত্র ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করাও তাহার একান্তই কর্তব্য হইয়া পড়ে। জামা'আতের সাথে নাময পড়ার গুরুত্বও ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

হাদীসে নামাযের পরই যাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ইসলামে নামাযের পরই যাকাতের স্থান ও গুরুত্ব। বস্তুত কুরআন মজীদ হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, ইসলামে নামাযের যতখানি গুরুত্ব, যাকাতের গুরুত্ব তাহা

হইতে বিন্দুমাত্র কম নয়। কুরআনে যে যে স্থানে নামাযের উল্লেখ করা হইয়াছে প্রায় সেই সেই স্থানে নামাযের পর পরই যাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, যাকাত ফরয হওয়ার পর যে ব্যক্তি তাহা সঠিকরূপে আদায় করিবে না, সে আল্লাহ্র কাছে ও মুসলিম সমাজে পূর্ণাঙ্গ 'মুসলমান' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যাকাত সম্পর্কে কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইহা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগতভাবে উহা আদায় করিলে চলিবে না; বরং ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত আদায় করিতে হইবে বায়তুলমাল বা সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। উপরন্তু ইসলামী সমাজে কোন মুসলমান যাকাত দিতে অস্বীকার করিলে ইসলামী রাষ্ট্র তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিতে বাধ্য। এই জন্যই নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর একদল লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করিলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স)-এর যুগে যে ব্যক্তি যাকাত বাবদ একটি ছাগলও দিত, আজ যদি সে তাহা দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিব। বস্তুত নামাযকে যদি বলা যায় শারীরিক ইবাদত, তবে যাকাতকে বলিতে হইবে ধন-সম্পদের ইবাদত। রোযা এবং হজ্জও অনুরূপভাবে শারীরিক ও সম্পদের ইবাদত। দ্বিতীয়ত নামায ও রোযা যদি খালেসভাবে আল্লাহ্রই 'হক' হইয়া থাকে তবে যাকাত ও হজ্ব বান্দাদের হক। আল্লাহ্র নির্দেশিত ব্যবস্থার দ্বারা একাধারে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের হক একসঙ্গে আদায় করার ইহা এক অপূর্ব ব্যবস্থা।

হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত করা হইয়াছে।" ইহা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, কালেমা, নামায, যাকাত, হজ্ব ও রোযা ইসলামের 'ভিত্তি'মাত্র— ইহাই সমগ্র ইসলাম নয়। আর কেহ এই পাঁচটি কাজ সম্পন্ন করিলেই ইসলামের সমগ্র দায়িত্ব তাহার পালন হইয়া যায় না। কেননা এই পাঁচটি ইসলামের 'ভিত্তি' মাত্র; আর শুধু ভিত্তিটিকেই যেমন কেহ সমগ্র প্রাসাদ মনে করে না, মনে করিলে তাহা যেমন শুধু ভুলই হইবে না বরং চরম পাগলামীও হইবে। অনুরূপভাবে শুধু কালেমা, নামায, যাকাত, হজ্ব ও রোযা এই পাঁচটিকেই গোটা ইসলাম বা সম্পূর্ণ ইসলাম মনে করিলেও ভুল বা পাগলামী হইবে। হাদীসটি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছে যে, এই পাঁচটি হচ্ছে ইসলামের ভিত্তিস্তম্ভ; ইহার উপর ইসলামের বিরাট ও সম্পূর্ণ প্রাসাদটি স্থাপিত হইয়াছে। কেহ যদি শুধু ভিত্তি তৈয়ার করিয়া প্রাসাদের কার্যকারিতা লাভ করিতে চায়, তবে সে হয় নির্বোধ, না হয় ইচ্ছা করিয়া নিজেকে ও অন্যান্য মানুষকে ধোঁকা দিতে চায়। কেননা শুধু একটি ভিত্তি কায়েম হইলেই তাহা কাহারও বসবাসের যোগ্য হইতে পারে না, রৌদ্রের তাপ, বৃষ্টির ঝাপটা হইতেও উহা মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না। উপরন্তু শুধু একটি ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাখিলে তাহা স্থায়ীও হইতে পারে না, বরং রোদ্রের তাপে ও বৃষ্টির জাপটায় উহা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইতে বাধ্য। ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তিস্তম্ভেরও অনুরূপ অবস্থা। শুধু এই পাঁচটি কার্য সম্পন্ন করিয়াই যেমন কেহ ইসলামী ব্যবস্থার বিরাট ও সম্পূর্ণ প্রাসাদের কার্যকারিতা লাভ করিতে পারে না, তেমনি শুধু এতটুকু দ্বারাই কেহ পূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপনের দায়িত্ব এড়াইতে পারে না। দ্বিতীয়ত ঃ এই পাঁচটি কার্য সম্পন্ন হইলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনের মাহাত্ম ও বৈশিষ্ট্যও কেহ লাভ করিতে পারে না। তৃতীয়ত ঃ শুধু এই পাঁচটি কার্য যদি সম্পন্ন হইতে থাকে, যদি ইহাকেই ইসলামী জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হয় এবং এই ভিত্তির উপর যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন প্রাসাদ কায়েম করা না হয় বা সেই জন্য

অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনা চালানো না হয়, তাহা হইলে এই পাঁচটি ভিত্তিও স্থায়ী হইয়া থাকিবে না; বরং ইহাও ধীরে ধীরে লোপ পাইতে থাকিবে, তাহা কেহই রোধ করিতে পারিবে না।

বড়ই দুঃখের বিষয়, এক শ্রেণীর অজ্ঞ আলেম ও প্রচারকের পাল্লায় পড়িয়া এই মহান হাদীসটির বিকৃত ব্যাখ্যা জনসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পক্ষে ইহা একটি বিরাট বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অজ্ঞ আলেমরা প্রচার করিতেছে যে, কালেমা, নামায, যাকাত, হজ্ব ও রোযা— এই পাঁচটি জিনিসের নামই ইসলাম। কেহ এই পাঁচটি কাজ কোন না কোনরূপে সম্পন্ন করিয়া দিলেই (তাহাদের মতে) সে মুসলমানীর সমস্ত দায়িত্ব পালন করিয়া ফেলিল। অথচ এই মূর্খরা এইদিকে আদৌ লক্ষ্য করে না যে, ইহা দ্বারা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা হইতেছে, রাসূল (স) মূলত যাহা বলেন নাই, এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহার নামে তাহাই প্রচার করা হইতেছে এবং ইহা অত্যন্ত বড় ও মারাত্মক অপরাধ। সর্বোপরি হাদীসের এইরূপ ভুল ব্যাখ্যা করিয়া ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও বিরাট মহান জীবন ব্যবস্থার বাস্তব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথে অবাঞ্ছিত বাধার সৃষ্টি করা হইতেছে। এই ভুল যত শীঘ্রই ভাঙিবে ইসলামের তথা মুসলিম জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ - (مسلم، مسند احمد)

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি নবী করীম (স) কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহ মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল— আল্লাহ তাহার উপর জাহান্নাম হারাম করিয়া দিবেন।

ব্যাখা মুসলিম শরীফের এক দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশ উপরে একটি স্বতন্ত্র হাদীসরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। হাদীসে আল্লাহ ছাড়া অপর কোন মা'বুদ না থাকা এবং মুহাম্মাদ (স)-এর আল্লাহ্‌র রাসূল হওয়ার সাক্ষ্যদানের পরিণাম ফল উল্লেখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, যে লোক এই দুইটি কথার সাক্ষ্যদান করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর জাহান্নাম হারাম করিয়া দিবেন অর্থাৎ আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন না, জাহান্নামের কঠিন আগুন হইতে সে রক্ষা পাইবে। এই পর্যায়ের আরও বহু হাদীস মুসলিম শরীফে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত রহিয়াছে। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুইটি কথার সাক্ষ্যদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং ইহার পরিণাম জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ লাভ। কোন ঈমানদার লোকের দৃষ্টিতে ইহা সামান্য ও নগণ্য জিনিস বিবেচিত হইতে পারে না।

কিন্তু এই দুইটি কথার সাক্ষ্যদানের অর্থ কি ? প্রথমে সাক্ষ্যদানের তাৎপর্য বিবেচ্যঃ আল্লামা রাগিব ইসফাহানী লিখিয়াছেন ঃ

اَلشَّهَادَةُ قَوْلٌ صَادِرٌ عَنْ عِلْمٍ حَصَلَ بِمُشَاهِدَةٍ بَصِيْرَةٍ اَوْبَصَرٍ -

প্রত্যক্ষ দর্শন বা অন্তর্দৃষ্টির পর্যবেক্ষণের সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে কোন কথা বলাকেই শাহাদাত বা সাক্ষ্যদান বলা হয়। আল-মুফরাদাত, পৃ. ২৬৯

অন্য কথায় আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ব এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রকৃত রাসূল হওয়া সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ এবং সেই কথা মুখে ঘোষণা করা ও জীবনের ভিতর দিয়া উহার

সত্যতা প্রমাণ করা— আর এই দুইটি কথার সত্যতায় একবিন্দু সন্দেহ না থাকাই জাহান্নাম হইতে রক্ষা পাওয়ার প্রথম সোপান। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত অপর এক দীর্ঘ হাদীসের শেষ বাক্যটি নিম্নরূপ ঃ

لَايَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ - (مسلم)

যে বান্দা এই দুইটি কথার সন্দেহ সংশয়মুক্ত সাক্ষ্যদান সহকারে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে তাহাকে কখনও বেহেশত হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। —মুসলিম।

বস্তুত কুরআন ও হাদীসের ভাষায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের এই কথা ভালভাবেই জানা আছে যে, এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একত্ব ও রাসূলের রিসালাত সম্পর্কে সাক্ষ্যদানের অর্থই হইতেছে রাসূলে করীম (স) কর্তৃক দেওয়া ঈমানের দাওয়াত কবুল করা এবং তাঁহার পেশ করা দ্বীন-ইসলামকে নিজের জীবনের পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা ব্যবস্থা ও বিধান হিসাবে মানিয়া লওয়া। কাজেই হাদীসের শব্দ مَن شَهِدَ অর্থ হইবে ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের ইসলাম ও ঈমানের দাওয়াত কবুল করিয়াছে এবং ইসলামকে নিজের জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধানরূপে মানিয়া লইয়াছে (তাহার উপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করিয়া দিবেন)। আল্লামা আহমাদুল বান্না এই পর্যায়েরই একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

اَىْ اذَا كَانَ قَائِمًا بِشُرُوْطِ الشَّهَادَتَيْنِ وَحُقُوْقِهِمَا الْمَطْلُوْبَةِ مِنْهُ -

কেহ যখন এই দুইটি কথার সাক্ষ্যদানের শর্ত ও উহার যথাযোগ্য হক আদায় করিতে প্রস্তুত হইবে, তখনই এই সাক্ষ্যদানের কাজটি সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইবে।

অতএব যে ব্যক্তি কেবলমাত্র মুখে মুখে কথা দুইটির স্বীকৃতি ঘোষণা করিবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে কবুল করিবে না, বরং বাস্তবে অপর কোন বিধান মানিয়া চলিবে, তাহার জন্য সেই সুসংবাদ কখনই প্রযোজ্য নয়— যাহা এই হাদীসের শেষাংশে দেওয়া হইয়াছে।

আর বাস্তবিকই যে ব্যক্তি মন-মগজ, অন্তর ও জীবন দিয়া রাসূলে করীম (স)-এর উপস্থাপিত দ্বীন ও ঈমানের দাওয়াতকে কবুল করিবে এবং বাস্তব জীবনে ইসলামকে অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহার পক্ষে জাহান্নাম হইতে রক্ষা পাওয়া ও বেহেশতে দাখিল হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইসলামের বুনিয়াদী দাওয়াত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ الَى الْيَمَنِ انَّكَ سَتَاْتِىْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ الَى اَنْ يَّشْهَدُوْا اَنْ لَّاالٰهَ الَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَانْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَانْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ

اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَاۤئِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَا
لِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ - (بخارى، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) যখন মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামেনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন বিদায়কালে তিনি তাহাকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিলেন— তুমি তথায় আহলি কিতাবের একটি জাতির কাছে পৌঁছিবে, তুমি যখন তাহাদের নিকট যাইবে তখন তাহাদিগকে (সর্বপ্রথম) এই আহ্বান জানাইবে ঃ তোমরা সাক্ষ্য দাও— মন ও মুখ দ্বারা এই কথা স্বীকার করিয়া লও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহ মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল। তাহারা যদি তোমার এই কথা মানিয়া লয় এবং এই স্বীকৃতির সাক্ষ্যদান করে তবে তাহার পর তাহাদিগকে তুমি বলিবে যে, আল্লাহ তা'আলা দিন-রাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তোমাদের প্রতি ফরয করিয়াছেন। তোমার এই কথাও যখন তাহারা মানিয়া লইবে, তখন তুমি তাহাদিগকে জানাইবে যে, আল্লাহ তোমার উপর যাকাতও ফরয করিয়া দিয়াছেন। ইহা (জাতির) ধনশালীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে এবং উহাই তাহাদের মধ্যেরই গরীব ও মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। এই কথা মানিয়া লওয়ার পর তোমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে যেন যাকাত আদায় করার সময় বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের উৎকৃষ্টতম মাল সম্পদ গ্রহণ না কর। অত্যাচারিতের আর্তনাদকে ভয় করিও, কেননা তাহার ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোনই অন্তরাল নাই। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ইমাম বুখারী প্রমুখ মনীষীর পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী ১০ম হিজরী সনে এবং ঐতিহাসিকদের মনে ৯ম হিজরী সনে নবী করীম (স) হযরত মু'আয (রা)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বিদায় করিবার সময় ইয়ামেনবাসীদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ক্রমিক ধারা সম্পর্কে যে প্রয়োজনীয় উপদেশ তাঁহাকে দিয়াছিলেন, উপরিউক্ত হাদীসে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

আলোচ্যে হাদীসে ইসলামের পাঁচ রুকন বা মৌলিক কাজের মধ্যে কেবলমাত্র কালেমা, নামায ও যাকাত এই তিনটিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। রোযা ও হজ্বের কথা ইহাতে বলা হয় নাই, অথচ তখন এ দুইটিও মুসলমানদের প্রতি ফরয করা হইয়াছিল।

ইহার কারণ সুস্পষ্ট। এখানে নবী করীম (স) হযরত মু'আয (রা)-কে ইসলামের সমস্ত হুকুম স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন নাই; বরং তিনি ইসলামের দাওয়াত প্রচারের ক্রমিক ধারা সম্পর্কেই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। ইসলামী আন্দোলনে দাওয়াত প্রচারের এবং উহাকে কার্যকর করার ব্যাপারে কোন্ ক্রমিক ধারা অবলম্বন করা কর্তব্য, হযরত মু'আয (রা)-এর বিদায়কালে নবী করীম (স)-এর আলোচ্য বাণীতে সেই দিকে ইঙ্গিত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। নবী করীম (স)-এর নির্দেশের মর্মার্থ এই যে, ইসলামের সমস্ত হুকুম আহকাম ও খুঁটিনাটি আদেশ-নিষেধ একসঙ্গে ও একই নিশ্বাসে সকলের সম্মুখে পেশ করা ও সেই সমস্তকেই একই সঙ্গে আমলে আনিবার নির্দেশ দেওয়া কিছুতেই সমীচীন হইবে না। কেননা, প্রাথমিক অবস্থায় একই সঙ্গে ইসলামের বিরাট ও বিস্তারিত আইন-কানুনকে কার্যকর করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য এই ব্যাপারে ক্রমিক নীতিকে অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে। বস্তুত ভিন্ন

জাতি ও ভিন্নধর্মী লোকদের সম্মুখে এক আল্লাহ্র প্রভুত্ব (তওহীদ) এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শেষ নবুয়্যত মানিয়া লওয়ার দাওয়াত প্রচার করাই সর্বপ্রথম কর্তব্য। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এই দুইটি ভিত্তিমূলকে স্বীকার করিয়া লইলে অতঃপর তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, আল্লাহ— যিনি আমাদের ও তোমাদের একমাত্র আল্লাহ ও শরীকহীন মাওলা— আমাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করিয়াছেন। নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে তাহাদের মন স্বীকৃত হইলে পরে যাকাতের কথা বলিতে এবং তাহা আদায় করার ব্যবস্থা করিতে হইবে অর্থাৎ ঈমানদার মুসলিম জাতির ধনশালীদের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া এই জাতির গরীব ও মিসকীনদের মধ্যে তাহা বন্টন করিতে হইবে। ইসলামী দাওয়াত প্রচারে বৈজ্ঞানিক ও ক্রমিক পর্যায় বুঝাইয়া দেওয়াই এই বাণীর লক্ষ্য। সেইজন্য নবী করীম (স) প্রধানত নামায ও যাকাতের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যথায়, ইসলামের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি হুকুম-আহকাম হযরত মু'আয (রা)-এর মোটেই অজানা ছিল না।

ইসলামের স্তম্ভের (আরকান) মধ্যে নামায ও যাকাতই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা এই হাদীস হইতেও সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। কুরআন মজীদেও এই দুইটির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বস্তুত এই দুইটি প্রধান কাজ যে ব্যক্তি সঠিকরূপে পালন করিতে পারে তাহার পক্ষে ইসলামের বিরাট ও বিস্তারিত শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করা অত্যন্ত সহজ। দ্বিতীয়ত ঃ যে সমাজে দুইটি ভিত্তিগত ব্যবস্থা সঠিক ও সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়িত এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই সমাজে ইসলামের অন্যান্য যাবতীয় হুকুম-আহকাম তথা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অতি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বাস্তবায়িত হইবে। আর যে সমাজে এই দুটি বুনিয়াদি জিনিসই কার্যকর নাই, সেইখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন কাজ। সম্ভবত এই জন্য কুরআন মজীদের বহু আয়াতে কেবল এই দুইটি কাজেরই নির্দেশ রহিয়াছে এবং মুসলমানী কেবল এই দুইটির উপরই নির্ভরশীল বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইসলাম প্রচারের ক্রমিক নীতি সম্পর্কে নির্দেশ দানের পর নবী করীম (স) প্রসঙ্গত হযরত মু'আয (রা)কে যাকাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কেও উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শস্য ও জন্তুর যাকাত আদায় করার সময় উহা হইতে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলি বাছিয়া বাছিয়া গ্রহণ করা কিছুতেই ইসলামসম্মত কাজ হইতে পারে না বরং মধ্যম ধরনের মালই যাকাত বাবদ গ্রহণ করা উচিৎ।

সর্বশেষে নবী করীম (স) হযরত মু'আয (রা)কে মজলুমের ফরিয়াদ সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ তুমি একটি এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া যাইতেছ। সাবধান, কখনও কাহারও বিন্দুমাত্র জুলুম করিবে না। কেননা মজলুমের আর্তনাদ অনতিবিলম্বে ও সরাসরিভাবে আল্লাহর দরবারে পৌঁছিয়া যায়। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ وَاِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوْرُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ -

মজলুমের প্রার্থনা অবশ্যই কবুল হয়, সে যদি পাপীও হয়। কেননা তাহার পাপের শাস্তি তো তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।

অর্থাৎ কোন পাপী ব্যক্তির প্রতি জুলুম করা হইলে সে পাপী বলিয়া তাহার বদ্দো'আ আল্লাহ্র নিকট কবুল হইবে না, এমন কোন কথাই হইতে পারে না। এমনকি কাফির ব্যক্তিও যদি মজলুম হয় তবে তাহার বদ্দো'আও আল্লাহ্র নিকট কবুল হইবে, তাহা কোন পর্দার আড়ালে পড়িয়া মিলাইয়া যাইবে না।

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رض قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ الَّا مُوَخَّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذَبْنَ جَبَلٍ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وسعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذَبْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَاحَقُّ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰه عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًا ثُمَّ سَارَسَا عَةً قَالَ يَامُعَاذَبْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وسعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَاحَقُّ الْعِبَاد عَلَىْ اللّٰه اذَا فَعَلُوْا ذٰلكَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ -

(بخارى وسلم الفظ لمسلم)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একবার আমি নবী করীম (স)-এর সহিত একই জন্তুযানে আরোহী ছিলাম। আমার ও তাঁহার মধ্যে পৃষ্ঠশয্যার পশ্চাদ্ভাগ ছাড়া অন্য কোন ব্যবধান ছিল না অর্থাৎ নবী করীম (স)-এর পশ্চাতে অতি নিকটে বসিয়াছিলাম। চলিতে চলিতেই তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন ঃ হে মু'আয ইবেন জাবাল! আমি উত্তরে বলিলাম— বলুন, হুজুর আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত আছি। ইহার পর কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। অতঃপর আবার আমাকে ডাকিলেন ঃ হে মু'আয ইবনে জাবাল! আমি বলিলাম, আদেশ করুন হুজুর, আমি আপনারই খিদমতে হাজির। অতঃপর আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন এবং পুনরায় ডাকিলেন— হে মু'আয ইবনে জাবাল! আমি বলিলাম, ইরশাদ করুন হুজুর, আমি শুনিতেছি। অতঃপর (এই তৃতীয়বারে) নবী করীম (স) বলিলেন ঃ তুমি কি জান জনগণের উপর আল্লাহ তা'আলার কি অধিকার রহিয়াছে ? আমি বলিলাম ঃ তাহা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেনঃ জনগণের উপর আল্লাহ তা'আলার এই অধিকার রহিয়াছে যে, জনগণ একমাত্র আল্লাহ্রই বন্দেগী ও দাসত্ব করিবে এবং তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিবে না। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি আবার ডাকিলেন ঃ হে মু'আয ইবনে জাবাল! আমি বলিলাম ঃ বলুন, আমি উপস্থিত আছি ও শুনিতেছি। তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি জান, মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার এই অধিকার আদায় করিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার উপর জনগণের কি অধিকার হইতে পারে ? আমি বলিলাম ঃ তাহাও আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ আল্লাহ্র উপর জনগণের অধিকার এই যে, আল্লাহ তাহাদিগকে আযাবে নিক্ষপ করিবেন না। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসের কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

এক ঃ হযরত মু'আয (রা) মূল হাদীস বর্ণনা করিবার পূর্বে নবী করীম (স)-এর সাথে একই জন্তুযানে আরোহিত ও তাঁহারই পশ্চাতে অতি নিকটে উপবিষ্ট হওয়ার কথা যে বিশেষ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি কারণ থাকিতে পারে ঃ

(ক) নবী করীম (স) হযরত মু'আয (রা)-কে যে বিশেষ স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং নবী করীম (স)-এর দরবারে তাঁহার যে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিল হযরত মু'আয (রা)-এর উক্ত কথা দ্বারা তাহার শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহিয়াছিলেন, যেন শ্রোতাগণ এই বিশেষ কথা নবী করীম (স) একমাত্র মু'আয (রা) কেই কেন বলিলেন— তাহা বুঝিতে পারে।

(খ) সম্ভবত ঃ তিনি এইরূপ বর্ণনা দ্বারা এই হাদীস সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি হয়ত বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, এই হাদীসটি শ্রবণ করার সময় আমি অতি নিকটে ছিলাম ও খুবই মনোনিবেশ সহকারে শুনিয়াছিলাম বলিয়া ইহার প্রত্যেকটি অংশই আমার মনে স্পষ্টরূপে সুরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

(গ) প্রেমিক ও শ্রদ্ধাশীলগণ সাধারণ প্রিয়তম ও শ্রদ্ধেয় লোকদের সহিত নিজেদের বিশেষ সম্পর্ক ও সংসর্গের কথা মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সহকারে উল্লেখ করিয়া থাকেন। হযরত মু'আয (রা) এই হাদীসটি বর্ণনার সময় সম্ভবত সেই জন্যই অবস্থার এরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন।

দুই ঃ নবী করীম (স) কিছু কিছু সময়ের ব্যবধানে হযরত মু'আয (রা) কে তিনবার ডাকিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহা কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তৃতীয়বারে ইরশাদ করিয়াছেন এবং আরও কিছু সময় অপেক্ষা করার পর চতুর্থবারে তাহার কথার দ্বিতীয় অংশ বলিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, নবী করীম (স) সম্ভবত এই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কথাটি শুনিবার জন্য হযরত মু'আয (রা)কে পূর্ণ উদগ্রীব, উৎকর্ণ ও মনের দিক দিয়া প্রস্তুত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। অথবা নবী করীম (স) হয়তবা এইরূপ গুরুতর কথা হযরত মু'আয (রা)-কে বলিবেন কিনা তাহা বিশেষভাবেই চিন্তা করিতেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যখন বলিবারই সিদ্ধান্ত করিলেন তখন শেষবারে মূল বক্তব্য ইরশাদ করিলেন।

তিন ঃ মূল হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। তাহা এই যে, জনগণের উপর আল্লাহ্‌র হক বা অধিকার এই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত ও বন্দেগী করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। আর তাহারা যখন আল্লাহ্‌র এই অধিকার যথাযথরূপে আদায় করিবে, তখন আল্লাহ নিজেই জনগণের এই অধিকার নিজের উপর ধার্য করিয়া লইয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে আযাবে নিক্ষেপ করিবেন না।

হাদীসে উল্লেখিত "আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও শিরক না করার" অর্থ প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-ইসলামকে পূর্ণরূপে নিজেদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করা। আর যেহেতু সেকালে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে তওহীদ ও শিরকই পার্থক্যের প্রাচীর দাঁড় করিয়া দিত, তাই এই হাদীসে এবং এই অর্থের অন্যান্য হাদীসেও উহা ব্যক্ত করার জন্য এই তওহীদ ও শিরকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা ও শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল কথা এবং ইহা হইতেছে উহার কেন্দ্রীয় বিষয়। কাজেই কাহারও আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল

করার ও শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকার অর্থ ইসলামকে নিজের জীবনে পূর্ণাঙ্গ আদর্শরূপে গ্রহণ করা, জীবনের প্রত্যেকটি কাজে একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধানকেই পালন ও অনুসরণ করা এবং জীবনের কোন একটি ব্যাপারেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও মর্জি মুতাবিক— অন্য কাহারও বিধান অনুযায়ী কাজ না করা। আর এইরূপে ইসলামকে যে ব্যক্তি কবুল ও পালন করিতে পারিবে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাকে সকল আযাব হইতে রক্ষা করিবেন ও বেহেশতে স্থান দিবেন— ইনশাআল্লাহ। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনাই বুঝি বেহেশতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট; নামায, রোযা ইত্যাদি ইসলামের হুকুম-আহকাম বুঝি পালন করিতে হইবে না। বরং অন্য হাদীসে আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করা ও শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকার সঙ্গে নামায আদায় করা ও রোযা রাখা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ - (بخارى - مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ঈমানের সত্তরটিও বেশি শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ, উত্তম ও উন্নত শাখা হইতেছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাস করা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্ব বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করা) আর তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম ও দূরবর্তী শাখা হইতেছে পথিমধ্য হইতে কষ্টদায়ক জিনিসসমূহ দূর করা। 'হায়া' বা 'লজ্জা' ঈমানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বিশেষ। — বুখারী, মুসলিম।

ব্যাখ্যা হাদীসে 'সত্তরটিরও বেশি' বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ নির্দিষ্টভাবে 'সত্তর'টি সংখ্যাই নয় যে, উহার বেশি হইতে পারিবে না। বরং ইহার অর্থ অনেক— বহু। আরবী ভাষায় অনেকও বহু বুঝাইবার জন্য সাধারণভাবেই 'সত্তর' সংখ্যাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; আলোচ্য হাদীসে 'সত্তর'টির ও বেশি বলা হইয়াছে আরো অধিক— আরও বিপুল সংখ্যা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ঈমানের বহু— অনেক ও বিপুল— শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে।

ঈমানের শাখা বলিতে বুঝানো হইয়াছে সেই সমস্ত কাজ-কর্ম, নৈতিক চরিত্র এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সেই সব অবস্থাকে, যাহা কাহারও মনে ঈমান আসিলে উহার পরিণতি ও ফল হিসাবে তাহার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে। যেমন শ্যামল সবুজ সতেজ বৃক্ষে ফুল ও ফল স্বাভাবিকভাবেই ধরিয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে, সকল প্রকার ভাল কাজ, সৎ চরিত্রতা ও পুন্যময় পবিত্র ভাবধারা সবই ঈমানের শাখা-প্রশাখা বিশেষ। অবশ্য শ্রেণী-মর্যাদার দিক দিয়া উহার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

আলোচ্য হাদীসে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্য দানকে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত শাখা বলা হইয়াছে। এবং উহার মুকাবিলায় নিম্নতম শ্রেণীর ঈমান

হইতেছে পথিমধ্য হইতে কষ্টদায়ক জিনিস দূরিভূত করা অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহকে এক বলিয়া স্বীকার করারই নাম ঈমান নয়, বরং পথিমধ্য হইতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও ঈমানের অংশ। এইখানে ঈমানের দুইটি প্রান্তিক সীমান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জন্যই দুই সীমান্তের মাঝখানে যত কিছু ভাল কাজ ধারণা করা সম্ভব, তাহা সবই ঈমানের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা-প্রশাখা মাত্র— তাহা আল্লাহ্‌র 'হক' সম্পর্কীয় কাজ হউক আর বান্দাদের 'হক' সম্পর্কীয় কাজ হউক, উহার কোন একটিও ঈমানের বাহিরে নয়। আর উহার সংখ্যা যে বহু ও বিপুল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

হাদীসের শেষাংশে 'হায়া' বা 'লজ্জা' সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে— উহা ঈমানের একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। লজ্জাকে এতদূর গুরুত্ব দানের একটি কারণ এই হইতে পারে যে, নবী করীম (স) যখন এই হাদীসটি ইরশাদ করিতেছিলেন তখন কাহারও নির্লজ্জতা কিংবা লজ্জার অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং রাসূল তাহাকে সেই সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিতে চাহিয়াছিলেন কিংবা মূলত ঈমানের সহিত লজ্জার যে গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে, রাসূল এখানে সেই তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বস্তুত মানব চরিত্রে লজ্জার স্থান সর্বাধিক উন্নত, আর লজ্জার এমনই গুণ, যাহা মানুষকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইতে এবং অসংখ্য প্রকার পাপ ও খারাবী হইতে বিরত রাখিতে পারে। এই জন্য ঈমান ও লজ্জার মধ্যে অতীব গভীর ও নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান।

এই কথা মনে রাখা দরকার যে, কেবল নিজেদের সমশ্রেণীর লোকদের কাছে লজ্জা করাই ঈমানের দাবি নয় বরং সবচেয়ে বেশি লজ্জাবোধ করা উচিত আমাদের সৃষ্টিকর্তা— পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি। সাধারণভাবে কেবল বড়দের সম্মুখে কিছুটা বেআদবী ও নির্লজ্জতা দেখাইলেই লোকেরা তাহাকে বেহায়া বা নির্লজ্জ বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বড় নির্লজ্জ বেহায়া হইতেছে সেই ব্যক্তি, যে তাহার আল্লাহ্‌র সম্মুখে লজ্জা পালন করে না এবং, আল্লাহ্ সব কিছু দেখেন এই কথা বিশ্বাস করিয়াও গোপনে-প্রকাশ্যে সর্বতোভাবে সেই আল্লাহ্‌রই নাফরমানী হইতে বিরত থাকে না।

অতএব কাহারও মনে লজ্জার গুণ পূর্ণরূপে জাগ্রত ও সক্রিয় থাকিলে সে কেবল সমশ্রেণীর লোকদের সম্মুখেই পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও আল্লাহ্‌র অনুগত জীবন যাপন করিবে না, বরং সে দিনে-রাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বত্র ও সর্বতোভাবে নাফরমানী হইতে ফিরিয়া থাকিবে। কেননা আল্লাহ্‌র প্রতি লজ্জাবোধ করার ইহাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) একদা সাহাবীদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوْا اِنَّا نَسْتَحْيِيْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَقَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّاسَ وَمَا حَوٰى وَالْبَطْنَ وَمَا وَعٰى وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيٰى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ – (ترمذى)

আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা এতদূর লজ্জাবোধ কর, যেমন করা উচিত। উপস্থিত লোকেরা বলিল ঃ আল্লাহ্‌র শোকর, আমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে লজ্জা পালন করিয়া থাকি। তিনি বলিলেনঃ এইরূপে নয়। আল্লাহ্‌র সম্পর্কে লজ্জা করার নিয়ম হইল এই যে, মস্তক ও মস্তকের মধ্যে যত চিন্তাধারা ও মতবাদ রহিয়াছে সেই সবকিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, পেট ও পেটের মধ্যে যাহা কিছু আছে ও উহাতে যাহা কিছু প্রবেশ করে তাহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। (অর্থাৎ সকল প্রকার খারাপ চিন্তা ও মতবাদ হইতে মস্তিষ্ককে এবং হারাম ও নাজায়েয খাদ্য হইতে পেটকে রক্ষা করিতে হইবে।) এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পর কবরে তোমাদের যে অবস্থা হইবে, তাহা স্মরণ কর। বস্তুত যে ব্যক্তি এই সব কাজ সঠিকভাবে করিতে পারিল, মনে করিও— সে আল্লাহ সম্পর্কে লজ্জা ও পূর্ণ 'হক' আদায় করিতে পারিল। — তিরমিযী

এই হাদীস হইতে একদিকে যেমন লজ্জার সহিত ঈমানের সম্পর্ক বুঝা গেল, তেমনি বুঝা গেল ঈমানের ব্যাপক বিস্তৃতির কথা ও লজ্জার প্রকৃত তাৎপর্য।

আল্লাহ্‌র পরিচয়

عَنْ سعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِضُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ اَنَا الْمَلِكُ وَاَيْنَ مُلُوكُ الْاَرْضِ - (بخارى - مسلم)

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (তাবেয়ী) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন যে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে স্বীয় মুষ্টির মধ্যে ধারণ করিবেন এবং সমগ্র আকাশ জগতকে স্বীয় ডান হাত দ্বারা ভাজ করিয়া লইবেন। অতঃপর বলিবেন ঃ আমিই বাদশাহ— একচ্ছত্র অধিপতি, দুনিয়ার বাদশাহগণ আজ কোথায়? — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীস এবং ইহার অনুরূপ অন্যান্য বহু সংখ্যক হাদীস হইতে যে মূল সত্যটি জানিতে পারা যায়, তাহা কুরআন মজীদের বহু সংখ্যক আয়াত হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা 'জুমার'-এর নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ - سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

তাহারা আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও বিরাটত্বের অনুমান করিতে পারে নাই— ঠিক যেরূপ অনুমান করা উচিত ছিল। (এই জন্যই তাহারা শিরক-এর গুনাহে নিমজ্জিত হইয়াছে এবং নিজেদের মা'বুদগুলোকে আল্লাহ্‌র দিকে সুপারিশকারী মনে করিতেছে) অথচ কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী আমার মুষ্টির মধ্যে থাকিবে এবং সমগ্র আকাশ গুটাইয়া গিয়া আমার

ডান হাতের কব্জির মধ্যে আসিয়া যাইবে। তিনি এই লোকদের শিরকী আকীদা ও কাজ হইতে বহু উর্ধ্বে— মহান ও পবিত্র।

সূরা মু'মিনে বলা হইয়াছে ঃ

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَايَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ -

যে দিন তাহারা খোলা ময়দানে একত্র হইবে, তাহাদের কোন জিনিসই আল্লাহ্র নিকট হইতে গোপন থাকিবে না। আজ সমগ্র ক্ষমতা কাহার ?— কেবল সেই আল্লাহ্র যিনি এক এবং একক, শাসক ও মহাপরাক্রমশালী। আজ প্রত্যেক মানুষই তাহার কাজের প্রতিফল পাইবে। আজ (কাহারও উপর) কোন জুলুম করা হইবে না। হিসাব গ্রহণে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও তীব্র গতিশীল।

এই আয়াতদ্বয় ও উপরিউক্ত হাদীস হইতে সুস্পষ্টরূপে ইহাই জানিতে পারা যায় যে, এই বিশ্বলোকের মালিক, স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগকারী, সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের ধারক, বিরাট ও মহান সত্তা কেবলমাত্র একজন এবং তিনি হইতেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি ছাড়া আর কাহারও নিকট একবিন্দু ক্ষমতা— শক্তি নাই। সমগ্র সৃষ্টিলোক তাহারই মুষ্টির মধ্যে। পৃথিবীর ও আকাশ রাজ্যের প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই তাঁহার আইন ও বিধান কার্যকর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা ও অনুমোদন ব্যতীত কোন সামান্যতম ঘটনাও কোথাও সঙ্ঘটিত হয় না। মানুষের অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে দাসানুদাস মাত্র; শাসক নয়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রজামাত্র; সার্বভৌম নয়, সার্বভৌমের প্রতিনিধিত্বের অধিকারী বা খলীফা মাত্র। মানুষের নিকট যাহা কিছু আছে, তাহা তাহার নয়, সবই আল্লাহ্র। মানুষ তাহা অর্জন করিতে পারে না। আল্লাহ্ তাহাকে এই সব দান করিয়াছেন বলিয়াই ইহা তাহার আয়ত্তাধীন এবং ইহা তাহার আয়ত্তাধীন থাকিবে ততদিন যতদিন প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তাহা থাকিতে দিবেন। সমগ্র সৃষ্টির সর্বত্র যে আল্লাহ্র আইন কার্যকর হইয়া আছে, মানুষ তাহার বাহিরে নয়, মানুষ তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য।

মানুষের যে সামান্য ক্ষমতা-ইখতিয়ার রহিয়াছে, আছে সীমাবদ্ধ কর্মক্ষমতা তাহাও তাহার নিজস্ব নয়, তাহা কেবলমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত। তাই উহাকে মানুষ আল্লাহ্র ইচ্ছা ও অনুমোদন অনুযায়ী ব্যবহার করিতে বাধ্য। এক্ষণে মানুষ যদি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ ও ক্ষমতা-স্বাধীনতা দ্বারা নিজের প্রভুত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বাহাদুরী দেখাইতে শুরু করে এবং আল্লাহ্র মর্জি পূরণ ও তাঁহার আইন জারী করার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতা করে নিজস্ব মনগড়া আইন চালু করে, তবে তাহাতে প্রকৃত সত্য বদলিয়া যায় না। এখন যদি কোন সুস্থ মানুষ প্রকৃত চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্ধ সাজিয়া থাকে, তবে থাকিতে পারে, পারে নিজেকে ও অজ্ঞ মানুষকে খানিকটা প্রতারিত করিতে, কিন্তু অনতিবিলম্বে এই প্রতারণার জাল যখন ছিন্ন হইবে, নিগূঢ় সত্য যখন দিবালোকের মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তখন কেবল অনুধাবনী নয় বাস্তব চক্ষেই দেখিতে পারিবে যে, প্রকৃত ক্ষমতা ও মালিকানা কেবলমাত্র আল্লাহ্র। সমগ্র

সৃষ্টিলোক— পৃথিবী হইতে আকাশমণ্ডল পর্যন্ত সবই তাঁহারই মুষ্টির মধ্যে অবস্থিত, তাঁহারই ক্ষমতা প্রভুত্বের অধীন এবং তিনি তাহার উপর যেভাবে চাহেন স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করেন, প্রকাশ করেন। তখন প্রত্যেকটি মানুষ স্বীয় চক্ষে দেখিতে পাইবে যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সবই আল্লাহ্‌র। তিনি ছাড়া আর সবই অক্ষম দুর্বল— একান্ত অসহায়। তখন দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতার ধারক— যাহারা দুনিয়ায় নিজেদের প্রবল প্ররাক্রমের বাহাদুরী দেখাইতেছে, যে সব অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী লোক সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা আল্লাহকে পর্যন্ত আমলে আনিতে প্রস্তুত হয় নাই— সেই দিন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বাধ্য হইবে। মানবীয় ক্ষমতা প্রভুত্বের বাহ্যিক আবরণ সেইদিন ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং জীবনের সকল পর্যায়ের কৃতকর্মের প্রতিফল গ্রহণের জন্য আসমান-জমিনের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্‌র দরবারে বিনীতভাবে দাঁড়াইতে বাধ্য হইবে। সেই আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে রেহাই দিবার আর কেহ থাকিবে না। সৃষ্টির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু সেই দিন উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিবে ঃ আজিকার ক্ষমতা ও আধিপত্য কাহার ? সৃষ্টির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুই উহার জওয়াবে বলিয়া উঠিবে ঃ কেবলমাত্র এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র।

আলোচ্য হাদীস ও উদ্ধৃত আয়াতে গায়েবী জগতের নিগূঢ় গভীর সত্য সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই ধরনের বর্ণনায় শব্দের বাহ্যিক অর্থ কখনও লক্ষ্য হয় না, উপরন্তু উহার বিশেষ কোন বাস্তব ব্যাখ্যাদানও সমীচীন নয়। বরং এই ব্যাপারে বিস্তারিত কথাগুলোকে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করিয়া উহার মূল কথাটুকু অনুধাবন ও গ্রহণ করিতে চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র এই পন্থায়ই আল্লাহ্‌র কালাম ও রাসূলের হাদীস হইতে সঠিক কল্যাণ ও ফায়দা লাভ করিতে পারা যায় এবং নিজেকে গোমরাহী হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظَمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدً امِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِىْ النَّارِ -

(احمد - ابوداؤد - ابن ماجه - دارقطنى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ বড় হওয়ার গৌরব আমার চাদর এবং বিরাটত্ব আমার পরিধেয়। এই দুইটির একটিও আমার নিকট হইতে যে লোক কাড়িয়া লইতে চাহিবে, আমি তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব। —আহমদ, আবূ দাউদ, ইবেন মাজাহ, দারে কুতনী

ব্যাখ্যা হাদীসটি যদিও রাসূলের কথা হিসাবে শুরু করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্‌র নিজস্ব কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ধরনের হাদীসকে বলা হয় 'হাদীসে কুদসী'। এই হাদীসেও কেবলমাত্র কথা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ردائى (চাদর) ও ازار (পরিধেয়) দুইটি রূপক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌র অবশ্যই জামা-পাজামা রহিয়াছে এবং তিনি তাহা পরিধান করিয়া আছেন। হাদীসটির মূল বক্তব্য এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্বের গৌরব কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সহিতই বিশেষভাবে জড়িত, তিনি ছাড়া ইহার কোন একটিরও অপর কেহ অধিকারী নয়। তিনি ব্যতীত আর সব নিছক বান্দা, অক্ষম, দুর্বল, অসহায় ও অনুগামী ছাড়া আর কিছুই নয়। সকলই তাঁহার মুখাপেক্ষী, তাঁহার প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্বের অধীন। তাঁহার দাসানুদাস হওয়াই সকলের গৌরব, ইহাই সকলের ভূষণ। এখন কোন বান্দা যদি এত

সব অক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা ও অসহায়তা অনুভব না করিয়া অহংকার ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার গৌরব করিতে শুরু করে তবে সে শুধু অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যেই লিপ্ত নয়। এইরূপ ব্যক্তি দুনিয়ায় চরম অশান্তি ও বিপর্যয়ই সৃষ্টি করিয়া থাকে। আর পরকালে ইহার পরিণাম কঠিন শাস্তি ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُؤْذِيْنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ - وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَ الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

(بخاری - مسلم - امحد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সময় ও কালকে গালগালি দেয়, অথচ মহাকাল আমিই— আমারই হস্তে সবকিছুর মূল চাবিকাঠি, আমিই রাত্র ও দিনকে আবর্তিত করি।

ব্যাখ্যা এই হাদীসটি হাদীসে কুদসী। ইহাতে اَلدَّهْرُ শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে, ইহার তরজমা করা হইয়াছে 'মহাকাল'। আসলে 'দাহর' বলা হয় সৃষ্টির প্রথম সূচনা হইতে উহার চূড়ান্ত সমাপ্তি পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিস্তৃত কাল ও সময়কে। এই অর্থে কুরআন মজীদেও এই শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। পরে যে কোন দীর্ঘকাল ও যুগকে 'দাহর' বলা হইতে থাকে। এই মহাকালও অন্যান্য অসংখ্য সৃষ্টির মতই একমাত্র আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ ইহা বুঝিতে চায় না। দুনিয়ায় যে সব উত্থাপ-পতন, সৃষ্টি-লয়, ভাঙ্গা-গড়া, ধ্বংস-রক্ষা, ভাল-মন্দ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা যেহেতু সহসাই সম্ভবপর হয় না, কালের অগ্রগতির আবর্তনে এই সব ঘটিয়া থাকে; এই জন্য মানুষ এই সবের মূলে কেবল 'মহাকাল'কেই দেখিতে পায়, মনে করেঃ কালের করাল আঘাতেই এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতেছে বলে কালস্রোত কাহাকেও ক্ষমা করে না। 'কাল' আল্লাহ্‌র এক অক্ষম সৃষ্টি, সে আল্লাহর বাধিয়া দেওয়া নিয়মে প্রবাহিত হইতেছে, আর ইহার মধ্যে ঘটিয়া যাইতেছে ঐ সব ঘটনা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র মর্জি অনুযায়ী। এখানে কালের কোন অপরাধ নাই। ক্ষমতাও নাই। কালের সহিত এই সব ঘটনার সম্পর্ক এই যে, এই সব ঘটনা উহার মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় অন্যথায় এই ঘটনাগুলি যেমন আল্লাহ্ কর্তৃক সঙ্ঘটিত হয়, 'কাল'ও তেমনি আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণের অধীন প্রবহমান। কাজেই মানুষ যে 'কাল'কে দোষী করে, গালাগালি দেয়, ইহার কোন অর্থ হয় না। এই জন্যই নবী করীম (স) 'কাল'কে গালাগালি করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বলিয়াছেন ঃ لَاتَسُبُّوا الدَّهْرَ 'কালকে তোমরা গালাগালি করিও না।' কেননা 'কাল'কে যে দোষ-মন্দ বলা হয় গালাগালি দেওয়া হয়— তাহা কালের উপর মোটেই বর্তায় না, তাহা সরাসরি আল্লাহ্‌র উপর পড়ে। কেননা কালের স্রষ্টা আল্লাহ ইহার পরিচালক ও গতিদানকারী হইতেছেন তিনিই। রাসূলে করীম (স) এই জন্যই উহার কারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ "কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই হইতেছেন কাল।" আর মূল আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর কথা وَاَنَا الدَّهْرُ "অথচ আমিই হইতেছি কাল।" ইহার অর্থ কি? আল্লামা রাগিব ইসফাহানী লিখিয়াছেন ঃ

قِيْلَ مَعْنَاهُ اِنَّ اللّٰهَ فَاعِلُ مَا يُضَافُ اِلَى الدَّهْرِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْمَسَرَّةِ

وَالْمَسَاءَةِ فَاِذَا سَبَبْتُمُ الَّذِىْ تَعْتَقِدُوْنَ اَنَّهُ فَاعِلٌ ذٰلِكَ فَقَدْ سَبَبْتُمُوْهُ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ - (مفردات ص - ١٧٢)

বলা হইয়াছে, এই কথার অর্থ এই যে, ভাল-মন্দ, শান্তি-দুঃখ ইত্যাদির যাহা কিছু কালের ক্রিয়া বলিয়া মনে করা হয়, আসলে উহার কর্তা হইতেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। এমতাবস্থায় তোমরা যখন 'কালকে' এই সবের কর্তা মনে করিয়া গালাগালি কর, তখন তোমরা ফলত আল্লাহ্কেই গালাগালি কর। অথচ আল্লাহ এই গালাগালি ও দোষ-মন্দের উর্ধ্বে।

আবার অন্যদের মতো উহার অর্থ হইতেছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ اَىْ اَلْمُصَرِّفُ الْمُدَبِّرُ الْمُفِيْضُ لِمَا يُحَدِّثُ -

আল্লাহই হইতেছেন কাল-পরিচালক অর্থাৎ কালের আবর্তনকারী, সর্ব কাজের ব্যবস্থাপক এবং সকল ঘটনার উদ্যোক্তা। (ঐ)

হাদীসের শেষ অংশে বলা হইয়াছে, 'সমগ্র ব্যাপারের মূল চাবিকাঠি আমারই হস্তে নিবদ্ধ, রাত্রি ও দিনের আবর্তন আমিই করিয়া থাকি।' অর্থাৎ সৃষ্টিলোকে সব কিছুই আল্লাহ্র মুষ্টির মধ্যে, আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন। যাহা ঘটে, আল্লাহ্র মর্জি ও অনুমোদনেই ঘটিয়া থাকে, ঘটিতে পারে। শেষ বাক্যে আল্লাহ নিজেই কালের পরিচয় দিয়াছেন। কাল বলিতে কি বুঝায় ? রাত ও দিনের আবর্তনে— দিনের পর রাত ও রাতের পর দিনের আগমনে সময়ের যে গতি সৃষ্টির প্রথম হইতে চালু হইয়াছে, তাহারই সমষ্টি হইল 'কাল' বা মহাকাল। আর এই আবর্তনের একমাত্র নিয়ামক হইতেছেন স্বয়ং আল্লাহ। কাজেই এই কালকে গালি দিলে যে আল্লাহ্র উপরই পড়ে তাহাতে আর সন্দেহ কি!

আল্লাহ্র ভাণ্ডার অফুরন্ত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلَاَ ئِىْ لَايَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ اَرَاَيْتُكُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَافِىْ يَمِيْنِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ بِيَدِهِ الْاُخْرٰى الْمِيْزَانُ يُخْفِضُ وَيَرْفَعُ - (بخارى - مسلم - مسند - احمد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র মহান হস্ত সর্বক্ষণই ভরপুর। দান করিলে তাহা শুষ্ক হইয়া ফুরাইয়া যায় না। রাত্র দিন অনবরত নিয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ যখন হইতে তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতে কত না সম্পদ খরচ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার হস্তস্থিত ভাণ্ডারে একবিন্দু পরিমাণ কমতি পড়ে নাই। তিনি বলিয়াছেন ঃ প্রথমে আল্লাহ্র আরশ ও পানির মাঝখানে কিছুই ছিল না। (পরে

সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব হয়) আল্লাহ্র অপর হস্তে সুবিচারের মানদণ্ড রক্ষিত; উহাকে নীচুও করেন, আবার উঁচুও করেন। — বুখারী, মুসলিম, মুসনাদ আহমদ

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসটি শব্দের কিছুটা তারতম্য সহকারে প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্র অফুরন্ত নিয়ামত এবং তাহার উদার অবাধ দানশীলতা সম্পর্কে বিবরণ রহিয়াছে। গায়বী জগতের গভীর তত্ত্ব ভাষার পোশাকে প্রকাশ করিতে চাহিলে শব্দের অভাব পড়া স্বাভাবিক; কিন্তু মানুষের বিবেক তাহা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নয়। তখন হয় মনগড়াভাবে উহার রূপ কল্পনা করিতে শুরু করে, নতুবা উহাকে মানিয়া লইতেই অস্বীকার করে। এই দুইটি কাজই সত্য নীতির বিপরীত। সঠিক পন্থা হইতেছে ঃ যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে চেষ্টা করা এবং উহাকে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরম সত্যরূপে বিশ্বাস করা।

হাদীসটির মূল বক্তব্য তিনটি কথাঃ প্রথম, আল্লাহ্র শক্তি ও নিয়ামতের অফুরন্ততা। দ্বিতীয়, সৃষ্টির প্রথম অবস্থা কি ছিল এবং তৃতীয়, আল্লাহ্র দান সামঞ্জস্যপূর্ণ— ভারসাম্যহীন নয়।

প্রথম কথাটি বুঝাইবার জন্য রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র হস্ত ভরপুর। আল্লাহ্র নিয়ামতের কোন অভাব নাই, নাই উহার কোন শেষ। তিনি যত দানই করুন না কেন, এই ভাণ্ডারে বিন্দুমাত্র কমতি পড়িবে না। উহার আসল পরিমাণ একবিন্দু কমিয়া যাইবে না। এই জন্যই আল্লাহ অবিশ্রান্তভাবে দান করিয়া যাইতেছেন, এই দান মূষলধারার বৃষ্টির মতোই সৃষ্টিলোকের সর্বত্র বর্ষিত হইতেছে। এক মুহূর্তের তরেওনিয়ামতের এই বর্ষণ থামিয়া যায় না, বন্ধ হয় না। এই কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য রাসূলে করীম (স) একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে কিছুটা ধারণা করিতে পার যে, আল্লাহ সেই কবে— কোন দূর অতীতকালে— এই আসমান ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সেই সময় হইতেই সমগ্র সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্র নিয়ামতের বর্ষণ শুরু হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিয়ামত দান সত্ত্বেও উহার পরিমাণ একবিন্দু কমিয়া যায় নাই। আসমান ও জমিন কবে সৃষ্টি হইয়াছে ? কত কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্ট এই সূর্য প্রাণঢালা আলো ও উত্তাপ দিয়া সৃষ্টিলোককে জিয়াইয়া রাখিয়াছেন ? এইজন্য সূর্য প্রতি সেকেন্ডে বাহিরে ৪০ লক্ষাধিক টনের উপর শক্তি খরচ করে। ইহার ফলে পৃথিবী দৈনিক ১৭৩ টন পর্যন্ত আলো লাভ করে। কিন্তু সূর্য হইতে পাওয়া এই আলোর মূল্য দিতে হইলে প্রতি ঘন্টায় আমাদেরকে, ১,৭০০,০০০,০০০,০০০ ডলার দিতে হইত। অথচ আমরা ইহা পাইতেছি একেবারে বিনামূল্যে— বিনা বিনিময়ে। সূর্য এইভাবে শক্তি ব্যয় করিয়াও ফুরাইয়া যাইতেছে না। উহার শক্তি হিসাব মতই ব্যয় হয়, বৎসরে উহার মোট শক্তি এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ ১,০০০,০০০,০০০,০০০ মাত্র ব্যয় হয়। সূর্য কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া আলো ও উত্তাপ দান করিয়া আসিলেও এখনও উহা অত্যন্ত প্রচন্ড হইয়া আছে। ইহা একটি সূর্য সম্পর্কে অতি সামান্য মাত্র হিসাব, এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্র অন্যান্য কোটি কোটি নিয়ামতের বিবরণ দেওয়ার শক্তি কোন মানুষের নাই।

সৃষ্টির প্রথম অবস্থা সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, প্রথমত কেবল পানি ছিল আর কিছুই ছিল না। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের সৃষ্টিকুল— ইহাদের কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তখন আল্লাহ্র রাজ্য সাম্রাজ্য বলিতে যাহা কিছু ছিল, তাহা ছিল এই

পানি। কেননা পানি ছাড়া কোথাও কিছু ছিল না, আর এই পানি হইতেই সব কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে। পানি বলিতে বর্তমান সময়ের এই নদী-সমুদ্রের পানি বুঝানো হইয়াছে না অন্য কিছু তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত। 'পানি' অর্থাৎ পানিও হইতে পারে আর হইতে পারে 'গলিত পদার্থ'— যাহাকে বৈজ্ঞানিকগণ 'বস্তু' বলিয়া থাকেন এবং যাহা হইতে সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব দান সম্ভব হইয়াছে। কুরআন মজীদে এই সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে ঃ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ —"আমি আল্লাহ, পানি হইতে সকল জীবকে সৃষ্টি করিয়াছি।" — সূরা নিসা

দ্বিতীয়, সুবিচার ও ন্যায়পরতার মানদণ্ড আল্লাহ্‌র হস্তে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নিয়ামত রহিয়াছ, তিনি তাহা উদার হস্তে সৃষ্টিলোককে দান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা অবিবেচক দাতার মতো নয়। বরং আল্লাহ্‌র এই দান ন্যায়সঙ্গতভাবেই হইয়া থাকে। সৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখা ও লক্ষ্যপথে পরিচালিত করার জন্য যেখানে যতটুকু নিয়ামত দান আবশ্যক আল্লাহ সেখানে ঠিক ততটুকু দেন, উহার একবিন্দু বেশি নয়, একবিন্দু কমও নয়। আর বিচারের যে মানদণ্ডের উপর আল্লাহর মর্জি চলে, আল্লাহও উহার অধীন নন। এই জন্য বলা হইয়াছে যে, সেই মানদণ্ডকে তিনি উঁচুও করেন, নীচুও করেন। অর্থাৎ যাহাকে চান নিয়ামতের মাত্রা প্রশস্ত করিয়া দেন আর যাহাকে চান মাত্রা কমাইয়া দেন। এই নিয়ামত দানের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিরংকুশ।

عَنْ جَابِرِابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ - (مسلم)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষ্যৎ করিবে যে, সে তাঁহার সহিত শিরক করে না, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর যে তাঁহার সাথে শরীক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে, সে জাহান্নামে যাইবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীস মূলত কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শির্‌কের গুনাহ্ মাফ করিবেন না। এতদ্ব্যতীত অপরাপর ছোট গুনাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হইবে, তিনি মাফ করিয়া দিবেন। — সূরা আন-নিসা ঃ ১১৬

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ আয়াত রহিয়াছে। এই আয়াতসমূহে যে মূল কথাটি বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) তাহাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে হাদীসের কিতাবসমূহে এই একই অর্থের বিভিন্ন ও বহু সংখ্যক হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই হাদীসসমূহের মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া মূল কথায় কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

এই হাদীস ও কুরআনের আয়াতসমূহ হইতে যে মূল কথাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহা এই যে, পরকালীন মুক্তি একেবারেই সম্ভব নয়। মুশরিক ব্যক্তি জাহান্নামে যাইবে এবং তথায় সে চিরকাল থাকিতে বাধ্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে তওহীদ বিশ্বাস লইয়া যে মৃত্যুবরণ করিবে, তাহার পরকালীন মুক্তি এবং বেহেশত লাভও অকাট্যভাবে সত্য।

এখানে শির্‌ক বলিতে কেবল মূর্তি পূজাকেই বুঝানো হয় নাই, শির্‌ক-এর যত প্রকার, রকম ও ধরন রহিয়াছে তাহার কোন একটি অংশও মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকিলেও তাহা অত্যন্ত মারাত্মক। অনুরূপভাবে তওহীদ বলিতেও কেবল আল্লাহ্‌কে 'এক' বিশ্বাস করাই বুঝায় না। আল্লাহ্‌কে এক, একক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করার ভাবধারাকে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম, গতিবিধি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যমান— সর্বক্ষেত্রেই প্রভাবশালী হইতে হইবে। অন্যথায় যেমন তওহীদ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হইতে পারিবে না, তেমনি যেখানে ইহার প্রভাব থাকিবে না কিংবা যেখানে তাহা ক্ষীণ হইয়া যাইবে, সেখানেই শির্‌ক প্রবেশ করিবে।

এই কারণে শির্ক হইতে বাঁচিতে হইলে যেমন শির্কের সমস্ত পথ ও ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে তেমনি তওহীদ বিশ্বাস লইয়া মৃত্যুবরণ করিতে চাহিলে সমগ্র জীবন— জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তওহীদ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে।

তওহীদের এই অপরিসীম গুরুত্ব ও ব্যাপকতার কারণেই ইতিহাসে দেখা যায়— যখনই আল্লাহ্‌র কোন নবী দুনিয়ায় আসিয়াছেন, তিনি সর্ব প্রথম দুনিয়ার মানুষকে সকল প্রকার শির্ক পরিহার করার ও সঠিকভাবে তাওহীদ বিশ্বাস গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন। কুরআন মজীদে নবীগণের এই দাওয়াতের কথাই বলা হইয়াছে এইভাবে যে, প্রত্যেক নবীই দাওয়াত দিয়াছেন ঃ
أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ —'কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই বন্দেগী কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেহ ইলাহ— মাবুদ, ভয় করার যোগ্য ও বিধানদাতা নাই।" এইভাবে প্রত্যেক নবীরই এই দাওয়াতের কথা কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই ইহাতে যেমন শির্ক পরিহার ও তওহীদ বিশ্বাস গ্রহণের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়, তেমনি এই কথাও প্রমাণিত হয় যে, মানব সমাজে নবীগণের আদর্শানুযায়ী ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করিত হইবে। বস্তুত যে দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান কথা শির্কের প্রতিবাদ ও তওহীদ বিশ্বাস গ্রহণের আহ্বান হইবে না, তাহা কখনই ইসলামী দাওয়াত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, মূলত তওহীদ ও উহার আনুসাংগিক বিষয়াদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকেই বলা হয় দ্বীন-ইসলাম। পক্ষান্তরে সকল প্রকার গোমরাহী ও বাতিল ধর্মমতেরই ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে শির্ক-এর উপর।

আলোচ্য হাদীস হইতে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র সুবিচারের মানদণ্ড কোন দলের সাথে নিছক সংশ্লিষ্ট হওয়া, কাহারো সহিত কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কিংবা কোন বিষয়ের শুধু মৌলিক স্বীকৃতি দান ও উহার দাবি করার একবিন্দু মূল্য নাই। এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হইতে পারে কেবলমাত্র প্রত্যেক ব্যক্তির সঠিক, খাঁটি ও নির্ভুল ঈমান এবং তদানুযায়ী সঠিক আমল।

এই হাদীস এই কথাও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করার শির্কমূলকও তওহীদমূলক প্রভৃতি যেকোন এক রূপ, ধরন ও পদ্ধতিই ঠিক নয়; বরং যে ধরন ও পদ্ধতি কেবলমাত্র তওহীদ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে, যাহাতে শির্ক-এর একবিন্দু নাম চিহ্ন পর্যন্ত বর্তমান থাকে না; কেবলমাত্র তাহাই সঠিক— তাহাই মানুষের জন্য পরকালের মুক্তি বিধান করিতে পার। আর যে পদ্ধতি ও ধরনে শির্ক রহিয়াছে তাহাতে কখনও বিশ্বজাহানের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র ইবাদত হইতে পারে না, আর তাহা মানুষকে মুক্তিদানও করিতে পারে না। অতএব আল্লাহ্‌র ইবাদতের পথ মাত্র একটি, যাহা আম্বিয়ায়ে কিরাম শিক্ষা দিয়াছেন। পরন্তু এই মূল সত্যও সকলের সম্মুখে থাকা আবশ্যক যে, বর্তমানে ইসলাম ছাড়া খালেস তওহীদ আর কোন ধর্মমতেই পাওয়া যায় না, অন্যান্য প্রায় সকল ধর্মমতেই কোন না কোন প্রকারের শির্কের আকীদা বর্তমান রহিয়াছে। দুনিয়ার এই ধর্ম-মতসমূহের কোথায়ও মূল আকীদার মধ্যেই শির্ক রহিয়াছে কোথায়ও শির্কমূলক চিন্তা, বিশ্বাস ও ধারণা রহিয়াছে, কোথায়ও আমলের মধ্যে সুস্পষ্ট শির্ক বর্তমান। আর কোথায়ও আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রেই শির্ক প্রবল হইয়া আছে।

এই হাদীস আমাদেরকে শির্ক সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয়। আমাদেরকে বিশেষ সতর্কতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সচেতন মনের সাহায্যে সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার শির্ক হইতে পবিত্র থাকিবার জন্য সুস্পষ্টভাবে আদেশ করে।

আমাদের আকীদা ও আমলের— ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিংবা সমষ্টিগত পর্যায়ে কোথায়ও শির্ক আছে কি না, তাহা চিন্তা করা ও ইহা হইতে সাবধান হওয়া আমাদের বিশেষ কর্তব্য।

শির্ক ও উহার প্রকাশ ও প্রতীক

এক

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طفق يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلٰى وَجْهِهٖ فَاِذَا اَغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهٖ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِ هِمْ مَسَاجِدُ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا ـ

(بخاری، مسلم)

হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা দুইজনই বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) যখন মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত হইলেন, তখন তিনি মুখের উপর চাদর দিয়া (ঢাকিয়া) রাখিতেন। যখন তাঁহার খুব বেশি কষ্ট অনুভব হইত, তখন চাদর মুখের উপর হইতে সরাইয়া লইতেন। এইরূপ এক অবস্থায় তিনি একবার বলিলেন ঃ 'ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হউক, তাহারা তাহাদের নবী-পয়গাম্বরদের কবরকে সিজদার স্থান বানাইয়া লইয়াছেন'— তিনি ইয়াহূদী ও নাসারাদের কাজকর্মের পরিণাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করিতেছিলেন। — বুখারী, মুসলিম

দুই

عَنْ عَا ئِشَةَ رض اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلْمَةُ رض ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَايَتْهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُولٰئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهٖ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(بخاری، مسلم)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালমা (রা) দুইজন একটি গীর্জার কথা উল্লেখ করেন, যাহা তাঁহারা হাবশায় দেখিয়াছিলেন। তাহাতে বহু চিত্র রক্ষিত ছিল। পরে তাহারা এই কথা নবী করীম (স)-এর নিকট উল্লেখ করেন। তখন নবী করীম (স) বলিলেন ঃ ইহাদের (ইয়াহূদী ও নাসারাদের) অবস্থা এই যে, তাহাদের মধ্যে যখন কোন সচ্চরিত্রবান ও নেককার ব্যক্তির জন্ম হয় ও তাহার মৃত্যু ঘটে, তখন তাহারা তাহার কবরের উপর ইবাদতের স্থান বানায় এবং তাহাতে এই ধরনেরই চিত্র ও ছবি অংকিত করিয়া রাখে। এই সব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টিরূপে গণ্য হইবে।

তিনি

عَنْ جُنْدُبٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ بِخَمْسٍ ...... اَلَا وَاِنَّ

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَا ئِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدًا اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدًا اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ - (مسلم)

হযরত জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স)-কে মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি— সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাহাদের নবী, পয়গাম্বর ও নেককার লোকদের কবরকে সিজদার স্থান বানাইয়া লইয়াছিল। হুঁশিয়ার, তোমরা কখনও কবরকে সিজদার জায়গা বানাইবে না। মনে রাখিও, আমি তোমাদেরকে উহা হইত নিষেধ করিতেছি। — মুসলিম

চার

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ - مسلم، ابوداؤد، ترمذى، نسائى، احمد

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স) কবরগুলিকে পাকা ও কংক্রিট নির্মিত করিতে, উহার পাশে আসন গ্রহণ করিতে ও উহার উপর কোঠা নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। —মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ

পাঁচ

عَنْ اَبِىْ مَرْثَدِ الْغَنَوِىْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا اِلَيْهَا - (مسلم)

আবূ মুরসাদুল গানাভী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কবরের উপর বসিও না, উহার দিকে মুখ করিয়া নামাযও পড়িও না। — মুসলিম

ছয়

عَنْ اَبِىْ الْهَيَّاجِ الْاَسَدِىْ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ رض اَلَا اَبْعَثُكَ عَلٰى مَابَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَّا تَدَعَ تِمْثَالًا اِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُّشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ - (مسلم، ترمذى)

আবূ হাইয়াজ আল-আসাদী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন— আমাকে হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাকে সেই দায়িত্বপূর্ণ কাজে পাঠাইব না, যাহাতে নবী করীম (স) আমাকে পাঠাইয়াছিলেন ? তাহা এই যে, তুমি কোন প্রতিকৃতি নিশ্চিহ্ন না করিয়া ছাড়িবে না এবং কোন উচ্চ কবরকে জমি সমতল না করিয়া ছাড়িবে না। — মুসলিম ও তিরমিযী

আলোচনা এখানে এক সঙ্গে পরপর চরটি হাদীস উল্লেখ করা হইল। হাদীস কয়টি প্রধানত বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে। এই কয়টি হাদীসই কবর সম্পর্কে ইসলামের নীতি সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। হাদীসসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

প্রথম তিনটি হাদীস নবী করীম (স)-এর মৃত্যু শয্যাকালীন সময়ের সহিত সম্পর্কিত। প্রথম ও তৃতীয় হাদীসে একথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় উহার উল্লেখ না থাকিলেও উহাও যে এই সময়ের সহিতই সম্পর্কিত তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিশেষত বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত অপর বর্ণনায় ইহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। মোটকথা, এই তিনটি হাদীসই একই সময়ের। আর একটু গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই তিনটি হাদীসে মূলত একই ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। পার্থক্য যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তাহা শুধু শব্দে ও বর্ণনা ভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ। এই কারণেও এই পার্থক্য হইতে পারে যে, একটি হাদীসে ঘটনার একটি দিকের উল্লেখ করা হইয়াছে; অপর হাদীসে ঘটনার অপর একটি দিকের উল্লেখ হইয়াছে, আর প্রথম দিকটি তাহাতে অনুল্লেখিত রহিয়া গিয়াছে অথবা একটি হাদীসে ঘটনার একটি দিক সংক্ষেপে উল্লেখিত হইয়াছে, অপর হাদীসে তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। অন্তত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে এই কথা অকাট্যরূপে সত্য।

হাদীস কয়টির গুরুত্ব

মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় নবী করীম (স) যাহা ইরশাদ করিয়াছেন, সময় ও পরিবেশের নাজুকতার কারণে তাহার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত রোগের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও নবী করীম (স) যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং মৃত্যুর পূর্বে তাহা বলিয়া যাওয়াই যে তাহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই কারণেও ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকন্তু ইসলামের অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে তিনি নাজুক মুহূর্তে বলিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন এবং বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই তিনি সেই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। এই কারণেও ইহার গুরুত্ব প্রণিধানযোগ্য। ইহার আরও একটি দিক রহিয়াছে। এই কথাগুলি হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ নবী-রাসূল হিসেবে জীবনের শেষ মুহূর্তে বলিয়াছেন, আল্লাহ্র সাহচর্যের জন্য চিরযাত্রার পূর্ব মুহূর্তে উম্মতের প্রতি তাহার শেষ উপদেশ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী এই বাণীর সত্যতা, অকাট্যতা ও গুরুত্ব এই দৃষ্টিতেও অনুধাবনীয়।

নবী করীম (স)-এর ইহা সর্বশেষ উপদেশ হওয়ার ইহার ভিন্নরূপ কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা করিয়া অন্য কথা প্রমাণ করারও কোন অবকাশ ইহাতে নাই। এখন এই সব হাদীসের বিপরীত কথা প্রমাণকারী কোন হাদীস থাকিলে তাহাকেই বরং বাতিল মনে করিতে হইবে এবং তাহার মুকাবিলায় এই হাদীসসমূহে উল্লেখিত কথাকেই এই সম্পর্কে সর্বশেষ চূড়ান্ত ও চিরন্তন ফয়সালা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে এমন কোন কথাই নাই, যাহা বাতিল হইতে পারে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিশেষত ইহা কোন নির্দেশ নয়, এক বিশেষ কাজ সম্পর্কে ইয়াহূদী ও নাসারাদের অভিশপ্ত হওয়ার কথার উল্লেখ মাত্র। কাজেই তাহা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

হাদীস কয়টিতে সাদাসিদাভাবে একটি উপদেশই দেওয়া হয় নাই, বরং ইয়াহূদী ও নাসারাদের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহা একটি মস্ত বড় ফেতনা ও বিপদ এবং নবীর উম্মতগণ তওহীদ বিশ্বাস, আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণের শিক্ষার সম্পদ মজুদ থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের বিপদে পড়িয়া যাইতে পারে। আর নবীর উম্মত যখন এইরূপ বিপদে পতিত হয়, তখন তাহার স্থান হয় নিকৃষ্টতম লাঞ্ছিত ও পদদলিত।

এই কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, হাদীসের অন্যান্য কিতাবেও ইহাই উল্লেখিত রহিয়াছে, আর বুখারী-মুসলিমেও আরও কয়েক সূত্রে এই হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। কাজেই এই হাদীসসমূহ যে অকাট্য সনদভিত্তিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কিন্তু নবী করীম (স)-এর এই সব কথার তাৎপর্য কি ? প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীস হইতে বাহ্যত মনে হয় যে, তিনি উম্মতকে কবর পূজার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করিয়া তাহা পরিহার করার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে মুসলিম জাতির বর্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে বিশেষ দুঃখের সাথে বলিতে হয় যে, কোন কোন লোক নবী করীম (স)-এর জীবন-সায়াহ্নে প্রদত্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশেষ নসীহত পালন করার কোন দায়িত্বই বোধ করে না। এত স্পষ্ট তাগিদপূর্ণ নিষেধ সত্ত্বেও মুসলমানগণ কবর পূজার অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে পতিত হইয়াছে। অথচ মুসলমানদের পূর্বে ইয়াহূদী ও নাসারাগণ ঠিক এই পাপেই লিপ্ত হইয়া চির লাঞ্ছিত হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপে ও গযবে পড়িয়া ধ্বংস হইয়াছে। আর এই পাপ সাধারণ পাপ নয়, ইহা সুস্পষ্টরূপে শির্ক।

কিন্তু এই হাদীসসমূহের এই বাহ্যিক অর্থ ছাড়াও ইহার অন্তর্নিহিত আর এক গভীর অর্থ রহিয়াছে। এই কথা সুস্পষ্ট, সাহাবায়ে কিরাম সম্বন্ধে তো রাসূলের এইরূপ আশংকা হওয়ার কথা নয় যে, তাহারা এইরূপ শির্কের গোমরাহীতে লিপ্ত হইতে পারেন। কেননা ইহা তওহীদের পরিষ্কার বিপরীত। বলা যাইতে পারে যে, এই সব হাদীসে বর্ণিত কথা সাহাবাদের সম্পর্কে নয়। তাঁহারা এইরূপ পাপে লিপ্ত হইতে পারেন আর হইয়াছে— এইরূপ মনে করিয়াই যদি এই কথা বলিতেন তাহা হইলে কথার ধরন ও স্টাইল অন্যরূপ হওয়া উচিত ছিল। ফেতনা সম্পর্কে নবী করীম (স) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তেমনি এই কথাগুলিও বলিতে পারিতেন অথবা নিছক নীতিকথা হিসাবেই এই কথা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এই সব তিনি কিছুই করেন নাই। ইহার পরিবর্তে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন ঃ "সাবধান, তোমরা কবরস্থানকে সিজদার জায়গা বানাইয়া লইও না। আমি তোমাদের নিষেধ করিতেছি।" আর এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে তখন, যখন— যাহাদেরকে ইহা বলা হইতেছে— তাহাদের সম্পর্কে ইহার আশংকা বোধ হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই তিনটি হাদীস একই ঘটনার সহিত সম্পর্কিত। এই জন্য একটি হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা। প্রথম ও তৃতীয় হাদীসে এই কথার উল্লেখ নাই যে, তিনি এই কথা সঠিক বলিয়াছেন, যখন উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালমা (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট হাবশার এক গীর্জা ও উহাতে রক্ষিত চিত্র-প্রতিকৃতির উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত ঃ প্রথম হাদীসে কেবল নেককার লোকদের কবরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে আর তৃতীয় হাদীসে নবীগণ ও নেককার লোক উভয়ের কবরের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। প্রথম হাদীসে আল্লাহ্র লা'নতের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু

দ্বিতীয় হাদীসে উহার পরিবর্তে বলা হইয়াছে ঃ ইহারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টিরূপে গণ্য হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে বলা হইয়াছে যে, নবী ও নেককার লোকদের কবরের প্রতি যাহারা বিশেষ কোন নীতি ও ব্যবহার অবলম্বন করিবে তাহারা অভিশপ্ত ও নিকৃষ্ট সৃষ্টিরূপে গণ্য হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত বা রায় ঘোষিত হয় নাই। অথচ তৃতীয় হাদীসে তাহাদের অভিশপ্ত ও নিকৃষ্ট জীব হওয়ার কোন উল্লেখ নাই। তবে এই ধরনের ব্যবহার ও নীতি গ্রহণ করিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। তৃতীয় হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোক', কিন্তু ইহারা যে কাহারা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে ইয়াহূদী ও নাসারাদের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসে ইহার সহিত এই কথারও উল্লেখ আছে যে, এই সব সিজদার স্থানে নেককার লোকদের চিত্র ও প্রতিকৃতিও রক্ষিত ছিল।

এই সব পার্থক্য-তারতম্যের কারণে বাহ্যত এই হাদীসসমূহকে পরস্পর বিপরীত মনে হয় বটে; কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই হাদীসসমূহের মধ্যে মূলত পারস্পরিক কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য যাহা কিছু আছে, তাহা স্পষ্ট, অস্পষ্ট, সংক্ষেপে ও বিস্তারিত কথার পার্থক্য মাত্র। অন্য কথায় এই হাদীসসমূহের একটি অপরটির ব্যাখ্যা দান করে। কাজেই একটি হাদীসে প্রকৃত তাৎপর্য নির্ধারণের সময় অপর দুইটি হাদীসের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই সব কথা সম্মুখে রাখিয়া আলোচ্য হাদীসসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করিলে প্রথম ও তৃতীয় হাদীস হইতে জানা যায় যে, ইয়াহূদী ও নাসারাগণ তাহাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরকে সিজদার স্থান বানাইত। কিন্তু এই সিজদার স্থানসমূহের প্রকৃত রূপ ও অবস্থা কি ছিল, কিরূপে তাহা সিজদার স্থানে পরিণত হইত, তাহা জানা যায় না। অবশ্য দ্বিতীয় হাদীস হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। যেমন বলা হইয়াছেঃ

> ইয়াহূদী ও নাসারাদের অবস্থা এই ছিল যে, তাহাদের কোন নেককার ব্যক্তি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তখন তাহারা তাহার কবরের উপর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিত আর তাহাতে এই ধরনের প্রতিকৃতি অংকিত করিত। কিয়ামতের দিন তাহারাই আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীবরূপে গণ্য হইবে।

হাদীসের এই অংশ হইতে পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ভাসিত হইতেছে। কোন বুযুর্গ ব্যক্তির ইন্তেকাল হইলে তাহারা এই ব্যক্তির কবর ও উহার আশেপাশের এলাকায় একটি 'ইবাদতের স্থান' বা একটি খানকা প্রতিষ্ঠিত করিত। প্রথমে উহার উদ্দেশ্য ভালই থাকিত আর তাহা হইত এই যে, লোকেরা একত্রিত হইয়া আল্লাহ্র বন্দেগী করিবে। আল্লাহ্র যিকির করিবে। কিন্তু ইহা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এই বুযুর্গ ব্যক্তি ও অন্যান্য বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি বানাইয়া ঝুলাইয়া রাখিত। উদ্দেশ্য এই যে, লোকেরা তাঁহাদের স্মরণ করিয়া তাঁহাদের আদর্শ ও চরিত্র অনুযায়ী আমল করিবে।

কিন্তু বুযুর্গ বা নেককার ব্যক্তির মাযার— তাঁহার প্রতি লোকদের মনে আন্তরিক অসাধারণ ভক্তি ও ভালবাসার সৃষ্টি করিত। উহা 'ইবাদতের স্থান' নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে লোকদের ভক্তি ও ভালবাসার মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করিত। সেই সঙ্গে প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি এই ভালবাসাকে বাস্তব রূপ দিত। ফলে কিছুদিনের মধ্যে আল্লাহ্র ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে নবীপূজা ও

অলীপূজা অনুষ্ঠিত হইতে শুরু হইত। লোকেরা এক আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা নত করার ও আল্লাহ্‌র খোদায়ী গুণাবলীকে তাঁহার সহিত খোঁজ করার পরিবর্তে এই সব মহান লোকদেরকে খোদায়ী ও আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে শরীক মনে করিত এবং পূজা ভালবাসায় ফুল তাহাদের পায়ের তলায় লুটাইয়া দিত অর্থাৎ যে সব 'ইবাদতের স্থান' খালেস তওহীদের কেন্দ্র হওয়া উচিত ছিল, তাহাই শির্‌ক ও গোমরাহীর লীলাকেন্দ্রে পরিণত হইয়া যাইত।

এখানে যাহা কিছু বলা হইল অন্যান্য হাদীস হইতে তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। প্রথম ও তৃতীয় হাদীসের তাৎপর্যও ইহাই। কেননা এই হাদীসসমূহ সংক্ষিপ্ত; অন্যান্য হাদীস বিস্তারিত। প্রায় সকল মুহাদ্দিসই ইহার এই তাৎপর্য বুঝিয়াছেন। এই জন্যই এই হাদীসসমূহ 'কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীসের বাকী অংশঃ ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ হইতে বাহ্যত এই অর্থ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা 'ইবাদত স্থানে'র দুয়ার প্রাচীরে মহান ব্যক্তির ছবি-প্রতিকৃতি বানাইয়া রাখিত। কিন্তু গীর্জায় ইহার সাধারণ প্রচলন ছিল। এই সকল গীর্জায় হযরত ঈসা মসীহ (আ), হযরত মরিয়ম ও অন্যান্য খ্রিস্টীয় মহান লোকদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হইত ও নিঃসংকোচে উহার পূজা করা হইত।

মহান লোকদের মাযার কিংবা উহার এলাকার মধ্যে 'ইবাদত স্থান' ও খানকা-কুব্বা নির্মাণের পরিণাম কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকে অলী ব্যক্তিদের মহান করার কারণে শির্‌কী অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। কোন কোন স্থানে এই সব মাযার বা কুব্বা শীঘ্র বা বিলম্বে শির্‌কের লীলাকেন্দ্র হইয়া পড়ে; কেবল ইয়াহূদী ও নাসারাদের ইতিহাসই এই কথা প্রমাণ করে না, মুসলিম উম্মতের ইতিহাসেও এই কথার প্রমাণ রহিয়াছে।

নবী করীম (স) এই আশংকা সম্ভবত বোধ করিতেন না যে, তাঁহার পরেই লোকরা কবর পূজা ও মূর্তিপূজা প্রভৃতি ধরনের কোন শির্‌কের কাজে লিপ্ত হইবে।— কোন কোন হাদীস হইতে সুস্পষ্টভাবে ইহা প্রমাণিতও হয় যে, তিনি এইরূপ আশংকা বোধ করিতেন না। কিন্তু ইয়াহূদী ও নাসারাদের অবস্থা দৃষ্টিতে এই আশংকা তাঁহার অবশ্যই ছিল যে, উম্মতের লোকেরা সালেহ লোকদের কবর বা উহার আশেপাশে মসজিদ, খানকা বা কুব্বা বানাইতে পারে এবং কিছুকাল পরে তাহা সিজদার মাধ্যমে শির্‌ক-এর কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে। এই কারণে তিনি মুসলিম উম্মাহর মাঝে শির্‌ক অনুপ্রবেশের এই গোপন দুয়ারও বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ হাদীসে তিনটি সুস্পষ্ট আদেশ ও নিষেধ উল্লেখিত হইয়াছে ঃ (১) কবর পাকা-পোক্ত করা, (২) কবরের উপর কোন কিছু বসানো ও (৩) কবরের উপর (বা পাশে) বসা। এই কয়টি কাজ কবর পূজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। বস্তুত ইসলামে শির্‌ক হইতেছে সবচেয়ে বড় গুনাহ, সব রকমের গোমরাহীর ভিত্তি উৎস এবং ইহা তওহীদবাদী জনগোষ্ঠীর পতনের প্রধানতম কারণ। এই কারণে ইসলামে কেবল শির্‌ককেই নিষিদ্ধ করা হয় নাই; শির্‌ক হয় যে সব কাজে, তাহাও স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় কড়াকড়ি বিদ্যমান। আর কোন কোন পাকা-পোক্ত কবর ও অলী-দরবেশের কবর কুব্বা যে শির্‌ক ও শির্‌কের নানা প্রকার অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তো দুনিয়ায় বাস্তবেই লক্ষ্য করা যায়। যাহারা অলী লোকের তা'যীমের বাহানায় নবী-করীম (স)-এর এই সুস্পষ্ট নিষেধের

বিপরীত কাজ করে— তাহাদের জন্য বড়ই দুঃখ হয়। ইহারা যে এই পথেই উম্মতে মুসলিমার মধ্যে শির্‌কের প্রচলন করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

কবরের উপর (বা পাশে) বসা নিষিদ্ধ হইয়াছে দুইটি কারণে ঃ একটি মানুষের সম্মান অথবা মৃতু-মানুষের প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আশংকা। আর দ্বিতীয়, কবরে যে মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় তাহার মাত্রা কম হওয়ার আশংকা।

পঞ্চম হাদীসে অতিরিক্ত হুকুম দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতেছে ঃ কবরের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িও না। 'কবরকে কিবলা বানাইও না'। এই কথা বলা হয় নাই, কেনানা কিবলা তো কাবা শরীফ আছেই, তাহা ব্যতীত অপর কোন জিনিসকে নামাযের কিবলা বানাইবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। উহা ছাড়া আর কোন জিনিসের প্রতি মুখ করিয়া নামায আদায় হইতে পারে ? এই কথার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু বলা যে, কিব্‌লা ও নামাযীর মাঝখানে কবর রাখিয়া যেন নামায পড়া না হয়। কেননা ইহাতে প্রকারান্তরে কবরকেই সিজদা করা হয় এবং নামাযে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কবরওয়ালাকেও শামিল করা হয়। আর ইহা অতি বড় শির্‌ক— সন্দেহ নাই।

যষ্ঠ হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ তোমরা প্রতিকৃতি ধ্বংস না করিয়া থাকিও না আর উঁচু কবরগুলিকে জমির সমান না করিয়া ছাড়িও না। এই দুইটি আদেশও কবর সিজদার মারাত্মক শির্‌ক নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হইয়াছে।

শির্‌ক ও শির্‌ক প্রকাশক এবং শির্‌ক-এর উপকরণ সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত ফয়সালা ইহাই। কবর সম্পর্কে ইহাই ইসলামের চিরন্তন ঘোষিত নীতি। ইহার বিপরীত কোন কাজ বরদাশত করাও ইসলামের খেলাফ, কোন ঈমানদার লোকের পক্ষেই তাহা সম্ভব নয়।

শির্‌ক ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ زَارَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْرَ اُمِّهٖ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهٗ فَقَالَ ﷺ اِسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ وَاسْتَاْذَنْتُهٗ فِىْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا - فَاَذِنَ لِىْ فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ (একদা) হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার মার কবর যিয়ারত করিলেন, তখন তিনি নিজে খুব কাঁদিলেন এবং তাঁহার চতুস্পার্শ্বে যাঁহারা ছিলেন, তাহাদিগকেও কাঁদাইলেন। অতঃপর নবী করীম (স) বলিলেন ঃ আমি আমার আল্লাহ্‌র নিকট আমার মা'র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাহিয়াছিলাম কিন্তু আমাকে উহার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তাহার পর আমি তাঁহার কবর যিয়ারত করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অনুমতি চাহিলাম। পরে আমাকে ইহার অনুমতি প্রদান করা হয়। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর; কেননা ইহা তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। — মুসলিম

ব্যাখ্যা এখানে হাদীসটি মুসলিম গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজা গ্রন্থসমূহেও নির্ভরযোগ্য সনদসূত্রে উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব ইহা একটি সহীহ হাদীস।

বস্তুত আল্লাহ্‌র নিয়ম-নীতি অটল, নিরপেক্ষ ও তীক্ষ্ণ-শাণিত। তাঁহারই নিয়ম এই যে, শির্‌ক অবস্থায় যাহারা মরিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত পাইতে পারে না। এই কারণে এই ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাতের দো'আও করা যাইতে পারে না। কুরআন মজীদেই এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিষেধ ঘোষিত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীসে এই কথাই বলা হইয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জননী যখন ইন্তেকাল করিয়াছেন, তখন দুনিয়া শির্‌কে আচ্ছন্ন ছিল, তওহীদের একবিন্দু আলোও কোথাও বর্তমান ছিল না। এই কারণে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মনে তাঁহার জননীর পরিণাম সম্পর্কে বিশেষ আশংকা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি হাত তুলিয়া তাহার জননীর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাতের দো'আ করিতে সাহস করেন নাই। তাই আল্লাহ্‌র নিকট এইরূপ প্রার্থনা করার জন্য প্রথমত অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁহার প্রিয় হযরতকে ইহার অনুমতি দেন নাই। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনাই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মুশরিক পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যাওয়ার সময় এই ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট তাহার জন্য মাগফিরাত চাহিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে আল্লাহ্‌র এই তীব্র শানিত ও নিরক্ষেপ নিয়মের কারণে অনুরূপ প্রার্থনা হইতে বিরত থাকিতে হইল। এই ঘটনাও কুরআন মজীদে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই ঘটনাদ্বয় তওহীদ বিশ্বাসীদের জন্য বড়ই শিক্ষামূলক। শ্রেষ্ঠ নবীগণের পিতামাতার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র নিয়মে একবিন্দু ব্যতিক্রম সাধিত হয় না, আল্লাহ্‌র আইনের উর্ধ্বে কেহ নাই, তিনি নবী হন আর পীর-অলীই হন। এমন কি নবীর আবেদন-নিবেদনও এই ব্যাপারে কার্যকর হইতে পারে না। আল্লাহ্‌র বিচারের মানদণ্ডে মুক্তি ও নাজাতের জন্য সকল মানুষের ব্যাপারে একই নীতি কার্যকর হইয়া থাকে। আর তাহা হইতেছে শির্‌ক হইতে পবিত্র থাকা ও তওহীদের মানদণ্ডে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হওয়া। বলা বাহুল্য, রাসূলের প্রতি ঈমান ও পরকাল বিশ্বাসও এই তওহীদ বিশ্বাসেরই অনিবার্য অংশ।

আলোচ্য হাদীস হইতে এই কথাও জানা যায় যে, কবরস্থানে যাওয়া শরীয়ত সম্মত, ঈমানদার লোকদের জন্য বিশেষ উপকারী। স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (স) ইহার যুক্তি হিসাবে বলিয়াছেন ঃ 'কবর জিয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।' অর্থাৎ কবরস্থানে উপস্থিত হইয়া যখন অসংখ্য মানুষকে সমাহিত দেখিতে পাইবে তখন স্পষ্টত মনে হইবে, মৃত্যু কত নিশ্চিত, কত অনিবার্য। এই সব লোকও একদিন তোমাদেরই মতো জীবিত ছিল, দুনিয়ার কাজকর্ম করিত। কিন্তু মৃত্যু তাহাদের জীবন কাড়িয়া লইয়াছে, জমির উপর হইতে সরাইয়া উহার অভ্যন্তরে সমাহিত করিয়া দিয়াছে। আজ তাহাদের কিছুই করিবার সামর্থ্য নাই; না নিজেদের জন্য, না পরের জন্য। যিয়ারতকারীকে এই কথাও স্মরণ করাইয়া দিবে যে, তাহার পরিণতিও একদিন ইহাই হইবে। অতএব জীবনের এই আয়ুষ্কালটুকুকে মূল্যবান মনে কর, গুরুত্বপূর্ণ মনে কর। মনে রাখিও, জীবন একবার ফুরাইয়া নিঃশেষ হইয়া গেলে দ্বিতীয়বার হাতে আসিবার নয়। মৃত্যুর এই স্মরণ মানব-মনের দুনিয়ার প্রতি এমন কোন আকর্ষণ বা ভালবাসা থাকিতে দিবে না যাহা মানুষকে গাফিল করিয়া দেয় ও দুনিয়ার আনন্দে মশগুল

করে। বস্তুত ইহা মানুষকে বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎ তথা পারলৌকিক পরিণাম সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক করিয়া দেয়। কাজেই কবর যিয়ারত করা এই জন্য এক অমোঘ পন্থা সন্দেহ নাই।

কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ করা এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্য কবরস্থানে যাওয়া এক কথা আর কোন কবরবাসীর নিকট হইতে 'ফায়য' গ্রহণ করা, তাহার নিকট দো'আ করা ও নানাবিধ মুশরিক কাজ করার উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথম কাজ শরীয়ত সম্মত ও সুন্নত মুতাবিক। কিন্তু দ্বিতীয় কাজ সম্পূর্ণ হারাম, ইহা শির্কের মারাত্মক রূপ। নবী করীম (স) এই কারণেই প্রথম পর্যায়ে সাহাবীদেরকে পর্যন্ত কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। করিয়াছিলেন এই আশংকায় যে, ইহার দরুন শির্কের এক বিন্দু ভাবও যেন মনে না জাগে। পরে যখন তাহাদের সম্পর্কে রাসূল সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইলেন তখন উহার অনুমতি প্রদান করিলেন।

عَنْ سعيدبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْه قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً اَشْهَدُلَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَااَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتّٰى قَالَ اَبُوْطَالِبٍ اٰخِرَمَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاَبٰى اَنْ يَّقُوْلَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَ وَاللّٰهِ لَاَ سْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ - اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ - (مسلم)

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব তাবেয়ী তাঁহার পিতা হযরত মুসাইয়্যিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, যখন আবূ তালিবের নিকট মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল তখন নবী করীম (স) তাহার নিকট আসিলেন। সেখানে তিনি তাহার নিকট আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরাকে দেখিত পাইলেন। নবী করীম (স) বলিলেন, হে চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা পাঠ করুন, আমি ইহার বলে আল্লাহ্‌র নিকট আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দান করিব। তখন আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়া বলিল, হে আবূ তালিব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হইতে ফিরিয়া যাইবে? কিন্তু নবী করীম (স) তাহার নিকট এই কথাই বারবার পেশ করিয়া যাইতেছিলেন। শেষ

পর্যন্ত আবূ তালিবের মুখ হইতে যে কথা প্রকাশ হয় তাহা ছিল এই যে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মেই আছে এবং সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কালেমা পাঠ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ ইহা সত্ত্বেও আমি আল্লাহ্‌র নিকট আপনার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করিতে থাকিব— যতক্ষণ না আমাকে তাহা হইতে নিষেধ করা হইবে। পরে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ 'নবী ও ঈমানদার লোকদের পক্ষে, মুশরিকগণ অবশ্যই জাহান্নামী জানিবার পর মুশরিক লোকদের জন্য ইসতিগফার করা জায়েয নয়— যদিও তাহারা নিকটাত্মীয় হউক না কেন। আর আবূ তালিবের সম্পর্কে এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে করীম (স) কে বলিয়াছেন, 'হে নবী' তুমি যাহাকে চাহিবে তাহাকে হেদায়েত করিতে পারিবে না; বরং প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ যাহাকে চাহেন হেদায়েত দান করেন, তিনি হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত।

— মুসলিম

ব্যাখ্যা শির্‌ক অবস্থায় মৃত ব্যক্তিদের জন্য না মাগফিরাতের দো'আ করা যায়, না সে আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত লাভ করিতে পারিবে। উপরিউক্ত হাদীস হইতে এই কথাই অধিক সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইতেছে। এই ব্যক্তি কোন মহান শ্রেষ্ঠ নবীর নিকটাত্মীয় ও প্রিয়তম হইলেও এবং তাহার দ্বারা ইসলামের বড় ফায়দা লাভ হইলেও মূল অবস্থা কোনরূপ পরিবর্তন হইবার নয়।

আবূ তালিব হযরত আলী (রা)-এর পিতা এবং নবী করীম (স)-এর সহোদর চাচা ছিল। রাসূলে করীম (স) তাঁহারই স্নেহময় ক্রোড়ে লালিত-পালিত বর্ধিত হইয়াছেন। আবূ তালিব রাসূলের ইসলামী দাওয়াত কবুল করেন নাই বটে; জীবনকাল পর্যন্ত রাসূলে করীম (স)-এর পৃষ্ঠপোষকতা— সাহায্য ও প্রতিরোধ করিতে একবিন্দু ক্রটি করেন নাই। অন্য কথায় সে ছিল রাসূলের বাৎসল্যপূর্ণ মুরব্বী। ইসলাম ও মুসলমানদের বড় পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই রাসূলের মনে এই বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল যে, অবূ তালিব ইসলাম কবুল করুক এবং ফলে তাহার পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত হউক। দ্বিতীয়ত তাহার ইসলাম কবুল করার ফলে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলন অতিশয় জোরদার ও প্রভাবশালী হওয়ার আশাও ছিল অত্যন্ত তীব্র। কিন্তু রাসূলের এই বাসনা পূর্ণ হয় নাই।

হাদীস হইতে জানা যায় যে, আবূ তালিবের মুমুর্ষূ অবস্থা পর্যন্ত নবী করীম (স) তাহাকে ইসলামের পথে আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তকালীন চেষ্টাও সফল হয় নাই। আবূ তালিব বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করিত প্রস্তুত হয় নাই।

হকপন্থী লোক ও বাতিলপন্থী লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দাওয়াতের পদ্ধতির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাও আলোচ্য হাদীস হইতে জানিতে পারা যায়। বাতিল নীতি ও ধর্ম সব সময়ই ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক ও দলীয় কোন্দল এবং পূর্ব-পুরুষ পূজার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া থাকে কিন্তু হক ধর্ম ও আদর্শ কেবলমাত্র সত্যের বুনিয়াদে দৃঢ় হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই জন্য মন-মগজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করে। সত্য আদর্শ সব সময় সামনাসামনি উপস্থিত হয়, বাতিল উহার সরাসরি মুকাবিলা না করিয়া পেছন দিক হইতে উহার উপর আক্রমণ চালায়। নবী করীম (স)-এর দাওয়াতের সারকথা এই ছিল যে, শির্‌ক পরিত্যাগ করিয়া তওহীদী আকীদা গ্রহণ কর কেননা এই নীতিই নির্ভুল ও আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য। ইহলৌকিক সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি একমাত্র ইহারই উপর নির্ভরশীল। ইহার জওয়াবে আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া এই কথা বলিতে পারে নাই যে, "তোমার

এই দাওয়াত ভুল, নীতি ও আদর্শ কল্যাণকর নয়, পরকালীন মুক্তিও ইহা হইতে লাভ করা যায় না, এবং তাহা কেবল শিরকী আকীদা হইতেই পাওয়া যায়।"এই সব কথা না বলিয়া আবদুল মুত্তালিবের ব্যক্তিত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিল বাপ-দাদার ভালবাসা ও পূর্বপুরুষ পূজার লৌকিক ভাবধারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া আবূ তালিবকে সত্যের পথ গ্রহণ হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিল। ইহাতে তাহারা সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। আর এই পদ্ধতি পুরাতন হইলেও আজিও সত্য আদর্শের মুকাবিলায় একমাত্র এই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়। আজিও সত্যের মুকাবিলায় ও বাতিল নীতির সমর্থনে অতীত কি বর্তমান কালের কোন না কোন ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করা হয়, জাতীয়, বংশীয়, কি দলীয় বিদ্বেষ জাগাইতে চেষ্টা করা হয়। কাহারও মুখে প্রাচীণ কাল হইতে চলিয়া আসা রীতিনীতির দোহাই শোনা যায়।

এই হাদীস হইতে এই কথাও জানা যায় যে, ব্যক্তিত্বের পূজা ও পূর্বপুরুষদের পূজা সত্য আদর্শ গ্রহণের পথে প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। প্রকৃত সত্য গ্রহণ করা কেবলমাত্র তাহাদের পক্ষেই সম্ভব, যাহারা এই সব আবিলতার বন্ধন হইতে নিজেদের মন-মগজকে মুক্ত রাখিতে পারে।

আলোচ্য হাদীস হইতে ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও ইসলামী দাওয়াতের কর্মীর জন্য অনুসরণযোগ্য কতক নিয়ম ও ভাবধারা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়। রাসূলে করীম (স) খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায়ই তাঁহার দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বে তাহার মধ্য হইতে গভীর আন্তরিক নিষ্ঠা, দরদ, আবেগ ও উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহা এক উত্তম আদর্শ। ইহা হইতে এই কথাও প্রকাশিত হয় যে, ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদের কখনও নিরাশাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক না কেন, তাহারা কখনও ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিতে পারে না। বরং তাহাদের প্রচেষ্টা অবিশ্রান্তভাবেই চলিতে থাকিতে হইবে, চেষ্টা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, আবার উঠিয়া চেষ্টায় লাগিয়া যাইবে— ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদের ইহাই কর্মনীতি। ইহার দ্বারাই তাহারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতে পারে।

নবী করীম (স)-এর ইসলামী দাওয়াত আবূ তালিব কবুল করে নাই, সে তাহার বাপ-দাদার ধর্মেই অটল হইয়া রহিল, নবী করীম (স)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহা দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, কোন সমাজে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব সাধন তো দূরের কথা, কাহারও হৃদয় পরিবর্তন করিয়া দেওয়ার এবং ইসলামে দীক্ষিত করা কোন মানুষ— কোন শ্রেষ্ঠ নবীরও নিজস্ব সাধ্যের মধ্যে নাই। ইহা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র কাজ। কুরআন মজীদে এই কথাই বলা হইয়াছে নবী করীম (স) কে সম্বোধন করিয়াঃ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ তুমি যাহাকে চাও, তাহাকে তুমি হেদায়েত করিতে পার না— পারিবে না। সূরা কাসাস ঃ ৫৬

ফলে একজন মুমিনের কাজ হইতেছে শুধু চেষ্টা করিয়া যাওয়া, চেষ্টায় যাহাতে একবিন্দু ক্রটি না থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা। একইভাবে চেষ্টা করিতে থাকা।— অবিশ্রান্ত চেষ্টায় শুধু লাগিয়া থাকা।

প্রথম আয়াতটি সূরা তওবার, ইহা মাদানী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হইয়াছে। আর দ্বিতীয় আয়াতটি যদিও মক্কায় অবতীর্ণ সূরা কাসাস-এর, কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিত এই আয়াতদ্বয় নাযিল হইয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা ইসলামী দাওয়াতের এক সাধারণ নীতি বিশেষ।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اٰخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَّتِهٖ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْاِيْمَانِ فَاَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَاَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ-
(بيهقى)

আবূ সাঈদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হইতেছে খুঁটির সহিত (রশি দ্বারা বাধা) ঘোড়া, যাহা চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ঘুরিয়া আসে। অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরাও ভুল করিয়া থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঈমানের দিকেই ফিরিয়া আসে। অতএব তোমরা মুত্তাকী লোকদের তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং ঈমানদার লোকদের সহিত অত্যন্ত ভাল ব্যবহার কর। — বায়হাকী।

ব্যাখ্যা হাদীসে উল্লেখিত দৃষ্টান্তটি প্রণিধানযোগ্য। একটি ঘোড়া লম্বা রশি দ্বারা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা থাকে, ঘোড়াটি ঘাস খাইতে খাইতে বহু দূরে চলিয়া যায়, ততদূর চলিয়া যায় যতদূর রশি উহাকে অনুমতি দেয়। যখনই রশিতে টান পড়ে, তখন ঘোড়া খুঁটির দিকে ফিরিয়া আসে। ঘোড়াটি রশিতে বাঁধা, রশির বাহিরে যাওয়া উহার পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুত একজন ঈমানদার লোকও ঈমানের রশি দ্বারা বাঁধা হইয়া থাকে। তাহার বাস্তব জীবন ঈমানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঈমান তাহাকে যে যে কাজ করিতে অনুমতি দেয়, সে তাহাই করে; আর যে যে কাজ করিতে নিষেধ করে, সেই সেই কাজ হইতে সে বিরত থাকে। ঈমানদার ব্যক্তির নীতি এই হয় যে, জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইতে যখনই এমন কোন কাজ সম্মুখে উপস্থিত হয় যাহা ঈমানের পরিপন্থী, অমনি সে সেই কাজ হইতে অন্যদিকে ফিরিয়া যায়। তাহার জীবন আদর্শ ভিত্তিক— আদর্শের রশি দ্বারা বাঁধা, বল্গাহারা সে মোটেই নয়। বল্গাহারা ঘোড়াও যেমন কোন কাজে আসে না, যেদিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকেই ছুটিয়া যায়, যে চারণ ভূমিতেই ইচ্ছা হয় চরিতে শুরু করে। ঈমানহারা মানুষও ঠিক অনুরূপভাবে লালসার দাস হইয়া থাকে। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই সে করে; যেদিকেই দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই হয় তাহার পদক্ষেপ। কিন্তু এই ধরনের জীবন সভ্য, সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মানুষের হইতে পারে না।

প্রকৃত ঈমান ও ইসলামই মুক্তি বিধান করিতে পারে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَوْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض شَكَّ الْاَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْاَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا لَوَا ضِحَنَا

فَاَكَلْنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِفْعَلُوْا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلٰكِنْ اَدْعُهُمْ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَدَعَا بِنَطْعٍ فَبَسَطَ ثُمَّ دَعٰى بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ الْاٰخَرُ بِكَسْرَةٍ حَتّٰى اَجْمَعَ عَلَى النَّطْعِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ يَسِيْرٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوْا فِيْ اَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَاَخَذُوْ فِيْ اَوْعِيَتِهِمْ حَتّٰى مَا تَرَكُوْا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً اِلَّا مَلَئُوْهُ قَالَ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَفَضَلَتْ فُضْلَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ (مسلم)

আ'মার তাবেয়ী নিজ উস্তাদ আবূ সালেহ হইতে হযরত আবূ হুরায়রা অথবা আবূ সাঈদ খুদরীর এই বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাবুক যুদ্ধের সময় (যখন রসদ ফুরাইয়া গিয়াছিল ও ক্ষুধায় লোকদের খুবই কষ্ট হইতেছিল, তখন) তাহারা নবী করীমের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, 'আপনি অনুমতি দিলে পানি বহনকারী উট যবেহ করিয়া আমরা খাইতে পারি এবং তাহা হইতে বহু তৈলও সংগ্রহ করতে পারি। নবী করীম (স) বলিলেন ঃ 'করিতে পার।' হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রা) আসিয়া নবী করীম (স)-এর নিকট নিবেদন করিলেন, হুযুর, আপনি এইরূপ করিলে (লোকদের উট যবেহ করিয়া খাইতে অনুমতি দিলে) যানবাহন-জন্তুর অভাব দেখা দিবে (কাজেই এইরূপ করা সমীচন নয়)। অবশ্য লোকদেরকে যদি আপনি প্রত্যেকের নিকট অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য একত্রিত করার নির্দেশ দেন এবং তাহাতে 'বরকত' হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ তাহাতে বহু বরকত দান করিবেন। নবী করীম (স) বলিলেন ঃ ইহা খুবই সত্য কথা। অতঃপর তিনি চামড়ার বড় দস্তরখানা আনাইয়া বিছাইয়া দিলেন এবং প্রত্যেকের নিকট অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। ইহার ফলে কেহ একমুঠি দানা আনিল; কেহ একমুঠি খেজুর আর কেহ এক টুকরা রুটি লইয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর স্বল্প পরিমাণ এই দ্রব্য দস্তরখানে জমা হইল। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন যে, অতঃপর নবী করীম (স) উহাতে 'বরকত' হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিলেন এবং লোকদের বলিলেন— তোমার নিজ নিজ পাত্র ভরিয়া খাদ্যদ্রব্য উঠাইয়া লও। সকলেই হযরতের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ পাত্র পুরিয়া লইল, এমনকি (প্রায় ত্রিশ হাজার) সৈন্যের কাহারও একটি পাত্রও অপূর্ণ থাকিল না। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সকলে আহার করিল এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত খাইল। ইহার পরও কিছু অবশিষ্ট রহিয়া গেল। অতঃপর নবী করীম (স) বলিলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। বাস্তবিক পক্ষে কোন বান্দা যদি কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ব্যতীতই

পরিপূর্ণ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে এই দুইটি কথার সাক্ষ্যদানসহ আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে বেহেশত হইতে কখনও বঞ্চিত করা হইবে না। — মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটির মূল বক্তব্য সুস্পষ্ট। ইহার শেষাংশই এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইহাতে নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র তওহীদ (একত্ববাদ) ও নিজের নবুয়্যতের সাক্ষ দান করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, যে ব্যক্তিই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিক বিশ্বাস লইয়া এই দু'টি কথার সাক্ষ্য দান করিবে এবং এই ব্যাপারে মন ও মগজে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয়ের প্রশ্রয় না দিবে ও এইরূপ অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশতবাসী হইবে।

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা ভঙ্গির সহিত যাহাদের বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে, তাহারা এই রূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র তওহীদ ও রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্যদানের প্রকৃত তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করিতে পারেন। ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে নবী করীম (স)-এর উপস্থাপিত ঈমানের দাওয়াতকে হৃদয় মন দিয়া কবুল করা এবং তাঁহার প্রচারিত দ্বীন-ইসলামকে নিজ জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা। এইজন্য এই দুইটি বিষয়ের সাক্ষ্যদান করিলে— চিরদিনই মনে করা হইয়াছে যে,— সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই নবী করীম (স)-এর দেওয়া ঈমানের দাওয়াত ও ইসলামকে নিজ জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু কোন কোন লোক যদি কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দান করিয়াও ইসলামকে নিজ জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শরূপে গ্রহণ না করে, বরং ইসলাম ভিন্ন অপর কোন মতাদর্শ অনুযায়ী বাস্তব জীবন যাপন করে কিংবা তওহীদ ও রিসালাত ছাড়া কিয়ামত ইত্যাদিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে তবে বেহেশতবাসী হওয়ার সুসংবাদ তাহার জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

শুধু এই হাদীসই নয়, যে যে হাদীসেই শুধু এই কালেমা পাঠ করা বা বিশ্বাস করার পরিণাম স্বরূপ বেহেশতবাসী হওয়ার সুসংবাদ উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিরই অর্থ হইতেছে নবী করীম (স)-এর উপস্থাপিত ঈমানের দাওয়াতকে বাস্তবে কবুল করা ও ইসলামকে বাস্তবক্ষেত্রে অনুসরণ করা।

আলোচ্য হাদীস হইতে প্রসঙ্গত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়।

(ক) কোন মহান ব্যক্তি— এমনকি নবী ও রাসূলও যদি কোন বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেন এবং অপর কোন সচেতন ব্যক্তি যদি উহার ত্রুটি লক্ষ্য করেন, তবে সম্ভ্রম ও সৌজন্য রক্ষা করিয়া নিজের মত প্রকাশ করা ও সঠিক পরামর্শ দিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ না করা একান্তই কর্তব্য। পক্ষান্তরে সেই মহান ব্যক্তিরও তাহা শান্তভাবে শ্রবণ করা, পরামর্শটি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রকাশিত মতটি নির্ভুল ও উত্তম মনে হইলে তাহা অকপটে গ্রহণ করা ও নিজের মত প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়।

(খ) খাদ্য বা প্রভৃতি জাতীয় ও সামগ্রিক বিপদকালে ঐক্যবদ্ধভাবে উহার সম্মুখীন হওয়া এবং খাদ্যসামগ্রী যতটুকু ও যাহা কিছুই বর্তমান আছে, তাহা সমান ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া ও তাহাতে 'বরকত' হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করাই ইসলামী নীতি। অপর মানুষের অভাব-অনটনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করা ইসলামী সমাজের নীতির বিপরীত।

(গ) আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করিলে তাহা কবুল হওয়া এবং বিশেষত উহার ফলে কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা দেওয়া আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা ঈমানদার লোকদের ঈমান বৃদ্ধি ও উহাতে দৃঢ়তা লাভ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহাকে যাহারা 'অলৌকিক' বলিয়া হাসিয়া উড়িয়াইয়া দিতে চায়, তাহাদের মনে যে একবিন্দু ঈমান নাই বরং প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মন-মগজ এক কঠিন বস্তুবাদের রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তাওহীদ বিশ্বাসের গুরুত্ব

عَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (مسلم)

হযরত উসমান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মরিবে এই অবস্থায় যে, সে জানে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া আর কেহ ইলাহ নাই, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। — মুসলিম

ব্যাখ্যা অতীত ও বর্তমানের সকল সত্যপন্থী লোকদের সর্বসম্মত বিশ্বাস এই যে, যে ব্যক্তি তওহীদ বিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সে অবশ্যই বেহেশতে দাখিল হইতে পারিবে। এই ব্যক্তি যদি গুনাহ-খাতা হইতে একেবারেই মুক্ত থাকে— যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাগল হইয়াছে এমন ব্যক্তি এবং শিরক হইতে খালিস ও খাঁটি তওবাকারী ব্যক্তি, যদি তওবার পর কোন গুনাহেই সে লিপ্ত না হইয়া থাকে। এই সকল প্রকার লোকই বেহেশতে যাইতে পারিবে এবং ইহারা কেহই দোযখে যাইবে না। অবশ্য জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত সকলকেই পার হইতে হইবে। কুরআন মজীদে স্পষ্ট বলা হইয়াছে ঃ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا —তোমাদের প্রত্যেককেই জাহান্নামের উপর রক্ষিত পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। —সূরা মরিয়ম ঃ ৭১

কিন্তু যাহারা কবীরা গুনাহ্ করিয়া তওবা না করিয়াই মরিয়া যাইবে, তাহাদের পরিণাম সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন; তিনি ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দিয়া, তাহাদেরকে প্রথমেই বেহেশতে দাখিল করিয়া দিবেন। আর ইচ্ছা করিলে যতটুকু চাহিবেন তাহাকে প্রথমে আযাব দিয়া পরে বেহেশতে দাখিল করিবেন। তবে এই কথা চূড়ান্ত যে, কোন তওহীদ বিশ্বাসী ব্যক্তিই জাহান্নামে চিরদিন থাকিতে বাধ্য হইবে না— সে যত বড় গুনাহই করুক না কেন। ঠিক যেমন কুফরী অবস্থায় মৃত কোন ব্যক্তিই কখনো বেহেশতে দাখিল হইতে পারিবে না, সে যত নেক কাজই করুক না কেন। ইহা ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত এক মূলনীতি বিশেষ, কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইজমা হইতে এই কথাই প্রমাণিত এবং মুসলিম সমাজে শুরু হইতে চলিয়া আসা এক স্থায়ী আকীদা।

কাজী ইয়ায উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও কালেমায়ে শাহাদাতে বিশ্বাসী লোক যদি আল্লাহ্র নাফরমানীর কোন কাজ করে, তবে তাহার পরিণাম কি হইবে, এই সম্পর্কে মতবেধ রহিয়াছে। 'মুরজিয়া' নামক দলের ধারণা এই যে, ঈমান থাকিলে নাফরমানীর কোন কাজই একবিন্দু ক্ষতি করিতে পারে না। খাওয়ারিজদের ধারণা; এই গুনাহ

অবশ্যই ক্ষতি করিবে, শুধু ক্ষতিই নয়, এইরূপ ব্যক্তি সম্পূর্ণ কাফির হইয়া যায়। আর মুতাজিলাগণের মত এই যে, গুনাহ কবীরা করিলে চিরদিন জাহান্নামে থাকিতে হইবে এবং তাহাকে না মুমিন বলা যাইবে, না কাফির; আর 'আশআরী' মতের লোকদের বিশ্বাস এই যে, তাহার গুনাহ মাফ না হইলে এবং সে জন্য তাহাকে আযব দেওয়া হইলেও সে মুমিনই। আর তাহাকে জাহান্নাম হইত বাহির করিয়া আনিয়া নিশ্চয়ই বেহেশতে দাখিল করা হইবে।

কিন্তু আলোচ্য হাদীস খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের মতের প্রতিবাদ করে এবং তাহা যে সত্যমত নয়, তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। আর মুরজিয়াদের মত এই হাদীসের বিপরীত কিছু নয়। এই হাদীসের একটু ব্যাখ্যা করিলেই তাহাদের মত প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ যে লোক তওহীদ বিশ্বাসী হইয়া মরিবে, সে তাহার গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে দাখিল হইতে পারিবে।

রাসূলের ব্যবহৃত শব্দ هُوَ يَعْلَمُ 'সে জানে' হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, তওহীদের কেবল মৌখিক স্বীকৃতিই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। এই জন্য ইহা তাহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস— জ্ঞানভিত্তিক আকীদা হইতে হইবে। অপর এক হাদীসে রাসূলের এই ব্যাখ্যাংশের উল্লেখ রহিয়াছে। غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِمَا আল্লাহ্‌র তওহীদ ও রাসূলের রিসালাত সম্পর্কে এক বিন্দু সন্দেহশীল নয়...।" আবার কোন হাদীসে قَالَ (বলিল) কোনটিতে شَهِدَ (সাক্ষ্য দিল) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ যে তওহীদের মৌখিক স্বীকৃতি দিবে। এই সর্ব হাদীসের সমন্বয়ে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, 'তওহীদ' বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইলে; উহাতে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় না থাকিলে এবং উহার মৌখিক ঘোষণা দিলেই একজন লোক বেহেশতবাসী হইবার অধিকারী হইবে।

হাসান বসরী বলিয়াছেন, এই পর্যায়ে যত হাদীসই রহিয়াছে, তাহার শাব্দিক তরজমাই কখনও পূর্ণ আকীদা হইতে পারে না। বরং উহার প্রত্যেকটিরই ব্যাখ্যা আবশ্যক এবং এই সব হাদীসের ব্যাপক অর্থ নিম্নরূপ ঃ

مَنْ قَالَ الْكَلِمَةَ وَاَدّٰى حَقَّهَا وَفَرِيْضَتَهَا

যে ব্যক্তি তওহীদের কালেমা উচ্চারণ করিল, উহার হক আদায় করিল এবং এই কলেমা বিশ্বাসের দরুন যে সব কাজ ফরয হয় তাহা পালন করিল (সে বেহেশতে দাখিল হইতে পারিবে)।

ইমাম বুখারীর মতে এই পর্যায়ের সব হাদীস কেবলমাত্র সেই সব লোকের জন্য প্রযোজ্য, যাহারা অনুতাপ ও তওবার সময় এই কালেমা পড়িয়াছে এবং এই অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে বিশেষ সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত কথা এই যে, ঈমানদার গুনাহগার লোকদের পরিণাম সম্পর্কে ফয়সালা গ্রহণ করিবেন ঃ

وَاَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَتَشَهَّدَ مِنْ قَلْبِهِ مُخْلِصًا بِالشَّهَادَتَيْنِ فَانَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَاِنْ كَانَ تَائِبًا اَوْسَلِيْمًا مِنَ الْمَعَاصِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ رَبِّهِ وَحُرِّمَ عَلَى النَّارِ -

এবং যে সব ব্যক্তি ঈমান সহকারে মরিবে, অন্তর-মন দিয়া আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি খালিস ঈমানের সাক্ষ্য দিবে তাহারা সকলেই বেহেশতে দাখিল হইবে। যদি সে গুনাহ হইতে তওবা করে কিংবা গুনাহ হইতে একেবারেই মুক্ত থাকে, তবে সে আল্লাহ্র রহমতের বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং তাহার জাহান্নামে যাওয়া হারাম হইবে।

আল-কালিম সরহে আল-মুসলিম-লিন নবুবী, জিলদ ১ পাতা ৪১

পূর্ণ ঈমানের পরিচয়

عَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ الاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ - (بخارى، مسلم)

হযরত আনাস (রা) নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ ঈমানদার হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না সে তাহার ভাইয়ের জন্য তাহাই পছন্দ করিবে, যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঈমানের প্রকৃত মর্যাদা লাভ করিতে হইলে ও উহার বিশেষ 'বরকত' হাসিল করিতে হইলে মানুষকে অবশ্যই স্বার্থপরতা পরিহার করিতে হইবে এবং তাহার মনে অন্যান্য মানুষের জন্য অপরিসীম কল্যাণ কামনা বর্তমান থাকা একান্তই অপরিহার্য। অপরের কল্যাণ কামনা বর্তমান থাকা একান্তই অপরিহার্য। অপরের কল্যাণ কামনা বুঝাইবার জন্য হাদীসে বলা হইয়াছে, "অপরের জন্য তাহাই পছন্দ করা যাহা নিজের জন্য পছন্দ করা হয়"। বস্তুত স্বার্থপরতা যাচাই করার জন্য ইহা একটি নির্ভুল মানদণ্ড। প্রত্যেক মানুষই নিজের কল্যাণ চায়, সব রকমের ভাল জিনিস একমাত্র তাহারই করায়ত্ত হউক ইহা প্রত্যেকেই কামনা করে। আর ইহা কামনা করা একান্তই স্বাভাবিক; কিন্তু ইহা মানুষ পাইতে চায় পরকে বঞ্চিত করিয়া। এমনভাবে পাইতে চায়, যেন সব ভাল ভাল জিনিস একমাত্র সে-ই পায় আর অন্য কেহ যেন তাহা না পায়। পক্ষান্তরে যত প্রকার অনিষ্ঠকারিতা ও ক্ষতিকর জিনিস আছে— মানুষ চায় যে, তাহার একটিও যেন তাহাকে স্পর্শ না করে। অন্য মানুষকে স্পর্শ করিলেও তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, ইহাই হয় তাহার সাধারণ মনোভাব।

ইসলাম এইরূপ মনোভাবকে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে ইহা হইত দূর থাকিবার নির্দেশ দিয়াছে। ইসলাম বলিয়াছে ঃ যাহা নিজের জন্য ভাল মনে কর, নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহা অপরের জন্যও ভাল মনে করিও, অপরের জন্যও তাহা পছন্দ করিও। পক্ষান্তরে যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর না— নিজের জন্য যাহা ক্ষতিকর মনে কর, অপরের জন্য তাহাকেই ক্ষতিকর মনে করিও। ইহাই হইতেছে ঈমানের লক্ষণ। যাহার মধ্যে এইরূপ অবস্থা আছে সে প্রকৃত ঈমানদার আর যাহার মধ্যে তাহা নাই সে ঈমানের হাজার দাবি করিলেও মনে করিতে হইবে যে, প্রকৃত ঈমানদার সে এখনো হইতে পারে নাই।

এই হাদীস প্রসঙ্গে এই কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, 'কেহ ঈমানদার হইতে পারিবে না' বাক্যাংশের অর্থ কখনই ইহা নয় যে, এই হাদীসের বিপরীত কাজ করিলে— নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে, অপরের জন্য তাহা পছন্দ না করিলেই সে একেবারে— বেঈমান, কাফির হইয়া যাইবে।'..... এখানে তাহা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এই ধরনের কথা বলিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, তাহার ঈমান পূর্ণ নয়— ঈমানের দাবি অনুযায়ী সে কাজ করে না এবং নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে অপরের জন্য তাহা পছন্দ করে না। ইবনে হাব্বান হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে— لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ স্থলে لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ ঃ সেই ব্যক্তি ঈমানের মূল ও গভীর তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। অন্য কথায় সে পাক্কা ঈমানদার— প্রকৃত ঈমানদার হইতে পারে না। কোন লোক খুব বেশি খারাপ কাজ করিতে দেখিলে আমরা সাধারণত বলিয়া থাকি, 'সে একেবারে মানুষ নয়' 'তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বের নাম-গন্ধ নাই', এই কথার অর্থ ইহা নয় যে, সে একেবারে চতুষ্পদ জন্তু হইয়া গিয়াছে; বরং আমরা মনে করি যে, সে ঠিক মানুষের মর্যাদার উপযোগী কাজ করে নাই। এই সব হাদীস প্রসঙ্গেও ঠিক এই কথাই স্মরণ রাখিত হইব।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ - (ابوداؤد)

হযরত আবূ উমামা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য ভালবাসিল, আল্লাহ্‌রই জন্য কাহারো শত্রুতা করিল এবং আল্লাহ্‌রই জন্য কাহাকেও কিছু দিল ও আল্লাহ্‌রই জন্য কাহাকেও কিছু দেওয়া বন্ধ করিল বা দিতে নিষেধ করিল, সে তাহার ঈমানকে পূর্ণ করিয়া লইল। — আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত গতিবিধি, কার্যকলাপ, ভাবধারা-চিন্তাধারাকে এমনভাবে আল্লাহ্‌র মর্জির অধীন ও অনুগত করিয়া দিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য কাহারো সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে, আবার আল্লাহ্‌রই সন্তোষ লাভের জন্য সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে, কাহাকেও কিছু দেয় আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য আবার দেওয়া বন্ধ করে এই জন্য যে, তাহাকে দিলে আল্লাহ অসন্তোষ হন; অনুরূপভাবে কাহারো সহিত ভালবাসা স্থাপন করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য, আবার কাহারো সহিত শত্রুতা করিলে শুধু এই জন্য করে যে, তাহা করা আল্লাহ্‌র নির্দেশ— তাহাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হইবেন, আর আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি কোন কাজই না করে তবে মনে করিতে হইবে যে, তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সে নিজেকে আল্লাহ্‌র মর্জির নিকট এমনভাবে সোপর্দ করিয়া দিয়াছে যে, 'তাহার নামায, তাহার যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী, তাহার জীবন ও মৃত্যু সব কিছুই সেই আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হইয়াছে, যিনি সমগ্র জাহানের পালনকর্তা, বস্তুত ইহা হইতেছে ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়। আর আল্লাহ বান্দার নিকট এইরূপ ঈমান— এই আত্মোৎসর্গী ভাবেরই আশা করেন।

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا - (مسلم)

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইল; সে জিজ্ঞাসা করিল ঃ মানুষ গনীমতের মাল পাওয়ার জন্য লড়াই করে, কেহবা লড়াই করে সুনাম-সুখ্যাতি লাভের জন্য, আবার মানুষ এই জন্য লড়াই করে যে, তাহার বীরত্বের প্রদর্শনী হইবে; এখন ইহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ কে? রাসূল (স) উত্তর দিলেন; যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে লড়াই করে যে, উহার ফলে আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ হইবে (প্রকৃতপক্ষে সেই হইতেছে আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ)। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ধন-সম্পত্তি লাভের জন্য কিংবা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করিলে বাহ্যদৃষ্টিতে তাহা লড়াই হইলেও তাহা কিছুতেই আল্লাহ্‌র পথের লড়াই হইতে পারে না। আল্লাহ্‌র পথের লড়াই তখনি হইবে যখন একমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে লড়াই, তাতে যদি গনীমতের মাল, সুনাম-সুখ্যাতি ইত্যাদি বৈষয়িক স্বার্থ লাভ করার একবিন্দু নিয়্যত কাহারও মনে থাকে, তবে সেই জিহাদ দুনিয়ায় ফেতনা সৃষ্টিকারী লড়াইতে পরিণত হইবে এবং তাহা আল্লাহ্‌র নিকট কিছুতেই মঞ্জুর হইবে না।

এই হাদীসের ভিত্তিতে দুনিয়ার যাবতীয় সমষ্টিগত চেষ্টা-সাধনার যাচাই করা চলে। যে সব দল শুধু রাজত্ব লাভের জন্য চেষ্টা করে, যে সব দল সুনাম-সুখ্যাতি তথা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে অভিযান চালায় অথবা যে সব দল শুধু জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালায়— এই হাদীস অনুযায়ী ইহাদের একটি দলের চেষ্টাও আল্লাহ্‌র পথে নয়। যে চেষ্টা-সাধনা আল্লাহ্‌র পথে নয়, তাহা দ্বারা দুনিয়ার কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

ঈমানের লক্ষণ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاالْاِيْمَانُ - قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ - (مسند احمد)

হযরত আবূ উমামা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, ঈমান কাহাকে বলে— উহার নিদর্শন বা পরিচয় কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের ভাল কাজ যখন তোমাদের আনন্দ দান করিবে এবং খারাপ ও অন্যায় কাজ তোমাদিগকে অনুতপ্ত করিবে তখন তুমি বুঝিবে যে, তুমি মুমিন ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা ভাল কাজ করিলে মনে আনন্দ বোধ করা ও খারাপ কাজ করিলে মনে অনুতাপ জাগ্রত হওয়া ঈমানের লক্ষণ। বস্তুত ঈমানের সঠিক অস্তিত্ব নিরূপণের জন্য ইহা মনস্তাত্ত্বিক মানদণ্ড। ঈমান সম্পূর্ণরূপে এক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। ঈমানের অস্তিত্ব তখনি বুঝিতে পারা যায়, যখন উহার প্রভাব কাহারো মন-মগজ ও জীবনের উপর প্রতিফলিত এবং তদনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখা যায়। আর যেখানে তাহা হইতে দেখা যাইবে না, বুঝিতে হইবে যে, সেখানে ঈমানদারীর যত বাহ্যিক চাকচিক্যই থাকুক না কেন, মূলত সেখানে ঈমানের অস্তিত্ব বর্তমান নাই। ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীর পক্ষে এই মানদণ্ড অনুযায়ী নিজে ঈমানের যাচাই করিয়া দেখা এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তেই মনের অবস্থার যাচাই করিতে থাকা একান্তই কর্তব্য।

পূর্ণ ঈমানের শর্ত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ - (شرح السنة)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আ'মার (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেহই ঈমানদার হইতে পারে না, যতক্ষণ না তাহার মন ও বাসনা-লিপ্সা আমার উপস্থাপিত আদর্শের অনুগত ও অনুগামী হইবে। — শরহুস সুন্নাহ

ব্যাখ্যা প্রকৃত ঈমান লাভ করা যাইতে পারে এবং ঈমানের 'বরকত' তখনই পাওয়া যাইতে পারে, যদি মানুষের মনের যাবতীয় ঝোক-বাসনা ও প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে নবীর উপস্থাপিত বিধানের অধীন ও অনুগত হইবে।

হাদীসে উল্লেখিত 'মনের ঝোঁক-বাসনা' ও 'নবীদের উপস্থাপিত আদর্শ' এই দুইটি জিনিসই হইতেছে ভাল-মন্দ, হক ও বাতিল নির্ধারণের একমাত্র ভিত্তি।

মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যও ইহারই সহিত সংশ্লিষ্ট। বস্তুত সকল প্রকার গোমরাহী ও পাপকার্য নফসের খাহেশাতের ফল। পক্ষান্তরে সকল ভাল ও পূণ্য কাজ নবীর-আদর্শ অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। কাজেই প্রকৃত ঈমান লাভের জন্য নফসের খাহেশকে অনিবার্যরূপে নবী-আদর্শের অধীন ও অনুগত হইতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নবী আদর্শ ত্যাগ করিল বা নফসের খাহেশের গোলামী অবলম্বন করিল, এবং রব্বানী হেদায়েতকে বাদ দিয়া শয়তানী খাহেশাতের তাবেদারী করিল, সে ঈমানের মূল লক্ষ্যকে নষ্ট করিয়া দিল। কুরআন মজীদে এই সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে ঃ

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ - (الفرقان - ٣٤)

তুমি কি সেই সব হতভাগ্যদের দেখ নাই, যাহারা নিজেদের নফসের খাহেশাতকে নিজেদের মা'বুদ বানাইয়া লইয়াছে ? — সূরা ফুরকান ঃ ৪৩

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হেদায়েতকে বাদ দিয়া নিজেদের মর্জিমত চলে, তাহার পক্ষে গোমরাহ ও ভ্রান্ত আর কে হইতে পারে ? আল্লাহ জালিম লোকদের কখনই হেদায়েতের পথে পরিচালিত করে না। —সূরায়ে কাসাসঃ ৫০

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ - (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও ধন-দৌলতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি লক্ষ্য করিয়া থাকেন তোমাদের মনের অবস্থা ও কাজকর্মের দিকে। — মুসলিম

ব্যাখ্যা মানুষের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও ভিতরকার প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য হইয়া থাকে। মানুষ মূলত যাহা হয়, বাহিরে তাহার বিপরীত অভিব্যক্তিও প্রকাশ হইয়া থাকে। এই জন্য মুনাফিক-মনোবৃত্তির মানুষ সাধারণত খাঁটি মুসলমানদের নায় বাহ্যিক বেশ ধারণ করিয়া জগত সমাজকে ধোঁকা দিতে চায়।

দ্বিতীয়ত ঃ এক শ্রেণীর ধর্ম প্রচারক বাহ্যিক বেশ-ভূষা দূরস্ত করার উপর এতই গুরত্ব আরোপ করিয়া থাকেন যে, মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা সংশোধন করিবার দিকে কোনই লক্ষ্য থাকে না। ফলে মানুষ যতই বাহ্যিক বেশ-ভূষা সর্বস্ব হইয়া পড়ে, অন্তরের দিক দিয়া ততই শূন্য হইয়া পড়ে। বস্তুত এইরূপ অবস্থাকে স্পষ্ট ভাষায় মুনাফিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীসে বলা হইয়াছে যে, তোমরা বাহ্যিক মুসলমানী ও তাকওয়া-পরহেজগারীর যত বেশই ধারণ কর না কেন, আল্লাহ্‌র দরবারে উহার কোনই মূল্য নাই। আল্লাহ ইহা দেখিবেন না যে, তোমরা বাহ্য দৃষ্টিতে কতখানি মুসলমানী রক্ষা করিয়া চলিয়াছ; বরং তিনি কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব ও যাচাই করিয়া দেখিবেন যে, তোমরা প্রকৃত পক্ষে মন-মগজ ও বাস্তব কাজের দিক দিয়া খাঁটি মুসলমান হইয়াছ কি না।

এই হাদীসের দৃষ্টিতে আমাদের সমাজের অবস্থা যাচাই করিয়া দেখিলে বহু 'বাহ্যিক তাকওয়া-পরহেজগারীর বেশ-ভূষা অন্তঃসারশূন্য মনে হইবে শুধু এইজন্য যে, তাহার ভিতরে রহিয়াছে নিয়্যতের ও আমল-আখলাকের কদর্যতা। আবার বহু বাহ্যিক বেশ-ভূষাহীন লোক নিয়্যত, চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের দিক দিয়া খাঁটি মুসলমান প্রমাণিত হইবে যদিও বাহ্যিক বেশ-ভূষা তাহাদের প্রচলিত প্রথামতে তাকওয়া-পরহেজগারীর বেশ-ভূষা নয়। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে এই কথা জোর করিয়া বলা চলে যে, আল্লাহ্‌র দরবারে প্রথমোক্ত লোকদের অপেক্ষা শেষোক্ত লোকদেরই বেশি মর্যাদা হইবে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সম্মুখেও এই হাদীস একটি সুস্পষ্ট কর্মনীতি পেশ করে। তাহা এই যে, প্রত্যেক নবী— শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)ও— মানুষের বাহ্যিক বেশ-ভূষা দুরস্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদের আকীদা-বিশ্বাস, মত-চিন্তাধারা এবং আমল ও চরিত্র আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী গড়িবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন সর্বপ্রথম। শুধু সর্বপ্রথমই নয়, তাঁহাদের আজীবনের সাধনাই এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল। কেননা মানুষের চিন্তা ও কাজই বাহ্যিক বেশ-ভূষাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ইহাই হইতেছে স্বাভাবিক নিয়ম। কাজেই মত-চিন্তা ও কাজকে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী গঠন করিয়া দিতে পারিলে তাহার বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও পোশাক-পরিচ্ছদ অতি স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত করিতে চাহিলে তাহা আর যাহাই হোক ইসলামী কর্মনীতি হইবে না। বলা বাহুল্য, বাহ্যিক বেশ-ভূষার ও ইসলামী আদর্শের অনুকূল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, উহাই সবকিছু বা মূল জিনিস নয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ ذَرٍّ اَىُّ عُرَى الْاِيْمَانِ اَوْثَقُ - قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ الْمُوَالَاةُ فِىْ اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِىْ اللّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ (البيهقى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ যর গিফারী (রা) কে বলিলেন ঃ 'বল, ঈমানের কোন রশিটি অধিকতর মজবুত ? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন, (অতএব ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই তাহা বলিয়া দিন) নবী করীম (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌রই জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক সহযোগিতা স্থাপন ও আল্লাহ্‌রই জন্য কাহারো সহিত ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌রই জন্য কাহারো সহিত শত্রুতা ও মনোমালিন্য করা। — বায়হাকী

ব্যাখ্যা দুনিয়ার মানুষের বন্ধুতা, শত্রুতা, ভালবাসা বা সদ্ভাব-অসদ্ভাব, সহযোগিতা বা অসহযোগিতার সম্পর্ক— কোন কিছুই নিজের ইচ্ছামত হওয়া উচিত নয়; বরং সবই আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ও আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান অনুসারে হওয়া উচিত।

ঈমান ও পারস্পরিক ভালবাসা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ তোমরা বেহেশতে যাইতে পারিবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হইবে। আর তোমরা পুরাপুরি ঈমানদার হইতে পার না, যতক্ষণ না তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলিব না, যে অনুযায়ী তোমরা কাজ করিলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হইবে ?— তাহা এই যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন খুব বেশি করিয়া কর এবং উহা একেবারে সাধারণ করিয়া তোল। — মুসলিম

ব্যাখ্যা প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্য যেখানে একমাত্র আল্লাহ্‌র সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক হওয়া উচিত সেখানে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যেও গভীর ভালবাসা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ইসলামী সমাজের লোকদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা না হইলে মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের অন্তরে এখনও প্রকৃত ঈমানের সঞ্চার হয় নাই। আর আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সালাম আদান-প্রদান করা— মুসলমানকে দেখা মাত্রই 'আসসালামু আলাইকুম' বলিয়া সম্বর্ধনা জানানো হইতেছে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির অন্যতম উপায়।

প্রকৃত মুসলিম ও মুমিন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ - (ترمذى ونسائى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মুসলমান সেই ব্যক্তি, যাহার মুখে কটূক্তি ও হাতের অনিষ্টকারিতা হইতে অন্যান্য মুসলমান সুরক্ষিত থাকে, আর মু'মিন সেই ব্যক্তি, যাহার নিটক লোকেরা তাহাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। — তিরমিযী, নিসায়ী

ব্যাখ্যা হাদীসে খাঁটি মুসলমানের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যাহার মুখের কথা এবং হাতের কোন কাজ দ্বারা অন্যান্য লোক বিন্দুমাত্র আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না সে-ই মুসলমান। এখানে মুখ ও হাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, মানুষ মানুষকে যত প্রকার কষ্ট দিয়া থাকে ও যত উপায়ে কষ্ট দিতে পারে তাহা সবই প্রধানত এই হাত ও মুখ হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হাদীসে 'লিসান' শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ জিহ্বা ও ভাষা দুই-ই, আবার ভাষা বলিতে কেবল উচ্চারিত শব্দই বুঝায় না, হাতের লেখা বা ইশারা-ইঙ্গিতও ইহার মধ্যে শামিল অর্থাৎ খাঁটি মুসলমান সেই ব্যক্তি, যাহার দ্বারা অন্য মুসলমান কোন প্রকারেই— মুখ, ভাষা, ইঙ্গিত কিংবা হাত প্রভৃতি কোন কিছু দ্বারাই কষ্ট পায় না।

'মুসলমানদের সুরক্ষিত থাকে' বাক্যাংশ হইতে একথা বুঝা উচিত নয় যে, অমুসলমানকে কষ্ট দেওয়া বোধ হয় কোন অন্যায় কাজ নয়। এখান মূল উদ্দেশ্য হইতেছে এই কথা বলা যে, খাঁটি মুসলমান সে, যাহার দ্বারা কোন লোকই বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত হয় না। ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত হাদীসটিতে 'মান সালেমাল মুসলেমুনা'-এর পরিবর্তে 'মান সালেমান্নাসু' উল্লেখিত হইয়াছে অর্থাৎ সকল মানুষই তাহার নিকট সুরক্ষিত থাকিবে।

মনে রাখা দরকার যে, আলোচ্য হাদীসে যে কষ্টদানকে মুসলমানীর খেলাফ কাজ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা হইতেছে বিনা কারণে ও বেআইনীভাবে। অর্থাৎ বিনা কারণে ও বেআইনীভাবে মুসলিম ব্যক্তি কোন মানুষকেই বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে পারে না। কিন্তু অপরাধীকে আইন মুতাবিক শাস্তি দান, জালিমদের জুলুম-ফাসাদা রোধ করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন, প্রয়োজন হইলে দৈহিক আঘাত হানা এবং ইসলামকে কায়েম করার পথে কোন প্রকার বাধা আসিলে তাহা দূর করার জন্য সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করা একান্তই অপরিহার্য।

ঈমানের বিশেষ লক্ষণ

عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ ثَلَاثٌ مَّنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْاِيْمَانَ اَلْاِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْاِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْطَارِ - (بخارى-ترجمة الباب ج - ص ۹)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি এই তিনটি কাজ এক সঙ্গে সম্পন্ন করিল, সে যেন ঈমানকে সুসংবদ্ধ করিয়া লইল। (তাহা হইতেছে) নিজের নফসের সহিত ইনসাফ করা, সকলকে সালাম করা এবং দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা।

— বুখারী, তরজামাতুল বাব, জিলদ ১, পৃ. ৯

ব্যাখ্যা হাদীসটি হযরত আম্মার (রা)-এর কথা হিসাবে উল্লেখিত হইলেও ইহা নবী করীম (স)-এর বাণী। মুহাদ্দিস আবদুর রাযযাক প্রমুখ ইহাকে নবী করীম (স)-এর বাণী হিসাবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

হাদীসে উল্লেখিত বাক্য 'নিজের নফসের সহিত ইনসাফ করা' অর্থ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচার নীতি ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা এবং এই ব্যাপারে এতদূর চরমবাদী হওয়া যে, মানুষ নিজে নিজেকেও ক্ষমা করিবে না। 'সকলকে সালাম করা' অর্থ মুসলমানের সাক্ষাৎ লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলা এবং কেহ এই সালাম দিলে তাহার জওয়াব দেওয়া। বস্তুত ইহা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ এবং 'দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা' অর্থাৎ গরীব হইয়াও আল্লাহ্র পথে টাকা দান করা, অপর গরীবের সাহায্য করা। ইহা হইতে আল্লাহ্র পথে অর্থ দানের গুরুত্ব ও তাগিদ সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। কেননা গরীব অবস্থায়ই যদি আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় বা সওয়াবের কাজ হয়, তাহা হইলে ধনী অবস্থায় তো ইহার গুরুত্ব ও সওয়াব অপরিসীম হইয়া দাঁড়াইবে। তখন তো আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য উদার-উন্মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করা সমধিক কর্তব্য হইবে। আলোচ্য হাদীস হইতে আরও যাহা কিছু জানা যায়, নিম্নে তাহা পেশ করা যাইতেছে।

এক ঃ ইনসাফ ও সুবিচার পরায়ণতা। ইহার ফলে সৎকর্মশীল সকল লোকের পক্ষে সুষ্ঠু জীবন যাপন অত্যন্ত সহজ হয় এবং ফিসক-ফুজুরী-নাফরমানী ও আল্লাহ্র আইন লংঘন, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত কাজ ইত্যাদি পরিহার করার পথে কোন বাধা প্রতিবন্ধকতা থাকে না। বস্তুত মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সহিত সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন না করে, ততক্ষণ অপর লোকের প্রতি কোন সুবিচার করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। নিজের যাচাই পরীক্ষা লওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সে অপরের সঠিক ও নির্ভুল যাচাই কি করিয়া করিতে পারে ? সুতরাং সর্বপ্রথম নিজেকে দেখা, যাচাই-পরীক্ষা করা ও নিজের প্রতি সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ইহা করিলে অতঃপর অপরের অন্যায়ের যাচাই ও পরীক্ষা করা তাহার পক্ষে সহজ হইতে পারে।

দুই ঃ সকলকে সালাম করা, সকলের আগে সালাম দেওয়া একটি বিশেষ গুণের পরিচায়ক। ইহা মানুষের মন হইতে আত্মঅহংকার ও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধ দূর করে। মনে বিনয় ও নম্রতার ভাবধারা জাগায়। সেই সঙ্গে ইহা লোকদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বস্তুত যাহারা পরস্পর পরিচ্ছন্ন, অকপট ও নিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব সহকারে সালাম প্রদান করে, তাহারা ইহার মারফতে একে অপরের প্রতি শান্তি ও সদিচ্ছার বারি বর্ষণ করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সঠিক কল্যাণ কামনা করে। আর এইরূপ যাহারা করে, কোন কৃত্রিমতা ও কুটিলতার সহিত নয়, আন্তরিক নিষ্ঠা ও গভীর মমতা-সদিচ্ছার ভিত্তিতে করে, তাহারা পরস্পরের সহিত কখনই দুশমনি করিতে পারে না। একে অপরের অকল্যাণ কামনা করিতে পারে না। ইহাদের কাজ প্রকৃতই সামগ্রিক কল্যাণের জন্য হইবে, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ এইরূপ লোকদের মধ্যে বাস্তবিকই থাকিতে পারে না।

তিন ঃ দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা, আল্লাহ্র পথে দান করা, আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য আল্লাহ্র বান্দাদের অর্থ সাহায্য করা। নিজের মতোই মানুষের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন, চরিত্র ও নৈতিকতার অতি বড় ফযীলতের ব্যাপারে। পকেটের শেষ কপর্দকও নিজের জন্য না রাখিয়া আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ব্যয় করা অত্যন্ত গভীর 'আল্লাহ্ পরস্তীর' প্রমাণ। মানুষের নিষ্ঠা ও সততার

যাচাই করার এতদপেক্ষা বড় ও নির্ভুল মাপকাঠি আর কিছুই হইতে পারে না। শয়তান মানুষকে ভয় দেখায় দারিদ্র্য ও অভাবের। এইরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে না, ভবিষ্যতের চিন্তা যাহাকে উদভ্রান্ত করে না, এমনকি নিজের চিন্তাও যাহাকে কাতর করিয়া তুলে না, নিজের যৎসামান্য যাহা কিছু আছে তাহাতেও আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে শরীক করে, বস্তুত সে-ই হইতেছে মুমিন ব্যক্তি। আর ইহাই হইতেছে ঈমান ও ঈমানের নিরিখ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ হযরত আম্মার বর্ণিত এই হাদীসে সমস্ত কল্যাণ একত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা তুমি যখন তোমার নিজের প্রতি ইনসাফ করিবে, তখন তুমি তোমার স্রষ্টার এবং তোমার ও অন্যান্য মানুষের প্রতি পারস্পরিক চূড়ান্ত কল্যাণই লাভ করিতে পারিবে। সমস্ত মানুষকে যখন তুমি সালাম দিবে, তখন তোমার চরিত্রও উন্নত হইবে, সাধারণ মানুষের সাথে তোমার বন্ধুতা-ভালবাসা হইবে, মানুষের মন জয় করিতে পারিবে। অন্যত্র রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ

وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - (العينى شرح البخارى - ج:١- ص ١٩٨)

তুমি সালাম বল যাহাকে তুমি চেন ও জান এবং সালাম বল যাহাকে তুমি জান না চেন না।

আর দারিদ্রের মধ্যে দান খয়রাত করিলে তাহা হইবে তোমার চরম বদান্যতা, দানশীলতার পরিচায়ক। আল্লাহ্ ইহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - (الحشر - ٩)

তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের উপর অপর লোকদের অগ্রাধিকার দান করে। — আল-হাশর ঃ ৯

এই হাদীসের মূল কথা হইতেছে তিনটি ঃ —

এক ঃ মানুষের নফসের সুষ্ঠুতা পরিশুদ্ধি বিধান ও পরিপূর্ণতা দান।

দুই ঃ আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও রাসূলের ভালবাসা সুদৃঢ়করণ।

তিন ঃ জুলুম, সীমালংঘন, অন্যায় বাড়াবাড়ি, ফেতনা-ফাসাদ, শয়তানী, বদমায়েশী ও পাপ হইতে মুক্তি লাভ।

বস্তুত এই হাদীস ঈমানদার মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রতিবেশীর সহিত মুমিনের আচরণ

عَنْ أَبِىْ شُرَيْحِ الْخُزَاعِىْ رض أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لَايَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ -

হযরত আবূ শুরাইহ খুযায়ী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্‌র শপথ, সে মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ, সে ঈমানদার নয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল— ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) কে ঈমানদার নয়? উত্তরে

তিনি বলিলেনঃ সেই ব্যক্তি, যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্টকারিতা ও ক্ষতি হইতে নিরাপদ নয়।

ব্যাখ্যা মুসলমানকে যে সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস ও যাবতীয় কাজকর্ম করিতে হয়, সেই সম্পর্কে কাহারো দ্বিমত নাই। সমাজবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করার ফলে অবশ্য কেহ কাহারো প্রতিবেশী হইবে। এই প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করার মুসলমানের অসীম কর্তব্য ও বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে। মুসলমানকে এমনভাবে বসবাস ও জীবন যাপন করিতে হইবে যে, কোন একটি লোকও যেন অন্য লোকের দ্বারা কোন একটি দিক দিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শুধু তাহাই নয়, সামান্য ভীত ও শংকিতও যেন না হয়। বস্তুত ইহা ঈমানের অনিবার্য শর্ত বিশেষ। এই শর্ত পূরণ না করিলে তাহার ঈমান না থাকারই শামিল।

অন্য একটি হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا

তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহা হইলেই তুমি ঈমানদার হইতে পারিবে।

— আহমদ, তিরমিযী

আর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ (بخارى-مسلم)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে (এবং পরকালে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও কল্যাণ লাভ করিতে চায়) প্রতিবেশীদের কোনরূপ কষ্ট না দেওয়াই তাহার কর্তব্য।

—বুখারী মুসলিম

মনে রাখিতে হইবে, এখানে কেবল স্থায়ী প্রতিবেশী সম্পর্কে এই কথা বলা হয় নাই, অস্থায়ী প্রতিবেশী সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। অতি অল্প সময়ের জন্যও দুই জন লোক একত্রিত হইলে বা পাশাপাশি বসিলে তাহারা পরস্পরের প্রতিবেশী এবং পরস্পরের প্রতি ভাল ব্যবহার করা— পরস্পরের অধিকার রক্ষা করা একান্তই কর্তব্য।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ - (بيهقى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে নিজে খাইয়া পরিতৃপ্ত হয় আর তাহার পাশেই তাহার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। — বায়হাকী

ব্যাখ্যা প্রতিবেশীর অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের কোন খবরদারী না করিয়া এবং সেই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা ও দায়িত্ববোধ না করিয়া কেবল নিজের পেট ভরিয়া খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃত ঈমানদার হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এইরূপ অমানুষিক নির্মমতা, কঠোরতা ও স্বার্থপরতা ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই জন্য ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি লোক তাহার প্রতিবেশী ও অন্যান্য লোকদের সম্পর্কে সব সময় ওয়াকিবহাল থাকিবে ও কাহারো অভাব-অনটন দেখা দিলে, কেহ না খাইয়া থাকিতে বাধ্য হইলে— তাহা দূর

করিতে প্রত্যেকেই সাহায্য করিবে। বস্তুত ইসলমী সমাজের লোকদের অভাব-অনটন প্রাথমিক পর্যায়ে এইরূপ ব্যক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারাই দূরীভূত হইবে। ইহার পরও অভাব থাকিলে তাহা দূর করা গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ইসলামী সমাজে ইহাই হইতেছে সামাজিক নিরাপত্তা।

ঈমান ও চরিত্র

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (ابوداؤد - دارمى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যাহার নৈতিক চরিত্র তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। — আবূ দাউদ, দারেমী

ব্যাখ্যা ঈমানের পূর্ণতা উন্নত নৈতিক চরিত্রের উপরই নির্ভরশীল। অতএব নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া যে যতদূর উন্নত, তাহার ঈমান ততদূর পরিপূর্ণ। অন্য কথায়, উন্নত নৈতিক চরিত্র পূর্ণ ঈমানের অনিবার্য ফল বিশেষ। অতএব যাহার ঈমান যত কামেল, তাহার চরিত্রও তত উন্নত হইবে এবং যাহার চরিত্র উন্নত, মনে করিতে হইবে যে, সে একজন কামেল ঈমানদার ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যাহার ঈমান কামেল হইয়াছে, তাহার চরিত্র উন্নত না হইয়াই পারে না; আবার যাহার উন্নত মানের চরিত্র নাই, তাহার ঈমান পূর্ণ হইবার কোন প্রমাণই নাই। ইসলামে চরিত্রের যে কতদূর গুরুত্ব রহিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্রাকার হাদীস হইতে সহজেই প্রমাণিত হয়।

ঈমাননের দৃঢ়তা

عَنْ سُفْيَانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىْ رض قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰه قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَّا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰه ثُمَّ اسْتَقِمْ - (مسلم)

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি নিবেদন করিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা জানাইয়া দিন, যাহার ফলে আমাকে সেই সম্পর্কে আপনার পর আর কাহারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। উত্তরে নবী করীম (স) ইরশাদ করিলেন ঃ বল, আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছি, অতঃপর ইহারই উপর দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাক। — মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসে প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম (স) যাহা ইরশাদ করিয়াছেন, তাহা মন-প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে এই কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে, "আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছি" এই কথাটি বলা এবং ইহার উপর অচল-অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই মূলত ইসলামের বিপ্লবী ভাবধারা। আর এই ভাবধারা কাহারও মধ্যে বর্তমান থাকিলে ইসলাম সম্পর্কে তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস এতদূর লাভ হইবে যে, অতঃপর সেই বিষয়ে কোন প্রকার অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা কোথাও বর্তমান থাকিবে না। কেননা "আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান

—১/৯

আনিয়াছি" কথাটি বলা— বলিতে পারা— খুব সামান্য ব্যাপার নয়। একজন মানুষ যখন দুনিয়ার সমস্ত শক্তির প্রভাব প্রভুত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানসিক গোলামী হইতে মুক্ত হইয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইতে পারে— সকল প্রকার মতবাদ, চিন্তাধারা ও আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিয়া একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনাদর্শ ইসলামকেই মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারে— পারে তাঁহারই নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিতে, ঠিক তখনি সেই লোকটি বলিতে পারে যে, "আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছি।" ইহার পূর্বে এই কথা বলার কাহারো অধিকার থাকিতে পারে না, বলিলে তাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হইবে না। কাজেই "আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছি" বলা যে খুব সামান্য ব্যাপার নয়, ইহাতে যে আল্লাহ ছাড়া আর সকল প্রকার প্রভুত্ব, ক্ষমতাসীন শক্তি, মতবাদ-আদর্শ ও বিপরীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত প্রবল দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া যায় তাহা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয় ঃ নবী করীম (স) বলিয়াছেন, "ইহারই উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাক," তাহার প্রথম অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিলেই হইবে না, বিপরীত মতাদর্শের কঠিন চাপেও নিজের মন ও মস্তিষ্ককে এতখানি মজবুত রাখিতে হইবে যে, তাহা যেন কোনক্রমেই বিভ্রান্তিতে পড়িয়া না যায়। বরং সব সময় ও সকল অবস্থাতেই যেন তাহাতে ইসলামের আদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও চিন্তাধারা-মতবাদ অন্যান্য সব কিছুর উপর অধিকরত প্রভাবশালী হইয়া উন্নত হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, "আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছি" এই কথা কেবল মুখে বলাই যথেষ্ট হইবে না, বরং নিজের বাস্তব জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের ভিতর দিয়াই উহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। শয়তানের প্ররোচনায় গায়ের ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, ফাসিক-ফাজিরদের রাজনৈতিক ও তমদ্দুনিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সম্পূর্ণ অনৈসলামিক পরিবেশের মধ্যে পড়িয়াও যেন আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাসীদের ন্যায় কোন কাজ করা না হয়। বস্তুত কুরআন মজীদেও ঠিক এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ - (حم السجدة - ٣٠)

নিশ্চয়ই যাহারা বলে যে, আমাদের রব্ব আল্লাহ্ এবং ইহার উপর সুদৃঢ়ভাবে অচল-অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, তাহাদের প্রতি ফেরেশতাগণ নাযিল হইয়া বলে যে, তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার সুসংবাদ গ্রহণ কর।

অর্থাৎ এইভাবে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিতে পারে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে তাহাদের বেহেশতে যাওয়া নিশ্চিত। সামান্য একটু প্রতিকূল পরিবেশে পড়িয়াই যাহারা ইসলাম অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় দিগ্বিদিক উড়িতে থাকে, তাহাদের ঈমান যে কত দুর্বল এবং তাহা যে কোন প্রকার সুফল দান করিতে সক্ষম নয়, তাহা এই হাদীস হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

ঈমানের স্বাদ

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا - (مسلم)

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তাবিল হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ ঈমানের স্বাদ সেই ব্যক্তিই আস্বাদন করিতে পারিয়াছে, যে আল্লাহ্কে রব্ব, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূলরূপে সন্তুষ্ট চিত্তেই মানিয়া লইয়াছে। — মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে আল্লাহ্কে নিজের রব্ব, ইসলামকে নিজের জীবন ব্যবস্থা এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে নিজের রাসূল হিসাবে মানিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক এবং শুধু মৌখিক মানিয়া লইলেই চলিবে না— সন্তুষ্ট চিত্তে ও অকুণ্ঠিতভাবে মানিতে হইবে। বস্তুত ইসলামের প্রাথমিক আদর্শিক ভিত্তি হইতেছে এই তিনটি এবং ইহারা পরস্পর পরিপূরক, পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আল্লাহকে যে নিজের রব্ব মানিতে প্রস্তুত হয় না কিংবা মৌখিক বা অন্য কোন বৈষয়িক কারণে যদিও আল্লাহকে মানে কিন্তু মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সন্তুষ্টির সহিত তাহা না মানে তবে সে ঈমানের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিটিকেই চূর্ণ করিয়া দেয়। আর যদি কেহ আল্লাহকে নিজের রব্ব, মালিক, প্রভু ও আইন-বিধানদাতারূপে মানে; কিন্তু আল্লাহ্র দেওয়া ইসলামকে নিজের জীবন ব্যবস্থারূপে অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিতে রাজি না হয় কিংবা ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করে, পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামকে জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রের জন্য গ্রহণ করে না, তাহা হইলে আল্লাহ্কে রব্ব বলিয়া মান্য করা একেবারেই অর্থহীন হইয়া পড়ে। কেননা আল্লাহকে মানিব অথচ আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামকে জীবন ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করিব না— ইহা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী কথা।

আল্লাহকে রব্ব ও ইসলামকে জীবন ব্যবস্থারূপে মানিয়া লইলেও হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূলরূপে না মানিলে এবং তাঁহার নিকট আল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গিয়াছে তাহা এবং যে আদর্শ তিনি দুনিয়ার বুকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা যদি কেহ গ্রহণ করিতে রাজি না হয় তবে প্রথম দুইটি ভিত্তির প্রতি তাহার ঈমান একেবারেই অর্থহীন এবং তাহা অসম্ভবও বটে। কেননা "আল্লাহ্ আছেন, তিনি আমাদের রব্ব এবং ইসলাম আমাদের জীবন ব্যবস্থা" এই কথা আমরা রাসূল ছাড়া আর কোথায় পাইলাম, কেমন করিয়া আমরা ইহা জানিতে পারিলাম?

তাহা পাইলাম ও জানিলাম মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট। কিন্তু তাহাকেই যদি রাসূল— শুধু রাসূলই নয় সর্বশেষ রাসূলরূপে মানিয়া লওয়া না হয়, তবে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনের দাবি একেবারেই অমূলক ও অপ্রমাণিত হইয়া পড়ে। আর যে ব্যক্তি এই তিনটি ভিত্তিকেই যথাযথরূপে স্বীকার করে— শুধু স্বীকারই নয়, হৃদয়-মন-মগজ দিয়া মনের ঐকান্তিক সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে মানিয়া লয়, ঈমানের প্রকৃত স্বাদ সে-ই গ্রহণ করিতে পারে এবং প্রকৃতভাবে তাহার পক্ষেই তাহা আস্বাদন করা সম্ভব। বর্তমান সময় যাহারা ঈমানদার হইয়াও ঈমানের কোন স্বাদ— কোন আনন্দই পায় না; বরং যাহারা নিজেদেরকে

মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করে, যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার মতো অবৈজ্ঞানিক (?) কথা স্বীকার করিতে নারায কিংবা যাহারা মুসলমান নামে পরিচিত হইয়াও মনে করে ঃ "ইসলাম পুরানো জিনিস, এই যুগে অচল আর মুহাম্মাদ (স) শুধু আরবদের মুক্তিদাতা হিসাবেই আসিয়াছিলেন, আমাদের পক্ষে তাহাকে অনুসরণ করার প্রয়োজন নাই।"— তাহারা যে ঈমানের স্বাদ পায় না এবং পায়না বলিয়াই ইসলাম হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া যায় তাহার মূল কারণ এইখানেই। মূলত ঈমানের ব্যাপারটি এক শ্রেণীর লোকদের নিকট বর্তমানে অত্যন্ত হালকা জিনিস হইয়া গিয়াছে, ইহার গুরুত্ব তাহারা মোটেই অনুধাবন করিতে পারিতেছে না। অথচ ইহাই হইতেছে ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্বপ্রথম ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে মানুষের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতে হইবে— ইসলামী আন্দোলনের ইহাই সর্বপ্রথম কাজ।

عَنْ أَنَسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ - (بخارى)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রাসূল (স)-এর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেনঃ তিনটি জিনিস তোমাদের যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করিতে পারিবে। তাহা এই ঃ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল তাহার নিকট অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইবেন; সে একজন লোককে ভালবাসিবে, ভালবাসিবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই এবং সে কখনো কুফরীর মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া যাইত রাজি হইবে না, যেমন রাজি হইবে না আগুণে নিক্ষিপ্ত হইতে। — বুখারী

ব্যাখ্যা হাদীসটি বুখারী হইতে গৃহীত হইলেও এই অর্থের হাদীস ভাষা ও শব্দের সামান্য পার্থক্য সহকারে মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনায় হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের ইহা একটি মৌলিক ফর্মূলা বিশেষ, ইহাতে তিনটি মৌলিক জিনিসের উল্লেখ হইয়াছে। প্রথম, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা পোষণ; বস্তুত দ্বীন ও ঈমানের ইহা মূল কথা বরং ইহাই প্রকৃত ঈমান। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা পোষণ ও কুফরীতে ফিরিয়া যাওয়াকে অপছন্দ করা— তাহাতে বিন্দুমাত্র রাজি না হওয়ার কাজ কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই সম্ভব, যাহার মধ্যে ঈমান দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়াছে, যাহার অন্তর উহার জন্য প্রশস্ত হইয়াছে, যাহার রক্ত-গোশত উহার সহিত মিলিয়া-মিশিয়া গিয়াছে। অন্তর দিয়া কেবল সে-ই দুনিয়ার সকলের অপেক্ষা আল্লাহ ও রাসূলকে অধিকরত ভালবাসিতে পারে এবং কেবল সে-ই কুফরীতে ফিরিয়া যাওয়া— ঈমানের পর পুনরায় কুফরী কবুল করাকে— ঘৃণা-অপছন্দ করিতে পারে। সবকিছুর বিনিময়ে ঈমানের উপর অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা, কুফরীর সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করা কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব। এই জন্য হাদীসে সর্বপ্রথম ইহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঈমানের স্বাদ অর্থঃ আল্লাহ্‌র হুকুম পালন, দ্বীন পালনের সকল প্রকার কষ্ট ও কুরবানী অকাতরে বরদাশত করা, দুনিয়ার সকল প্রকার স্বার্থ ও সুখের বিনিময়ে দ্বীন পালন করিতে

পারা। 'স্বাদ' কথাটি খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলেও এখানে রূপকভাবে ঈমান সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ্র প্রতি বান্দার ভালবাসার অর্থ আল্লাহ্র হুকুম পালন করা ও আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত যাহা কিছু আছে তাহা পরিত্যাগ ও পরিহার করা, তাহা নীরবে বরদাশত না করা। রাসূলের প্রতি ভালবাসার অর্থও তাহাই। ইবনে বাত্তাল বলিয়াছেন ঃ

مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِخَالِقِهِ الْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالْاِنْتِهَاءُ عَمَّا نَهٰى عَنْهُ وَمَحَبَّةُ الرَّسُوْلِ كَذٰلِكَ وَهِيَ الْتِزَامُ شَرِيْعَتِهِ - (عمدة القارى ج ا ص ١٤٨)

স্রষ্টার জন্য বান্দার ভালবাসা হইতেছে স্থায়ীভাবে তাঁহার আনুগত্য করা, যাবতীয় হুকুম পালন করা এবং তিনি যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাকা। রাসূলের প্রতি ভালবাসাও অনুরূপ— তাঁহার উপস্থাপিত শরীয়তকে স্থায়ীভাবে পালন করিয়া চলা।

— উমদাতুল কারী, ১মখণ্ড, পৃ. ১৪৮

দ্বিতীয় জিনস হইতেছে আল্লাহ্র ওয়াস্তে কোন লোককে ভালবাসা। এখানে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে অপর মানুষকে ভালবাসার জন্য উৎসাহ দান করা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ্ মু'মিন লোকদেরকে পরস্পরের ভাই বানাইয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন ঃ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহে পরস্পরের ভাই হইয়াছ। (আলে-ইমরান ১০৩)। মুসলিম মিল্লাতের লোকদেরকে ভালবাসা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসার অন্তর্ভূক্ত। কাজেই এই ভালবাসা খালেস, একনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ ও নিষ্কলুষ না হইলে ঈমানের স্বাদ লাভ করা যায় না। কেননা কেহ যদি কাহাকেও কেবল দুনিয়ার স্বার্থ বা মানবীয় লৌকিকতার কারণে ভালবাসে তবে এই কারণ দূর হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসাও ছিন্ন হইয়া যাইবে।

তৃতীয়, কুফরীতে ফিরিয়া যাওয়াকে ঘৃণা ও অপছন্দ করা, সেইজন্য বিন্দুমাত্র রাজি না হওয়া। এই ঘৃণা ও অপছন্দ কেবল তাহার মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে যাহার অন্তরে ঈমানের নূর জ্যোতিষ্মান রহিয়াছে, যাহার নিকট ইসলামের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং মূর্খতা ও কুফরীর জঘন্য ও বীভৎস ছবি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মুনাফিকের লক্ষণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ - (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি ঃ কথা বলিবে তো মিথ্যা বলিবে; ওয়াদ করিবে তো ইহার বিপরীত কাজ করিবে এবং কোন জিনিসের আমানতদার বানানো হইবে তো উহার খিয়ানত করিবে। — বুখারী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رض وَعَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ مُنَا فِقًا وَاِنْ

كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا مَنْ اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ - (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর হইতে এবং তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ চারটি চরিত্র যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে, সে মুনাফিক হইবে; আর যদি ইহার মধ্য হইতে একটি চরিত্র পাওয়া যায় তবে তাহার মধ্যে মুনাফিকিরও একটি চরিত্র পাওয়া যাইবে, যতক্ষণ না সে তাহা পরিত্যাগ করিবে। মুনাফিক সেই, যে ওয়াদা করিয়া উহার খেলাপ করিবে, যখন তর্ক করিবে খারাপ কথা বলিবে, যখন কোন চুক্তি করিবে উহার বিরোধিতা করিয়া বিশ্বাসভঙ্গ করিবে। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা প্রথমোক্ত হাদীসটি বুখারী শরীফের بَابُ عَلَامَتِ الْمُنَافِقِ হইতে গৃহতি হইয়াছে। বুখারী শরীফে এই হাদীস এতদ্ব্যতীত আরো তিনটি স্থানে বিভিন্ন তাবেয়ী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় হাদীসটি তিরমিযী হইতে গৃহীত।

এই উভয় হাদীসেই মুনাফিকের লক্ষণ ও পরিচয় বলা হইয়াছে। মুনাফিক তাহাকেই বলে, যাহার মধ্যে 'নিফাক' نِفَاقٌ রহিয়াছে। আর 'নিফাক' বলা হয় তাহাকেই ঃ اَلَّذِىْ لَايُطَابِقُ ظَاهِرُهٗ بَاطِنَهٗ যাহার ভিতরকার অবস্থা বাহ্যিক প্রকাশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অর্থাৎ মনের ভাবধারা ও বাহ্যিক কাজ-কর্ম একরূপ না হওয়াই মুনাফিকী। আর মুনাফিক সেই ব্যক্তি, যে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিশ্বাসী তথা মু'মিন নয়, কিন্তু নিজেকে মু'মিন ও মুসলিমরূপে প্রকাশ করে। আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে মুনাফিকের লক্ষণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা যেমন মুনাফিক কে— তাহা জানিতে পারা যায়, তেমনি কি ধরনের কাজ করিলে মুনাফিকী হয় তাহাও জানা যায়। বস্তুত মুনাফিকী ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। যেখানে ঈমান খালেস রহিয়াছে, সেখানে মুনাফিকী থাকিতে পারে না।

প্রথমোক্ত হাদীসে মুনাফিকের তিনটি চিহ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে, আর দ্বিতীয় হাদীসে তিনটির স্থলে চারটি চিহ্নের উল্লেখ রহিয়াছে। চিহ্ন সংখ্যার এই পার্থক্য বিশেষ কোন আপত্তির বিষয় নয় এবং এই দুই ধরনের পার্থক্য সংখ্যার মধ্যে বিশেষ বিরোধও কিছু নাই। কেননা দ্বিতীয় হাদীসে যে চতুর্থ চিহ্নটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতেছে ঃ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ —"এবং যখন কোন চুক্তি করে, তখন উহাতে বিশ্বাসঘাতকতা করে।" আর এই চিহ্নিটি প্রথম হাদীসে উল্লেখিত তৃতীয় লক্ষণটিরই একটি বিশেষ দিক এবং উহার মধ্যে শামিল। ইহাকে স্বতন্ত্র এক লক্ষণ হিসাবে গণনা না করিলেও মূল ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় না।

প্রথম হাদীসে তিনটি লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির পূর্বে اِذَا (যখন) শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়া এবং সেই সঙ্গে এই কথাও বুঝাইয়া দেওয়া যে, এই সবগুলিই মুনাফিক ব্যক্তির অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত; এবং প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়াই সে মুনাফিকীর পরিচয় দিবে।

লক্ষণ তিনটির মধ্যে প্রথম হইতেছে ঃ যখনি কথা বলে তখনি মিথ্যা বলিয়া প্রকৃত ব্যাপারের বিপরীত কিছু বুঝাইয়া দেওয়া তাহার অভ্যাস। ইসলামে ইহা এক মারাত্মক গুনাহ। কুরআন মজীদে এই ধরনের মিথ্যা সম্পর্কেই বলা হইয়াছে ঃ

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ - (الصف - ٢)

যাহা তোমরা কর না, তাহা তোমরা বলিয়া বেড়াইবে, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট এক মস্তবড় গুনাহ।

দ্বিতীয়, "যখন ওয়াদা করিবে তো সে ওয়াদা পূরণ করিবে না, উহার বিপরীত কাজ করিবে।" এই লক্ষণটি যদিও প্রথম চিহ্নটির মধ্যে শামিল হইতে পারিত এবং ইহাকে এক স্বতন্ত্র লক্ষণ হিসাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তবুও ইহাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা অর্থহীন নয়। ইহা হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা বলা মুনাফিকীর একটি লক্ষণ বটে এবং একটি গুরুতর গুনাহের কাজ; কিন্তু কোন ওয়াদা করিয়া উহা পূরণ না করা এবং এক কাজ করার ওয়াদা করিয়া উহার বিপরীত করা, উহা অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত এবং জঘন্য কাজ। আরবী ভাষার নিয়মে ইহাকে বলা হয় ঃ "সাধারণের পরে বিশেষের উল্লেখ।" দ্বিতীয়ত ইহা দুইটি দিকের দুইটি স্বতন্ত্র লক্ষণ বলিয়া আলাদাভাবে দুইটিরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয়, যখন কোন কিছু আমানত রাখা হইবে, তখন তাহাতে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে— আমানতে খিয়ানত করিবে। এই আমানত যাহাই হোক না কেন— তাহা কোন জিনিস হোক, কি কোন প্রকার অযোগ্য কথা। যাহাতেই বিপরীত কাজ করা হইবে তাহাতেই বিশ্বাসঘাতকতা হইবে এবং তাহাই হইবে চরম মুনাফিকী।

হাদীসে যে তিনটি লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা মানুষের তিনটি দিকের বিপর্যয় সম্পর্কে অবহিত করিয়া দেয় ঃ কথার বিপর্যয়, কাজের বিপর্যয় এবং নিয়্যতের বিপর্যয়। মিথ্যা কথা বলা হইতেছে কথার বিপর্যয়। 'কথা সত্যই বলা আবশ্যক', মিথ্যা বলিলে উহাকে কঠিন বিপর্যই মনে করিতে হইবে। আমানতের খিয়ানত করিলে কাজের বিপর্যয় হয়। আমানত রক্ষা করা মানব জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ; ইহার হক হইতেছে উহার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা। তাহাতে যদি খিয়ানত করা হয়, আমানত নষ্ট করা হয়, তবে ইহাকে কাজের বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু মনে করা যায় না। আর তৃতীয়, ওয়াদা করিয়া উহার খিলাফ করা— ওয়াদা পূরন না করা, ইহা নিয়্যতের— মনোভাবের ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের পরিচায়ক। কেননা মুনাফিক ব্যক্তি যখন ওয়াদ করে তখন এই ওয়াদা মুখে উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু তখনো তাহার মনে এই ভাবই থাকে যে, মুখে ওয়াদা করিলে কি হইবে, ইহা কখনই পূরণ করা হইবে না— ওয়াদা মতো কাজ করা হইবে না। তাবারানী বর্ণিত এক বর্ণনার ভাষা হইতে একথা সুস্পষ্ট হয়। তাহাতে বলা হইয়াছে ঃ

اِذَا وَعَدَ وَهُوَ يَحْدُثُ نَفْسَهُ اَنَّهُ يَخْلُفُ -

যখন ওয়াদ করে তখনই তাহার মন বলিতে থাকে যে, সে ইহার বিপরীত করিবে— এই ওয়াদা পূরণ করিবে না।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, ওয়াদা করার সময় যদি উহার খেলাফ করার মনোভাব না থাকে, আর পরবর্তীকালের কোন বাহ্যিক ও অভাবিতপূর্ব বাঁধা বা অসুবিধার কারণে ওয়াদা পূরণ করা যদি সম্ভব না হয়, তবে তাহা মুনাফিকী হইবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ - (مسند احمد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ, যাহার মুষ্ঠির মধ্যে মুহাম্মাদের প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে যে লোক আমার সম্পর্কে শুনিতে ও জানিতে পারিবে— সে ইয়াহূদী হউক কিংবা নাসারা— আর আমি যে দ্বীনসহ প্রেরিত হইয়াছি তাহার প্রতি ঈমান না আনিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হইবে। — মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা হাদীস হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়্যত দুনিয়ার সমগ্র মানবতার জন্য এবং যে লোকই রাসূলের আগমন সম্পর্কে সংবাদ পাইবে সে তখন যে কোন ধর্মের বিশ্বাসী হউক-না কেন— সে যদি রাসূলের নবুয়্যত বিশ্বাস না করে এবং তিনি যে দ্বীনসহ দুনিয়ায় প্রেরিত হইয়াছেন তাহার প্রতি ঈমান না আনে, আর এই অবস্থায়ই যদি সে মরিয়া যায়, তবে তাহার জান্নাতবাসী হওয়া সম্ভব নয়; বরং সে নিশ্চতরূপেই জাহান্নামী হইবে। কেননা পরকালীন মুক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে রাসূলের প্রতি ঈমানের উপর, আর সর্বশেষ রাসূল হইতেছেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। অতএব তাঁহার প্রতি ঈমান না আনিয়া ও তাঁহার আনীত দ্বীন বিশ্বাস না করিয়া কেহ পরকালীন মুক্তি লাভে সমর্থ হইতে পারে না।

হাদীসে বিশেষভাবে ইয়াহূদী ও নাসারাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ইহারা কিতাবধারী উম্মত আর তাহারাও যখন শেষ নবীর প্রতি ঈমান না আনিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, তখন অন্যদের— যাহাদের কোন আসমানী কিতাব নাই, তাহাদের তো কোন কথাই নাই। এই কথার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স)-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল দ্বীন ও ধর্ম বাতিল হইয়া গিয়াছে। তখন রাসূল (স)-এর উপস্থাপিত ইসলামই একমাত্র দ্বীন।

দ্বিতীয়ত, এই কিতাবধারী লোকগণ যত সহজে ও নিশ্চিতরূপে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নীরূপে চিনিতে পারে, তত আর কেউ পারে না। কেননা তাহাদের কিতাবেই শেষ নবীর পরিচয় লিখিত রহিয়াছে। উহার দৃষ্টিতে তাহারা যদি খালেসভাবে শেষ নবীকে চিনিতে চেষ্টা করে তবে অতি সহজেই চিনিতে পারে। কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে ঃ

يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ - (الاعراف - ٨-١٠)

তাহারা তাহার সম্পর্কে তাহাদের নিকট রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলী কিতাবে লিখিত (বিবরণ) পায়। — আল আ'রাফ ১০৮

হাদীসে উক্ত مِنْ هذه الامَّة এই সময়কার দুনিয়াবাসীদের মধ্যে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (স) কে আল্লাহ্‌র নবীরূপে বিশ্বাস করা তাহার সময়কালীন ও কিয়ামত পর্যন্তকার লোকদের সকলের জন্যই কর্তব্য। এই কর্তব্য হইতে কেহই মুক্ত নয়। হাদীসে উক্ত "আমার সম্পর্কে যে শুনিতে পাইয়াছে" বাক্যাংশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, যে লোক রাসূলের প্রচারিত দ্বীন সম্পর্কে কোন কথাই জানিতে পারে নাই, তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট হয়ত নির্দোষী প্রমাণিত হইবে ও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

খতমে নবুয়্যত

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انِّى عِنْدَ اللّٰه مَكْتُوْبٌ خَتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهِ - (مسند احمد، شرح السنة، بيهقى، حاكم)

ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট 'খাতামুন্নাবিয়ীন' হিসাবে তখন লিখিত ও নির্দিষ্ট হইয়াছিলাম, যখন হযরত আদম মাটির গাড়া হিসাবে পড়িয়াছিলেন।

— মুসনাদে আহমদ, শরহেস সুন্নাহ, বায়হাকী, হাকেম

ব্যাখ্যা হযরত আদম— যিনি প্রথম মানুষ, তাহাকে সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন কেবল মাটির গাড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন, উহাতে রূহ দান করা হয় নাই; ঠিক তখনো আমি 'খাতামুন্নাবিয়ীন' হিসাবে আল্লাহ্‌র নিকট নির্দেশিত ছিলাম। অন্য কথায়; দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই এই কথা আল্লাহ্‌র নিকট ফয়সালা হইয়া গিয়াছিল যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) 'খাতামুন্নাবিয়ীন' হইবেন। 'খাতামুন্নাবিয়ীন' অর্থ কি ? 'খাতাম'-এর এক অর্থ 'সীলমোহর' مہر অর্থাৎ নবী করীম (স)-এর পূর্বে দুনিয়ায় নবী আগমনের যে ধারা চলিতেছিল, মুহাম্মাদ (স) উহার উপর সীলমোহর, অর্থাৎ রাসূলের দ্বারা নবী আগমনের কাজ পূর্ণ পরিণত হইয়াছে, এই কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। আর কোন পাত্র যখন পূর্ণভাবে ভরিয়া যায় কিংবা কোন চিঠি লেখা সমাপ্ত করিয়া খামে ভরা হয় তখন উহার মুখ বন্ধ করিয়া উহার উপর সীলমোহর আটিয়া দেওয়া হয়, যেন উহার মুখ অপর কেহ খুলিতে না পারে। সীলমোহর করা হইলে পরে উহার মধ্য হইতে যেমন কোন জিনিস বাহিরে আসিতে পারে না, তেমনি বাহির হইতেও কোন জিনিস উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। আর এই দৃষ্টিতেই নবী করীম (স) সব নবীদের সীলমোহর; তাহার আগমনের এই ধারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতঃপর আর কোন নবী আসিবে না, অপর কাহারো নবী হওয়ার আর কোন অবকাশ নাই। আল্লামা রাগিব ইসফাহানী লিখিয়াছেন ঃ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ لِاَنَّهٗ خَتَمَ النُّبُوَّةَ اَىْ تَمَّمَهَا بِمَجِيْئِهٖ -

এবং রাসূলে করীম (স)-কে 'খাতামুন্নাবিয়ীন' বলা হইয়াছে কেননা তাঁহার আগমনের দ্বারা নবুয়্যতের ধারা খতম করা হইয়াছে।

'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' গ্রন্থে 'মুসলিম শরীফের' হাওয়ালায় নিম্নোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَكَتَبَ فِيْ الذِّكْرِ اَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -

আবদুল্লাহ ইবনুল আস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে স্বীয় প্রত্যেকটি সৃষ্টির সম্পর্কে পরিমাণ ঠিক করিয়া দিয়াছেন এবং 'লওহে মাহফুযে' এই কথাও লিখিয়া দিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ (স) খাতামুন্নাবিয়ীন।

— মুসলিম

অর্থাৎ সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি সাধারণ হইতেও সাধারণ জিনিস যখন পূর্ব হইতেই সুনির্ধারিত হইয়াছে, যাহার অস্তিত্ব ও সঠিক মর্যাদার উপর গোটা বিশ্বের জনগণের কল্যাণ নির্ভরশীল, তাঁহার আগমন ও তাঁহার 'সর্বশেষ নবী' হওয়ার মর্যাদাও ঠিক তখনি স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় হাদীস হইতে এই কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির প্রথম সূচনার সময়ই এই কথা সুনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়্যতই হইবে উহার শেষ পর্যায়। তাঁহার পর অন্য কোন নবুয়্যতের এক বিন্দু অবকাশ নাই।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بُنْيَانًا فَاَحْسَنَهُ وَاَجْمَلَهُ اِلَّا مَوْضَعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ يَتَعَجَّبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّاوُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আমার ও অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একখানি পাকা ঘর নির্মাণ করিল, ঘরখানিকে উত্তম ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া বানাইল। কিন্তু উহার এক কোণে একখানি ইটের স্থান শূন্য থাকিয়া গেল। অতঃপর লোকেরা সেই ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ও ঘরখানি দেখিয়া বিস্ময় ও সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল ঃ এই ইটখানি কেন লাগানো হইলো না? ইহার পর নবী করীম (স) বলিলেন, আমিই সেই ইট এবং আমিই সমস্ত নবীর সমাপ্তকারী।

— মুসলিম

ব্যাখ্যা উপরিউক্ত হাদীস হইতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই যে সর্বশেষ নবী, তাঁহার পর আর কোন নবীই আসিবেন না, ইহা ইসলামের বুনিদয়াদী আকীদার অন্তর্ভুক্ত, যে লোক ইহা বিশ্বাস করিবে না, সে আর যাহাই হউক, মুসলমান হইতে পারে না।

হযরতের শেষ নবী হওয়া কথাটি আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। হাদীসটি উপরিউক্ত তরজমা হইতেই দৃষ্টান্তটি সম্পর্কে সম্যক ও সুস্পষ্ট ধারণা করা চলে। দৃষ্টান্তটি বুঝাইবার জন্য নবী করীম (স) যে সব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রোতার মানসপটে একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ নির্মিত পাকা ঘরের ছবি অতি সহজেই ভাসিয়া উঠে। এইরূপ ঘরের একদিকে একখানি ইট লাগানো না থাকিলে উহা যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, দর্শকদের চোখে উহা প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে এবং তাহাদের মনে সম্পূর্ণতার মাঝে এই অসম্পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গ সুন্দর গৃহের এই অপূর্ণতা সম্পর্কে যে প্রবল প্রশ্ন জাগ্রত হয়, তাহা অতি স্বাভাবিক। ইহা নির্মাণ শিল্পের দৃষ্টিতেও যেমন আপত্তিকর, তেমনি মানস্তত্বের বিচারে। রাসূলে করীম (স) এই দৃষ্টান্তে তাহারই জওয়াব দিয়াছেন অতি সহজ ও সুন্দর বর্ণনার সাহায্যে।

রাসূলে করীম (স)-এর এই দৃষ্টান্তের যথার্থতা ও তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। হযরত আদম (আ) হইতে নবী আগমনের যে ধারা চলিয়াছিল, তাহা বিশ্বমানবতার জন্য নির্মাণ করিতেছিল এক পরম আশ্রয় প্রাসাদ। মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে জীবন বিধান অপরিহার্য, তাহা ধারাবাহিক নবী আগমনের দ্বারাই পূর্ণ হইতে চলিয়াছিল। হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত আসিয়া এ ধারা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইয়া যায়। ইতিপূর্বে আগত নবীগণ ছিলেন স্থান কাল ও বিশেষ জনতার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে সীমায়িত। অথচ মানবতার মহাযাত্রা চলিয়াছিল অব্যাহত গতিতে। এই যেন অসংখ্য নদী-নালা সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে। কিন্তু মহামানবতার জন্য প্রয়োজনীয় সেই মহাসমুদ্রের এখানো সাক্ষাৎ নাই। ক্রমাগত নবী-আগমনের সাহায্যে মহামানবতার জন্য যে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ আশ্রয়-প্রাসাদ নির্মিত হইতেছিল, তাহাতে এখনো একখানি ইট লাগানো হয় নাই বলিয়া তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) বলিয়াছেন যে, সেই শূন্য স্থানে লাগানো ইটখানি হইতেছেন তিনিই। ফলে তাঁহার দ্বারা এই আশ্রয় প্রাসাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে। হাদীসে উল্লেখিত শেষ বাক্যটির দৃষ্টিতে আরো একটি বিরাট তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়।

বলিয়াছেন ঃ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ "আমি নবীদের সমাপ্তকারী।" অর্থাৎ এক-একজন নবী যেন এই প্রাসাদের এক একখানি ইট। হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের ফলে সেই প্রাসাদ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তখনো একখানি ইটের স্থান শূন্য রহিয়া গিয়াছিল। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়্যত লাভে তাহা পূর্ণ হয়। অতঃপর এই প্রাসাদ নিখুঁত , পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। ইহাতে যেমন অপর কোন ইটের প্রয়োজন নাই, তেমনি নাই একবিন্দু শূন্যতা যেখানে অপর কোন ইটের স্থান সংকুলান হইতে পারে।

হযরত মুহাম্মাদ (স) যে সর্বশেষ নবী এবং তাঁহার পর আর কোন নবী আসিবেন না, তাহার কোন প্রয়োজনও নাই, তাহা কুরআন মজীদের স্পষ্ট ঘোষণায় স্বপ্রমাণিত। এই পর্যায়ে হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও উদ্ধৃত রহিয়াছে অসংখ্য হাদীস। এবং কুরআন ও হাদীস— ইসলামের এই একমাত্র ভিত্তি ও উৎসদ্বয় একবাক্যে এই কথার পৌনঃপুনিক ঘোষণা করিয়াছে। অতঃপর এ ব্যাপারে না থাকে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ না থাকে কাহারো ভিন্নতর মত প্রকাশের অধিকার। উপরে উদ্ধৃত হাদীসের শব্দ হইতেছে أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ আমি নবীদের সমাপ্তিকারী— শেষ নবী। হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত মুসলিম শরীফেরই অপর একটি হাদীসের শব্দ হইতেছে ঃ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - আমি আসিয়াছি, ফলে নবীদের সমাপ্তি করিয়া

দেওয়া হইয়াছে। 'শামায়েলে তিরমিযী' গ্রন্থে হযরত আলী (রা)-এর একটি কথা উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ —তিনিই নবীদের সমাপ্তিকারী।

শেষ নবীর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانَ مُوْسٰى حَيًّا وَّ اَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَا تَّبَعَنِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَاوَسِعَهٗ اِلَّا اتِّبَاعِىْ -

(دارمى، مسند احمد)

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাহার মুষ্ঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ-জীবন রহিয়াছে, মূসাও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তোমরা তাঁহার অনুসরণ কর আর আমাকে তোমরা পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা নিশ্চতরূপে সঠিক সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। বাস্তবিকই মূসা যদি এখন জীবিত থাকিতেন এবং আমার নবুয়্যতের সময় পাইতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করিতেন। অপর একটি সূত্রে বলা হইয়াছে— তাহার পক্ষে আমার অনুসরণ ভিন্ন কোন উপায় থাকিত না। — দারেমী, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণের অপরিহার্যতা প্রমাণ করা হইয়াছে। কেননা হযরত আদম (আ) হইতে নবী আগমনের যে ধারা সূচিত হইয়াছিল, হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত আসিয়া সেই ধারা চিরতরে শেষ হইয়া গিয়াছে। এই জন্য তিনি হইলেন 'খাতামুন্নাবিয়ীন'— সর্বশেষ নবী, নবী-আগমন ধারার সর্বশেষ পর্যায়। তাঁহার পর মানুষের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী লইয়া আর কোন নবী আসিবেন না। মানুষের জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যে বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে সর্বশেষ নবীর মারফতে। আল্লাহ্‌র যে বিধান আসিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অবিকৃত অক্ষত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় সর্বত্র বর্তমান আছে। তাই বস্তুতই এখন আর নূতন নবীর আগমনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। শুধু তাহাই নয়, শেষ নবীর উপস্থাপিত আল্লাহ্‌র বিধানের চূড়ান্ত সংস্করণ অক্ষতরূপে বর্তমান থাকা অবস্থায় আর একজন নবী বা আর একটি বাণী আসা বাহুল্য এবং বর্তমান বাণীর পক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাই নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, অতঃপর আমার অনুসরণ— আমি যে বিধান ও আদর্শ বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি তাহা মানিয় চলা ভিন্ন মানুষের মুক্তির আর কোন উপায় নাই। এমনকি, হযরত মূসা (আ)-এর ন্যায় একজন মহাসম্মানিত নবীও যদি আজ পৃথিবীতে জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহাকেও আমারই উপস্থাপিত বিধান ও আদর্শের অনুসরণ করিতে হইত। কেননা মানুষের মুক্তিপথ যাহা কিছু হইতে পারে, তাহা আমারই উপস্থাপিত বিধান ও আদর্শে নিহিত রহিয়াছে। এখন তোমরা আমার জীবদ্দশায় কিংবা আমারই উপস্থাপিত বিধান ও আদর্শ অক্ষত অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও উহা বর্জন ও পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য কোন নবী কিংবা অন্য কোন আদর্শের অনুসরণ কর তবে উহার ফলে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

এক কথায়, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে শেষ নবী বলিয়া বিশ্বাস করা এবং তাঁহার উপস্থাপিত বিধান ও আদর্শের বাস্তব অনুসরণই হইতেছে তাঁহার সময়ের ও তাঁহার পরবর্তী কালের বিশ্বমানবের একমাত্র মুক্তিপথ। তাঁহাকে শেষ নবীরূপে বিশ্বাস না করিলে কিংবা বিশ্বাস করিয়া বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহার বিধান ও আদর্শের অনুসরণ না করিলে জনগণের পথভ্রষ্ট হওয়া নিশ্চিত।

নবীকে অনুসরণের গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى - (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের সকল লোকই বেহেশতবাসী হইবে। কিন্তু যে অস্বীকার করিয়াছে (সে বেহেশতবাসী হইতে পারিবে না।)। জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ কে অস্বীকার করিয়াছে, হে রাসূল ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ যে আমার অনুসরণ করিল, সেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে, আর যে ব্যক্তি অনুসরণ করিল না সেই অস্বীকার করিল।

ব্যাখ্যা এখানে উম্মত বলিতে উভয় প্রকার উম্মত হইতে পারে। যাহাদের প্রতি রাসূল দ্বীনের দাওয়াত দিয়াছেন কিংবা যাহারা তাঁহার দাওয়াত কবুল করিয়াছে। প্রথম প্রকারের উম্মত বুঝাইলে তাঁহাকে অস্বীকারকারী হইবে কাফিরগণ আর দ্বিতীয় প্রকার উম্মত বুঝাইলে তাঁহার অস্বীকারকারী হইবে মুসলমান গুনাহগার লোক। এই হাদীসের মূল অর্থ হইল ঃ

مَنْ اَطَاعَنِىْ وَتَمَسَّكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمِن اتَّبَعَ هَوَاهُ وَزَلَّ عَنِ الصَّوَابِ وَضَلَّ عَنِ الطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ فَقَدْ دَخَلَ النَّارِ - (طيبى)

যে আমার অনুসরণ করিল ও কিতাব এবং সুন্নাতকে মজবুত করিয়া ধরিল সে বেহেশতে দাখিল হইবে। আর যে নফসের অনুসরণ করিল, সত্য হইতে পদস্খলিত হইল ও সঠিক পথ হইতে ভ্রষ্ট হইল, সে জাহান্নামে দাখিল হইবে। —তাইয়্যেবী।

নবী করীম (স)-এর অনুসরণ করিয়া চলা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং নবীকে বাস্তবে অনুসরণ না করিলে যে নবীকে অস্বীকার ও অমান্য করা হয়, আর তাহার পরে বেহেশতবাসী হওয়া যে কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়, এই কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এই হাদীসে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ইসলামে নবীর স্থান

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رض قَالَ قَدِمَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا قَالَ

فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ - (مسلم)

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছ 'তালি' লাগাইবার কাজ করিতেছিল। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা এ কি করিতেছ ? উত্তরে তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহার ব্যাখ্যা করিল। নবী করীম (স) বলিলেন ঃ তোমরা এই কাজ না করিলে তোমাদের পক্ষে ভালই হইবে বলিয়া মনে হয়। অতঃপর লোকেরা তাহা পরিত্যাগ করিল। কিন্তু ইহার ফলে এই হইল যে, ফলন অত্যন্ত কম হইল। হাদীস বর্ণনাকারী বলিতেছেন যে, লোকেরা হযরতের নিকট এই ব্যাপারের উল্লেখ করিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমি যখন দ্বীন সম্পর্কীয় ব্যাপারে কোন নির্দেশ তোমাদেরকে দেই, তখন তোমরা তাহা পুরাপুরি মানিয়া লইও, আর যখন নিজের ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে তোমাদের কিছু বলি, তখন আমি একজন মানুষ বৈ আর কিছু নই। — মুসলিম

ব্যাখ্যা নবী করীম (স) হিজরত করিয়া মদীনায় উপনীত হইলে পর সেখানকার লোকদের দেখিলেন, তাহারা একটি খেজুর গাছের শাখার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া অপর একটি খেজুর গাছের ডালের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতেছে। ইহার দ্বারা খেজুর গাছের ফলন খুব বেশি হয় বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাহারা ইহা করিত। বস্তুত ইহা একটি কৃষি বিজ্ঞান (Agriclutural) সংক্রান্ত ব্যাপার, ঠিক জীবন-ব্যবস্থা ও জীবন-দর্শনের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। নবী করীম (স) এইরূপ কাজ দেখিয়া মনে করিলেন, ইহা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ কোন কারণ নাই। তাই তিনি বলিলেন, "এই কাজ না করিলেই বরং তোমাদের পক্ষে ভাল।" কিন্তু ইহা পরিত্যাগ করা হইলে পরবর্তী বৎসর দেখা গেল খেজুর গাছে ফলন পূর্বের পরিমাণ অনুরূপ হয় নাই। তখন নবী করীম (স)-এর নিকট এই ব্যাপারটি উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ ইহা একটি নিছক বৈষয়িক কারিগরি ও কৃষি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যাপার। এই সম্পর্কে আমি যখন কিছু বলি, তখন তাহা আমার ব্যক্তিগত মত ছাড়া তো কিছু নয়। কাজেই তাহা কার্যকর হওয়া না হওয়ার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। এই সব বিষয়ে আমার কোন মত গ্রহণ করিলে তাহা আমার নিজস্ব মত ও ধারণা মাত্র মনে করিয়া গ্রহণ করিবে। কিন্তু আমি যখন জীবন ব্যবস্থা— জীবন, সমাজ ও তমদ্দুন সম্পর্কে কোন কথা বলি, তখন যেহেতু তাহা আল্লাহ্র প্রেরিত নবী হিসাবেই বলি এবং সব কথাই আল্লাহ্র ওহীর ভিত্তিতে বলি, এই জন্য তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল হইয়া থাকে, কাজেই তাহা তোমরা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিবে।

এক ঃ নবী করীম (স) একজন মানুষ ছিলেন, এই জন্যই সকল বৈষয়িক ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মত নির্ভুল হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু নবী করীম (স) যখন জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থা বা বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কোন কিছু বলেন তখন তাহা সবই 'ওহীর' ভিত্তিতে বলিয়া থাকেন; অতএব তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল হইয়া থাকে।

দুই ঃ বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় যে, আলোচ্য হাদীসে 'দ্বীন' ও দুনিয়া— বা ধর্ম, সমাজ ও তমদ্দুনের দ্বৈততা প্রমাণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়।

তিন ঃ হাদীস হইতে ইহাও জানা যায় যে, নবী করীম (স) রাসূল হিসাবে নানা বিষয়ে ইজতিহাদ করিতেন। শরীয়তের ব্যাপারে তিনি ইজতিহাদ করিয়া যাহা কিছু বলিতেন, তদনুযায়ী আমল করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব। খেজুর গাছের তালি লাগানো নিষেধ করা এই পর্যায়ের নয়। বরং উহা হইতেছে দুনিয়ার কারিগরি ব্যাপার সংক্রান্ত একটি ধারণা মাত্র। মুহাদ্দিসদের মতে ঃ

لَمْ يَكُنْ هٰذَا الْقَوْلُ خَبَرًا اِنَّمَا كَانَ ظَنًّا -

রাসূলের এই কথাটি কোন প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে প্রদত্ত সংবাদ ছিল না; বরং ইহা ছিল রাসূলের ধারণা মাত্র।

শেষ নবীর প্রতি ভালবাসা

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - (بخارى، ومسلم)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেহই ঈমানদার হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না তাহার নিকট তাহার পিতা, সন্তানাদি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা আমিই অধিকতর প্রিয় হইব।
— বুখারী, মুসলিম

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِى وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غَشٌّ لِّاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَىَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ -

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ হে আমার প্রিয় বালক! তোমাদের পক্ষে সম্ভব হইলে সকাল ও সন্ধ্যা এমনভাবে অতিবাহিত করিবে যে, তোমাদের মনে কাহারো জন্যই কোন প্রকার মালিন্য থাকিবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ হে প্রিয় বালক! জনগণের প্রতি এইরূপ সাধারণভাবে ভালবাসা পোষণ করা আমার নীতি— আমার আদর্শ। যে ব্যক্তি আমার আদর্শকে ভালবাসে, সে যেন ঠিক আমাকেই ভালবাসিল আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসিল, সে বেহেশতে আমারই সঙ্গী হইবে। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ভালবাসা স্থাপনের অত্যাধিক প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত নবীর প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসা না থাকিলে তাঁহার আদর্শের যথাযথ অনুসরণ কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, পিতা, সন্তানাদি ও জনগণের প্রতি সাধারণত যেরূপ ভালবাসা হইয়া

থাকে, তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি ভালবাসা পোষণ করিতে হইবে নবীর প্রতি। ভালবাসা মোটামুটি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যাহা স্বাভাবিক, যাহা মানুষের রক্ত ও মজ্জার সহিত মিশিয়া থাকে— যাহাকে বলা হয় রক্তের টান— যাহা জন্মগত, যাহা ইচ্ছানির্ভর নয়। পিতামাতা, সন্তানাদি এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনের প্রতি এই প্রকারের ভালবাসা হইয়া থাকে। আদর্শিক, জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেকজনিত, যাহা আপনা হইতেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। বরং যাহা ইচ্ছা করিয়া নিজের মন-মস্তিষ্ক দিয়া সৃষ্টি করিতে হয় ও মর্মে মর্মে অনুভব করিতে হয়। আলোচ্য হাদীসে নবীর প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসা স্থাপন সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা প্রথম প্রকারের নয়— এই দ্বিতীয় প্রকারের ভালবাসাই ইহার লক্ষ্য। অর্থাৎ পিতামাতা ও সন্তানাদির প্রতি যে ভালবাসা রহিয়াছে তাহা তো স্বাভাবিক ও মজ্জাগত কিন্তু মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও দ্বীন-ইসলামের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভালবাসা রাখিতে হইবে নবীর প্রতি। এমনকি কখনো যদি পিতা-মাতা, সন্তান জনগণের ভালবাসা ও নবীর প্রতি ভালবাসার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়; এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তখন পিতামাতা সন্তানের প্রতি ভালবাসা রক্ষা করিলে নবীর প্রতি ভালবাসা রক্ষিত হয় না, আবার নবীর প্রতি ভালবাসা রক্ষা করিলে পিতামাতা-সন্তানাদির প্রতি ভালবাসা রক্ষা করা সম্ভব হয় না, তখন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ হইবে সকল প্রকার ভালবাসাকে অস্বীকার করিয়া, অন্যান্য সকল প্রকার ভালবাসার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া নবীর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং এই ভালবাসার মর্যাদা ও দাবিকে যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া চলা।

শেষোক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, কাহারো প্রতি একবিন্দু মালিন্য না রাখিয়া অকপট হৃদয়ে সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহন করা— অন্য কথায় সাধারণভাবে সকলের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা নবীর আদর্শ। নবীর আদর্শকে ভালবাসিয়া যাহারা মানবতার প্রতি অকপট মনোভাব রক্ষা করিতে পারে, তাহারা যেন নবীকেই ভালবাসার কর্তব্য পালন করিল। অর্থাৎ নবীকে ভালবাসার অর্থ হইতেছে নবীর আদর্শকে ভালবাসা, পক্ষান্তরে নবীর আদর্শকে ভালবাসিয়া উহার অনুসরণ করা নবীর প্রতি ভালবাসারই বাস্তব প্রমাণ। যাহারা নবীকে ভালবাসেন বলিয়া দাবি করেন, কিন্তু নবীর জীবনাদর্শকে ভালও বাসেন না— বাস্তবে উহার অনুসরণও করেন না, নবীর প্রতি তাহাদের ভালবাসার দাবি করা একেবারে অমূলক— একেবারে অর্থহীন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَ الَّذِيْنَ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ - (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ যাঁহার সৃষ্টির মধ্যে আমার জান-প্রাণ নিবদ্ধ তাঁহার শপথ, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত কাহারো নিকট তাহার পিতা ও সন্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হইব, ততক্ষণ তোমাদের কেউ ঈমানদার হইতে পারিবে না। —বুখারী

ব্যাখ্যা হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস হইতে এ হাদীসটির শব্দের কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্বোক্ত হাদীসে কোন শপথের উল্লেখ নাই, ইহাতে তাহা আছে। পূর্বোক্ত হাদীসের 'সমস্ত মানুষ'-এর উল্লেখ আছে; কিন্তু এই হাদীসে তাহা নাই। ইহা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) একই মর্মের কথা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে এবং শ্রোতাদের গুণ পার্থক্যের দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কাজেই মূল কথায়

কোন পার্থক্য না থাকিলেও কথা বলার ধরন, ভঙ্গি, জোশ, পরিবেশ ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে মূল কথার গুরুত্ব ও তেজস্বিতার দিক দিয়া যথেষ্ট পার্থক্য হইয়া যায়। শপথ উল্লেখ করায় এই হাদীসটির বক্তব্য অধিকতর বলিষ্ঠ হইয়াছে। ইহা হইতে এই কথাও জানা যায় যে, অস্পষ্ট বিষয়ের গুরুত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে শপথ করিয়া কথা বলা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয, যদিও শপথের দাবিদার কেহই নাই।

হাদীসে উল্লেখিত শপথের ভাষা এইরূপ ঃ যে সত্তার হস্তে আমার জান ও প্রাণ। এখানে স্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌কেই বুঝানো হইয়াছে। কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো হস্তে মানুষের জান-প্রাণ নিবদ্ধ নয়। কিন্তু 'আল্লাহ্‌র হস্ত' বলা কি সঙ্গত ? আল্লাহ্‌র হাত আছে— এই কথার অর্থ কি ? আলোচ্য শপথের ভাষা দৃষ্টে এই প্রশ্ন প্রবল হইয়া দাঁড়ায়।

ইহার জওয়াব এই যে, 'আল্লাহ্‌র হাত' কথাটি মুতাশাবিহাত-এর মধ্যে গণ্য। 'মুতাশাবিহাত' বলা হয় এমন সব কথাকে যাহার বাস্তব রূপ নির্দিষ্টভাবে ধারণা করা সম্ভব হয় না। যাহাতে অস্পষ্টতা থাকিয়া যায়। যাহা পূর্ণমাত্রায় মানুষের বোধগম্য হয় না। এই বিষয়ে ইসলমী মনীষিগণ দুই রকমের মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক শ্রেণীর মনীষীদের মতে এই ধরনের কথাকে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করিয়া রাখা বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদের মতে কুরআনের ভাষায় مَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ উহার তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানে না।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের মতে এই ধরনের কথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। ইহার অর্থ বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। তাঁহারা বলেন ঃ اَلْمُرَادُ مِنَ الْيَدِ الْقُدْرَةَ হাত অর্থ কুদরত বা ক্ষমতা। ইহাদের মতে 'মুতাশাবিহাতের' অর্থ আল্লাহ এবং বিশেষ পারদর্শীরাও উহার তাৎপর্য বলিতে পারেন। কিন্তু এই মত সমর্থনযোগ্য নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ

اِنَّ تَاوِيْلَ الْيَدِ بِالْقُدْرَةِ وَنَحْوَ ذٰلِكَ يُؤَدِّىْ اِلَى التَّعْطِيْلِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَثْبَتَ لِنَفْسِهِ يَدًا فَاِذَا أُوِّلَتْ بِالْقُدْرَةِ يُصِيْرُ عَيْنُ التَّعْطِيْلِ وَاِنَّمَا الَّذِىْ يَنْبَغِىْ فِىْ مِثْلِ هٰذَا اَنْ نُؤْمِنَ بِمَا ذَكَرَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰى مَا اَرَادَهُ وَلَا نَشْتَغِلَ بِتَاوِيْلِهِ فَنَقُوْلَ لَهُ يَدٌ عَلٰى مَا اَرَادَهُ لَا كَيَدِ الْمَخْلُوْقِيْنَ -

হাতের অর্থ কুদরত করিলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, কেননা আল্লাহ্‌র নিজের হাত আছে বলিয়া নিজেই বলিতেছেন। এখন উহার অর্থ যদি 'কুদরত' বা শক্তি করা হয়, তাহা হইলে ইহার কোনই অর্থ হয় না। বরং আল্লাহ্‌র কথা অর্থহীন বলিয়া গণ্য হয়। কাজেই এই সব ব্যাপারে আল্লাহ যেভাবে কথা বলিয়াছেন, সেই ভাবেই ঈমান আনা আমাদের কর্তব্য এবং ইহার নিজস্বভাবে কোন ভিন্ন অর্থ করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়। অতএব আমরা বলিব ঃ আল্লাহ্‌র হাত আছে কিন্তু তাহা সৃষ্ট জীবের হাতের মতো নয়।

'ঈমানদার হইতে পারিবে না' অর্থ কামেল ঈমানদার হইতে পারিবে না। তাহার ঈমান হইবে অসম্পূর্ণ কাঁচা অপরিপক্ক, অমজবুত। কেননা তাহারা রাসূল (স)-এর জন্য কোন প্রকার

ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজি হইবে না। অথচ ঈমানের দাবি হইতেছে— "রাসূলের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা, নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া।" এই কারণেই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ – (الانفال - ٢٤)

হে নবী! আল্লাহ এবং তোমার অনুসরণকারী ঈমানদার লোকেরাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

মুহাদ্দিস আবূ জানাদ বলেন, রাসূল (স) কে যে 'অল্প' শব্দে বিরাট ও ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা দান করা হইয়াছিল আলোচ্য হাদীস উহার একটি দৃষ্টান্ত। ইহাতে উল্লেখিত 'মুহব্বত' তিন প্রকারের হইবে পারে ঃ (১) কাহারো দাপট ও বিরাটত্বের কারণে ভালবাসা— যেমন, পিতার ভালবাসা, (২) দয়া ও স্নেহযুক্ত ভালবাসা— যেমন সন্তানের ভালবাসা এবং (৩) সমগোত্রীয়তা ও ভাললাগার ভালবাসা— যেমন লোকদের পারস্পরিক ভালবাসা। আর নবী করীম (স) হইতেছেন এই সকল প্রকার ভালবাসারই সর্বাধিক অধিকারী।

কাজী ইয়ায বলিয়াছেন ঃ রাসূল (স)-কে ভালবাসা অর্থ তাঁহার আদর্শ গ্রহণ, পালন ও রক্ষা করা, উহার সাহায্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাঁহার প্রদত্ত শরীয়তকে বিলয় হইতে রক্ষা করা, তাহার জীবনে তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার কামনা করা। আর এই উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ ও ধনমাল উৎসর্গ করা। ইহা ব্যতীত প্রকৃত ঈমান কখনো পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না এবং সকল পিতার সন্তান অনুগ্রহকারী ও মর্যাদা দানকারীর উপরে রাসূলের মর্যাদা অনুভব করিতে না পারিলে ঈমান নির্ভুল হইতে পারে না। এইরূপ আকীদা যাহার হইবে না, সে ঈমানদারই নয়। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেন ঃ ভালবাসা, হয় কোন ফায়দা লাভের কারণে হইবে, নয় মনের আকর্ষণের কারণে, অথবা বিশেষ কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে। আবার মনের ঝোঁক হয় কখনো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন স্বাদ গ্রহণের জন্য, যেমন সুশ্রীতা ও রূপ-সৌন্দর্য; অথবা বুদ্ধিগত কোন বিশেষত্বের জন্য— যেমন বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য, প্রতিজ্ঞা ও মাহাত্ম। আবার কখনো তাহা হয় কাহারো বিশেষ অনুগ্রহ লাভ ও বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার কারণে। আর এই তিনও প্রকার যোগ্যতা ও ভালবাসা প্রাপ্তির যাহা কারণ, তাহা রাসূলের করীম (স)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। তিনি বাহ্যিক সৌন্দর্যেও বিভূষিত ছিলেন, তেমন সৌন্দর্য কোথাও দেখা যায় না। তাঁহার অন্তলোক অত্যন্ত সৌন্দর্য মণ্ডিত মাহাত্ম্যে ভরপুর ছিল। সকল প্রকার লৌকিক ও অলৌকিক গুণ তাঁহার মধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। সমস্ত মুসলিমের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ ও কল্যাণও ছিল অপরিমেয়। কেননা তিনিই মুসলিমকে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' প্রদর্শন করিয়াছেন, যে পথ অনুসরণ করিয় তাহারা পরকালীন চিরস্থায়ী কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে। অতএব তাঁহার প্রতি সবচেয়ে অধিক মাত্রায় ভালবাসা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

নবীর প্রতি ভালবাসার সঠিক রূপ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رض قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُنْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِىْ فَاَعِدَّ لِفَقْرٍ تِجْفَافًا فَاِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ مُنْتَهَاءُ – (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি বলিতেছ তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। সে বলিল ঃ আল্লাহ্র শপথ, আমি আপনাকে ভালবাসি এবং কথাটি সে তিনবার উচ্চারণ করিল। তখন নবী করীম (স) বলিলেন ঃ তুমি যদি বাস্তবিকই আমাকে ভালবাস তবে দারিদ্রের কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হও। কেননা, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, সে নিম্নভূমির দিকে পানি যত তীব্রগতিতে চলে তাহা অপেক্ষাও অনেক তীব্র গতিতে দারিদ্র্যের দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা এই হাদীসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র রাসূল (স)-এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা যেমন নিছক একটি মৌখিক দাবিরই জিনিস নয়, তেমনি ইহা কেবল অন্তরের এক সম্পর্কের ব্যাপারও নয়। বরং ইহার বাস্তব দাবি ও বাধ্যবাধকতা যথেষ্ট রহিয়াছে যাহা যথাযথরূপে পূরণ না করিলে এই মৌখিক দাবির কোনই মূল্য হইতে পারে না। কাহারো মনে হযরতের প্রতি বাস্তবিকই ভালবাসা থাকিলে, তাহাকে সেই জন্য অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বস্তুত হযরত (স)-কে ভালবাসার অর্থ হযরত (স)-এর জীবনাদর্শ ও তাঁহার প্রকৃত মিশনকে ভালবাসা। কাজেই হযরত (স) কে ভালবাসিলে তাঁহার প্রচারিত আদর্শকেও ভালবাসিতে হইবে। তাঁহার ন্যায় এক আদর্শবাদী সংগ্রামী জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহাকে রাসূলেরই ন্যায় আল্লাহ্র খালেস বন্দেগীর পন্থা অবলম্ব করিতে হইবে এবং সমগ্র বিশ্বমানবকেও সেই দিকে আহ্বান জানাইবার জন্য তাহাকে রীতিমত উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। ফলে এই পথে তাহাকে বহু অসুবিধা, বহু দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হইবে। প্রথমত একটি অনৈসলামিক সমাজ ও পরিবেশে যখন এক ব্যক্তি হালাল-হারাম, ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পায় যে, দুনিয়ার নির্লিপ্ত জীবন যাপনের সমস্ত পথ তাহার সম্মুখে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ তো দূরের কথা সাধারণভাবে জীবন যাপন করার উপযোগী সামগ্রী হালালভাবে সংগ্রহ করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

তাহা ছাড়া যে সত্যের আদর্শকে সে নিজে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অন্যান্য লোকদের পর্যন্ত পৌঁছানো ও সামাজিক জীবনে উহাকে কার্যকরীভাবে জারি করার জন্য চেষ্টা ও সাধনা করার কাজ এত কঠিন ও দুরূহ যে, তাহার সমস্ত লক্ষ্য কর্মক্ষমতাকে সেই দিকেই নিযুক্ত করিতে হয়। তাহার ফলে জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজ করার বিশেষ কোন অবকাশই সে পায় না।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম তাহাকে এই কথা বুঝাইয়া দেয় যে, পরকালের জীবনই হইতেছে প্রকৃত জীবন, দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম মানুষকে গোমরাহ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহাকে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বিমুখ করিয়া দেয়, দুনিয়ার আয়েশ-আরামের পরিণামে পরকালে শাস্তিভোগের পরিবর্তে সে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকেই স্বীকার করিয়া নেয় পরকালের সুখ ও শান্তির আশায়। কেননা পরকালীন সুখ-শান্তিই চিরন্তন ও শাশ্বত।

আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি ভালবাসা পোষণ করার ইহাই হইতেছে বাস্তব দাবি। ইহারই দরুন এই ভালবাসা কোন বিলাসিতার জিনিস নয়; বরং ইহা মানুষকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে এবং তাহাকে দরিদ্র বানাইয়া দেয়। আলোচ্য হাদীসের ইহাই সারমর্ম।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ يَاغُلَامُ اِنِّي اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ اِذَا سَئَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ - (مسند احمد، ترمذى)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি নবী করীম (স)-এর পশ্চাতে জন্তুযানে আরোহিত ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিতেছি— (১) আল্লাহকে স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্ তোমার রক্ষক হইবেন, (২) আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) হিফাযত কর, তাহা হইলে আল্লাহকে বা আল্লাহ্‌র রহমতকে তোমার সম্মুখে দেখিতে পাইবে, (৩) যখন কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন বোধ কর, তখন এক আল্লাহ্‌র নিকট তাহা চাহিও, (৪) যখন কোন সাহায্য পাইতে চাও, তখন আল্লাহ্‌র নিকটই পাইতে চাও (৫) এই কথা মনে রাখিও যে, সমগ্র লোক যদি তোমার উপকার করার জন্য মিলিত-একত্রিত হয়, তবু তাহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না, অবশ্য শুধু এতটুকুই পারিবে, যতটুকু আল্লাহ্ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে সকল লোক যদি তোমার ক্ষতি করিবার জন্য একযোগে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়, তবুও তাহারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করিতে পারে যতটুকু আল্লাহ্‌র নিকট নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহার বেশি নয়। — মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা মূল হাদীসে দুইবার বলা হইয়াছে ঃ احْفَظِ اللّٰهَ ইহার শাব্দিক তরজমা হইল ঃ আল্লাহ্‌র হিফাযত— রক্ষণাবেক্ষণ কর। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিজ সত্তা জনগণের কোন হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা রাখে না বলিয়া ইহার অর্থ হইবে— "আল্লাহকে স্মরণ রাখ এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের হিফাযত কর।" বস্তুত আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তাঁহার দ্বীনই হইল মানুষের বাস্তব জীবনে আল্লাহকে রক্ষা করার একমাত্র সূত্র; তাই আল্লাহকে স্মরণ রাখিলে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে রক্ষা করিলেই মানুষের সমাজ জীবনে আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণ হইতে পারে।

বলা হইয়াছে, যখন কিছু চাও, আল্লাহ্‌র নিকট চাও; যখন কোন কিছুর সাহায্য চাইতে হয়, তাহা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর। বস্তুত ইহা ইসলামের তওহীদ শিক্ষার মূল নির্দেশ। আল্লাহ্‌কে 'এক' মানিয়া লইলে তওহীদ বা একত্ববাদ স্বীকার করা হয় না, বরং মানুষকে যাহাই চাহিতে হয়, যা কিছু সাহায্য অন্যের নিকট হইতে লইতে হয়, তাহা সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র নিটকই চাওয়া উচিত। একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই তাহা গ্রহণ করা উচিত। ইহা তওহীদ বিশ্বাসের দাবি।

হাদীসের শেষার্ধে তকদীর বা অদৃষ্টের কথা বলা হইয়াছে। কাহারো উপরকার বা একবিন্দু ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারটি মূলত আল্লাহ্‌রই নিকট নির্দিষ্ট রহিয়াছে। এই দুনিয়ার মানুষ ক্ষতি বা লোকসান— যাহা কিছুরই সম্মুখীন হয়, তাহা সবই আল্লাহ্‌র নিকট নির্দিষ্ট যাহা কিছু আছে সেই অনুযায়ী হইয়া থাকে এবং তাহা আল্লাহ্‌র মঞ্জুরীক্রমেই হইয়া থাকে। অতএব দুনিয়ার সকল মানুষ একত্রিত হইয়া কাহারো একবিন্দু উপকার করিতে চাহিলে তাহা শুধু ততটুকু পরিমাণই করা সম্ভব, যতটুকু আল্লাহ্‌র দরবারে নির্দিষ্ট হইয়া আছে; অনুরূপভাবে সমগ্র জাতি মিলিয়াও কাহারো একবিন্দ্র ক্ষতি করিতে চাহিলে তারা ঠিক ততটুকুই করিতে পারিবে, যতটুকু আল্লাহ্‌র দরবারে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। মানুষের কি উপকার আর কি ক্ষতি— সব আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত রহিয়াছে। তাহার বিপরীত— বেশি কিংবা কম কিছু হওয়া এই দুনিয়ায় সম্ভব নয়।— বস্তুত ইহাই হইতেছে তকদীর বা অদৃষ্টবাদের মূল কথা। এই কথাকেই যাহারা জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-হৃদয় ও মন-আন্তর দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এই দুনিয়ায় তাহারা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো একবিন্দু পরোয়া করে না। তাহারা সকল পার্থিব ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠিয়া প্রকৃত সত্য দ্বীন-ইসলামকে পূর্ণরূপে কায়েম করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করে, সাধনা ও সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। বস্তুত এই তকদীর বিশ্বাস মানুষকে কখনো নিষ্ক্রিয়, আশাহত ও ব্যর্থ মনোরথ করিয়া দেয় না; বরং মানুষকে অত্যধিক সক্রিয় আশাবাদী ও বিদ্যোৎসাহী করিয়া তোলে— সে হয় নির্ভিক ও বীর পুরুষ। যদিও বর্তমানে এই তকদীর বিশ্বাসই গোটা মুসলিম জাতিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া দিয়াছে এবং তাহা তকদীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা গ্রহণের ফলেই হইয়াছে।

তকদীর বিশ্বাসের আবশ্যকতা

عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيْ قَالَ اَتَيْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ شَىْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِىْ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُّذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِىْ فَقَالَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوٰتِهٖ وَاَهْلَ اَرْضِهٖ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ اَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَوْمَتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ -

(احمد، ابوداؤد، ابن ماجه)

ইবনুদ্দায়লামী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কাবের নিকট উপস্থিত হইলাম ও বলিলাম ঃ তকদীর সম্পর্কে আমার মনে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাজেই আপনি সে সম্পর্কে কিছু বলুন, সম্ভবত আল্লাহ্ আমার মন হইতে এই সংশয় দূর করিয়া দিবেন (ও এই ব্যাপারে আমার মন সান্ত্বনা লাভ করিবে)। তিনি বলিলেন ঃ শোন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টিকে আযাবে নিক্ষেপ করেন তবে তাহাতে আল্লাহ জালিম (বলিয়া অভিহিত) হইবেন না। আর তিনি যদি এই সমস্তকেই রহমত দানে ধন্য করিয়া দেন, তবে তাঁহার এই রহমত তাহাদের নিজস্ব আমল অপেক্ষা অনেক ভাল হইবে। তোমরা যদি ওহোদের পাহাড় সমান স্বর্ণও আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তবে তাহা আল্লাহ্র দরবারে কুবল হইবে না যতক্ষণ না, তুমি তকদীরকে বিশ্বাস করিবে এবং তোমাদের এই পাকা আকীদা হইবে যে, যাহা কিছু তোমার উপর আসিতেছে তাহা হইতে তুমি কোনক্রমেই রেহাই পাইতে পার না! আর যে অবস্থা তোমার উপর আসিবার নয়, তাহা তোমার উপর আসিতে পারে না। তোমরা উহার বিপরীত ধারণা লইয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে নিশ্চয়ই তোমরা দোযখে যাইবে। ইবনুদ্দায়লামী বলেন ঃ উবাই ইবনে কা'বের এই কথা শোনার পর আমি আবদুল্লাহ ইবেন মাসউদের খিদমতে হাযির হইলাম, তখন তিনিও আমাকে এইরূপ কথাই বলিলেন। অতঃপর হুযায়ফার নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনিও আমাকে এই কথাই বলিলেন। ইহার পর আমি জায়দ ইবনে সাবিতের নিকট উপস্থিত হইলাম তিনিও এই কথাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর তরফ হইতে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিলেন। — মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা

ব্যাখ্যা 'তকদীর' এর শাব্দিক অর্থ পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া। আর ইসলামী পরিভাষায় তকদীর হইতেছে একটি ইসলামী আকীদার নাম, যাহাতে এই কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া লইতে হয় যে, এই দুনিয়ায় যাহা কিছু হয়, তাহা সবই আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আর আল্লাহ যাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এমন কি মানুষ ভবিষ্যতে কি করিবে আর কি করিবে না, এই দুনিয়ায় কাহার শান্তি হইবে আর কাহার অশান্তি, পরকালে কে বেহেশতে যাইবে আর কে দোযখে তাহা সবই আল্লাহ তাআলা পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। বাংলা চলিত ভাষায় ইহাকে আমরা বলি অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি। বস্তুত এই আকীদা ইসলামের ছয়টি মৌল আকীদার মধ্যে অত্যন্ত জরুরী আকীদা।

তকদীর সম্পর্কীয় আকীদা সম্পর্কে কাহারো কাহারো মনে অনেক ওয়াসওয়াসা জাগিয়া থাকে, অনেক ঈমানদার ব্যক্তির মনও অনেক সময় সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়ে। তাহারা চিন্তা করেঃ সব কিছুই যদি আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত হইয়া থাকে তবে স্বীয় কর্মের কারণে দুনিয়ায় কেহ সচ্ছল অবস্থায় আর কেহ দুরবস্থায় কেন পড়িয়া যায় এবং পরকালে কেহ বেহেশতে আর কেহ দোযখে যাইবে কেন ? কোন ঈমানদার ব্যক্তির মনে এই ধরনের কোন ওয়াসওয়াসা জাগিলে তাহা দূর করার সহজ উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও মালিক হওয়ার কারণে নিখিল সৃষ্টিলোকের উপর তাঁহার যে একচ্ছত্র প্রভুত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব রহিয়াছে তাহা গভীরভাবে স্মরণ করিবে এবং মনে করিবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের সহিত যে ব্যবহারই ইচ্ছা করিতে পারেন। আল্লাহ নিজে যেহেতু কোন কিছুর জন্য বাধ্য নন সেই জন্য যাহা ইচ্ছা করার তাঁহার পুরোপুরিই অধিকার রহিয়াছে। তিনি যদি সকলকে আযাবে নিক্ষেপ করেন তবে কোন আইনের বলেই তাহাকে জালিম বলা যাইবে না, আর তিনি যদি সকলকে বেহেশত দান করেন তবে তাহাও তাঁহারই

অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু নেককার লোক যেসব নেক কাজ করে; তাহার সওয়াব দেওয়া একমাত্র তাঁহারই ইখতিয়ার।

আলোচ্য হাদীস বর্ণনাকারী ইবনুদ্দায়লামী যেহেতু একজন পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র উল্লেখিত ক্ষমতাকে বিশ্বাস করিতেন, সেই জন্য সংশ্লিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার মনস্তাত্ত্বিক এলাজ করিলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তকদীরে বিশ্বাস করা এতই জরুরী যে, কোন ব্যক্তি এই আকীদা না রাখিয়া পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহ্‌র পথে দান করিলেও তাহা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হইবে না; বরং সে জাহান্নামে যাইতে বাধ্য হইবে।

অবশ্য এই কথা সত্য যে, একমাত্র ঈমানদার লোকেরাই এইরূপ জওয়াব পাইয়া তকদীর সম্পর্কীয় প্রশ্নে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ও সান্তনা লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় প্রভাবান্বিত ও অন্যান্য মতবাদে দীক্ষিত লোকদের মনে এই সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন ও ওয়াসওয়াসা জাগ্রত হয়, তাহার জওয়াব সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়, স্বতন্ত্র যুক্তি ও টেকনিকে দিতে হইবে।

عَنْ اَبِىْ خُزَامَةَ رض عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَءَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوىْ بِهِ وَتُقَاءً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ - (احمد، ترمذى، ابن ماجه)

আবূ খুজামা তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আমরা দুঃখ ও ব্যাথা দূর করার জন্য যে সব ঝাঁড়-ফুঁক ব্যবহার করিয়া থাকি কিংবা যে সব ঔষধ আমরা চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করি অথবা বিপদ হইতে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষামূলক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করি— তাহা কি আল্লাহ্‌র 'কাযা' ও 'কদর'কে বদলাইয়া দিতে পারে ? রাসূল (স) বলিলেন ঃ এই সব জিনিসও আল্লাহ্‌রই তকদীর বিশেষ। — মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যা হাদীসের দুইটি শব্দ (قضاء) 'কাযা' ও (قدر) 'কদর' শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য এইরূপ ঃ কাযা অর্থ— اَلْحُكْمُ الْكُلِّى الْاِجْمَالِىْ فِىْ الْاَزَلِ এমন সামগ্রিক ও মোটামুটি হুকুম যাহা চিরন্তন আদিকাল দেওয়া হইয়াছে আর 'কদর' অর্থ - جُزْئِيَاتُ ذَالِكَ الْحُكْمِ وَتَفَا اصِيْلُهُ (فتح البارى عمدة القارى) সেই হুকুমের খুটিনাটি ও বিস্তারিত রূপ। কাহারো মতে 'কাযা' হইতেছে ঃ যেমন চিত্রশিল্পী কোন চিত্র মনের পটে (কল্পিতভাবে) অংকিত করিল। আর 'কদর' হইতেছে চিত্রাংকন শিক্ষার্থীর সেই অনুযায়ী রং ও তুলি দ্বারা বাস্তবভাবে সেই চিত্রের অংকন করা। ইহাকেই বলা হয় كسب বা অর্জন করা এবং ইহাতে শিল্পীর নিজস্ব ইচ্ছার প্রয়োগ রহিয়াছে। কিন্তু সে অংকন শিক্ষকের মূল কল্পিত রূপের বাহিরে যাইতে পারে না (مرقاة)। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহর জওয়াবের সার কথা এই যে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য আমরা যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ ও চেষ্টা-সাধনা করিয়া থাকি, আর এই ব্যাপারে আমরা যে সব জিনিসপত্র উপায়-উপাদান প্রয়োগ করিয়া থাকি তাহা সবই আল্লাহ্‌র 'কাযা' ও 'কদরের' অধীন। ইহা যেন ঠিক আল্লাহ্‌র তরফ হইতেই নির্দিষ্ট হয় যে, অমুক রোগের আক্রমণ হইবে এবং তাহা দূর

করার জন্য অমুক ধরনের চিকিৎসা কিংবা ঝাঁড়-ফুঁক ব্যবহার করা হইবে এবং তাহার পর সে নিরাময় হইয়া যাইবে অথবা শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।

হযরতের এই দুই শব্দ বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত জওয়াবেই তকদীর সম্পর্কীয় মাসয়ালার বিরাট জটিলতা সহজতর হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্পর্কীয় যাবতীয় সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে।

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعَ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ - مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَءَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى -
(بخارى، مسلم)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই পরিণতির স্থান দোযখে কিংবা বেহেশতে লিখিত ও নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ যে দোযখে যাইবে তাহার জন্য দোযখ আর যে বেহেশতে যাইবে তাহার জন্য বেহেশত পূর্ব হইতেই লিখিত ও নির্দিষ্ট হইয়া আছে)। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাহা হইলে আমরা কি আমাদের অদৃষ্টের লিখনীর উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিব ? এবং চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম কি ত্যাগ করিব ? নবী করীম (স) উত্তরে বলিলেন ঃ না, আমল করিতে থাক। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি সেই কাজেরই সুযোগ পায়, যে জন্য তাহার জন্ম হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, সে সৌভাগ্য ও নেক কাজেরই তওফীক লাভ করিয়া থাকে আর যে ব্যক্তি পাপীদের মধ্যে গণ্য, সে নির্মমতা ও বদ কাজের সুযোগ পাইয়া থাকে। অতঃপর রাসূল নিম্ন অর্থের আয়াত তিলাওয়াত করিলেন— যে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিল ও তাকওয়া অবলম্বন করিয়া এবং সত্য ও ভাল কথাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইল (অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত কবুল করিল) আমরা তাহাকে সুখ-শান্তি ও নিশ্চিন্ততার বেহেশতের জীবন দান করিব। পক্ষান্তরে যে কৃপণতা করিল, অহংকারী ও দুর্বিনীতি হইল এবং সত্য ও ভাল কথা— ঈমানের দাওয়াত— অমান্য করিল, তাহার জন্য আমরা কষ্ট ও কঠিন জীবন— দোযখ-এর দিকে চলা সহক করিয়া দিব। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে বেহেশত-দোযখে যাওয়া না যাওয়া সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলে করীম (স) যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির শেষ পরিণতি বেহেশত কি দোযখ, তাহা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট রহিয়াছে— এই কথা যেমন সত্য, অনুরূপভাবে এই কথাও সত্য যে, ভাল কিংবা মন্দাকাজের সাহায্যে সেই চরম পরিণতি পর্যন্ত পৌছার পথও পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীরে একথাও পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া আছে যে, যে ব্যক্তি বেহেশতে যাইবে, সে অমুক অমুক সৎ ও নেক আমলের পথের অগ্রসর হইবে, আর যে জাহান্নামে যাইবে, সে তাহার অমুক অমুক পাপ

কাজের কারণে ধ্বংস হইবে। নবী করীম (স)-এর জওয়াবেরও সারমর্ম প্রায় তাহাই যাহা পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِىْ الْقَدْرِ فَغَضَبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهٗ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِىءَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَ اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَنَازَعُوْا فِيْهِ - (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন ঃ একবার আমরা (মসজিদে নববীতে বসিয়া) কাযা ও কদর (অদৃষ্ট ও তকদীর) সম্পর্কে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলাম। সহসা নবী করীম (স) ভিতরে প্রবেশ করিলেন (ও আমাদেরকে এই বিতর্কে লিপ্ত দেখিতে পাইলেন)। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত হইলেন। এমন কি তাঁহার পবিত্র চেহারা একেবারে রক্তিম বর্ণ হইয়া গেল।....... এতদূর রক্তিম বর্ণ হইল যে, মনে হইতেছিল তাঁহার মুখের উপর যে কেহ রাঙা আনারের দানা নিংড়াইয়া দিয়াছে। অতঃপর তিনি আমাদের বলিলেন ঃ তোমাদের কি এই কাজেরই আদেশ দেওয়া হইয়াছে ? আমি কি তোমাদের প্রতি এই জন্য প্রেরিত হইয়াছি (যে, তোমরা কাযা ও কদর-এর ন্যায় অত্যন্ত গুরুতর ও জটিলতর বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হইবে)? সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ঠিক তখনই ধ্বংস হইয়াছে যখন তাহারা এই জটিল বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করাকেই নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করিয়া লইয়াছে। আমি তোমাদের বাধ্য করিতেছি যে, তোমরা এই বিষয় কখনো তর্ক ও বিতর্কে লিপ্ত হইবে না। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা তকদীর— তথা 'কাযা' ও 'কদর'-এর মাসয়ালাটি অত্যন্ত জটিল, কঠিন ও নাজুক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই এই মাসয়ালার গূঢ় রহস্য বোধগম্য না হইলে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হইতেছে, এই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র তর্ক-বিতর্ক না করা। বরং তাহাদের উচিত, নিজেদের মন-মগজকে এই দিক দিয়া সম্পূর্ণ আশ্বস্ত ও শান্ত করিয়া লওয়া যে, যেহেতু রাসূলে মকবুল (স) এই বিষয়টিকে এইভাবেই পেশ করিয়াছেন, কাজেই আমরা এইভাবেই উহার প্রতি ঈমান আনিব।

বস্তুত তকদীরের মাসয়ালা আল্লাহ্‌র সিফাতের সহিত সম্পর্কশীল। এই জন্য তাহা অত্যন্ত জটিল ও নাজুক না হইয়া পারে না। আমরা মানুষ, আমাদের নিজদেরই এই দুনিয়ায় বহু কাজ, বহু ব্যাপার ও বহু বিষয়ের গভীর ও নিগূঢ় রহস্যকে আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না। এমতাবস্থায় বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যখন মানুষের ক্ষমতার বাহিরে, তখন উহাকে রাসূল যেরূপ পেশ করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপেই উহাকে গ্রহণ করা ও উহার প্রতি সেইভাবেই ঈমান আনা আমাদের কর্তব্য। এই বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় তর্কে লিপ্ত হওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

তকদীর সম্পর্কে তর্ক করিতে দেখিয়া রাসূল (স)-এর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট রাগান্বিত হওয়ার কারণ সম্ভবত এই হইতে পারে যে, সেই মজলিসে উপস্থিত সাহাবা সকলেই রাসূলের শিক্ষা ও দীক্ষাধীন ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা সরাসরিভাবে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন। কাজেই তাঁহাদেরকে যখন তিনি এই জটিল বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত দেখিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই রাসূল (স) মনে কষ্ট পাইলেন। তাহার ফলে তাঁহার রাগান্বিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পূর্বকালের উন্মতদের ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে যে কথাটি হাদীসে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্ভবত গোমরাহ হইয়া যাওয়া। কুরআন ও হাদীসে 'হালাক' শব্দ প্রায়ই গোমরাহ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে হাদীসের এই বাক্যাংশের অর্থ হইবে ঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে আকীদার গোমরাহী ঠিক তখনই আসিতে শুরু করিয়াছে, যখন তাহারা এই তকদীরের মাসয়ালাকে তর্কের বিষয়বস্তুরূপে গণ্য করিয়া লইয়াছে। রাসূলের এই কথার সত্যতা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেও প্রমাণিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, হাদীসে তকদীর নিয়ে শুধু তর্ক-বিতর্ক করিতেই নিষেধ করা হইয়াছে— আলোচনা করিতে, উহাকে বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে মোটেই নিষেধ করা হয় নাই। রাসূল (স) নিজেও অনেক সময় এই সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া সাহাবাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রিয্ক ও তকদীর

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَىْءٍ يُقَرِّبُكُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِّنَ النَّارِ اِلَّا قَدْ اَمَرْتُكُمْ بِهٖ وَلَيْسَ مِنْ شَىْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِّنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ اِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَاِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِىْ رَوْعِىْ اَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَاعَتِهٖ - (شرح السنة، بيهقى شعب الايمان)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) সাহাবিগণকে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "হে জনগণ! যাহা কিছু তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নামের আগুন হইতে দূরে রাখিতে পারে, তাহার সব বিষয়েই আমি তোমাদেরকে আদেশ দিয়াছি; পক্ষান্তরে যাহা তোমাদেরকে দোযখের নিকটবর্তী ও জান্নাত হইতে দূরে রাখে, তাহা হইতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছি। এই পর্যায়ে হযরত জিবরাইল (আ) আমার কলবে এই কথা জাগাইয়া দিয়াছেন যে, কোন প্রাণীই স্বীয় নির্দিষ্ট পরিমাণ রিয্ক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করিয়া মরিতে পারে না। অতএব সাবধান! আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং ধৈর্যসহকারে স্বীয় রিয্ক তালাশ করিতে

থাক। পূর্ব নির্দিষ্ট পরিমাণ রিয্ক পাইতে যদি একটু বিলম্ব দেখ, তবে তাহা আল্লাহ্র না-ফরমানী করিয়া লাভ করিতে চেষ্টিত হইও না। কেননা এই কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র আয়ত্তাধীন রিয্ক কেবলমাত্র তাঁহার অনুগত ও হুকুম পালনের মাধ্যমেই হাসিল করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে এক সঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রথমত, রাসূলে করীম (স) যে উদ্দেশ্যে ও যে বিরাট দায়িত্বসহ দুনিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। মানুষকে তিনি এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দিয়াছেন, যাহা এই জীবনে গ্রহণ ও অনুসরণ করিয়া তাহারা পরকালে বেহেশতবাসী হইতে পারে ও কঠিন জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা পাইতে পারে। মানুষের পরকালীন মুক্তির এই বিধান কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স)-এর নিকট হইতে লাভ করা গিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, হযরতের কলবে ফেরেশতা কর্তৃক সরাসরিভাবে কোন কথা জাগাইয়া দেওয়াই এক প্রকারের ওহী। আর ওহী যে রকমই হউক না কেন তাহাতে ফেরেশতা প্রকাশ্যভাবে দেখিতে পাওয়া যাক আর না-ই যাক তাহা সবই অকাট্যভাবে বিশ্বাসযোগ্য। এমন কি স্বপ্নযোগেও রাসূল যদি কোন ওহী লাভ করেন, তবে তাহাও অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য। ইহার সকল প্রকার যেমন স্বয়ং রাসূলের জন্য জ্ঞানের উজ্জ্বলতম আলো, তেমনি সকল মুসলিমের জন্য উহার প্রতি ঈমান আনা কর্তব্য।

তৃতীয়ত, হাদীসটিতে প্রাণীকূলের— বিশেষভাবে মানুষের— রিয্ক সম্পর্কে এক দৃঢ়তাব্যক উক্তি করা হইয়াছে। এই কথার দুইটি দিক ঃ একটি এই যে, প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য রিয্ক— উহার পরিমাণ— আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। কাহারো মনে যেন নিজের রিয্ক সম্পর্কে একবিন্দু সন্দেহ জাগ্রত না হয়। দ্বিতীয় দিক এই যে, এই পরিমিত ও পূর্ব নির্ধারিত রিয্ক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করিয়া কাহারো দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। দুর্বল প্রকৃতির মানুষ রিয্ককে মনে করে কেবলমাত্র মানবীয় চেষ্টা-সাধনা ও শ্রমের অধীন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। হাদীস স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, রিয্ক একান্তভাবে তকদীরের অধীন এবং তাহা সংশয়পূর্ণ নয় বরং নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ। তাহা এতদূর সন্দেহাতীত যে, মৃত্যুর মতো এক সর্বাঙ্গীন নিশ্চিত ও সনির্ধারিত ব্যাপারও নির্দিষ্ট পরিমাণ রিয্ক গ্রহণের পূর্বে কখনো ঘটিতে পারে না।

মানুষ মনে করে, কেবলমাত্র শ্রম-সাধনা ও চেষ্টা করিয়াই বুঝি রিয্ক লাভ করা যাইবে এবং যত বেশি শ্রম করা যাইবে ততবেশি পরিমাণে রিয্ক হাসিল করা সম্ভব হইবে। হাদীস বলিতেছে, ইহা মিথ্যা। রিয্ক কেবলমাত্র আল্লাহ্র হুকুম ও বিধান পালন করিয়াই লাভ করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে হাদীসের উক্তি হইল ঃ রিয্ক হইতেছে আল্লাহ্র আয়ত্তাধীন আর তাহাই যখন প্রকৃত ব্যাপার তখন আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া রিয্ক হাসিল করা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে ?

কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম দ্বারা রিয্ক উপার্জন হইতে হাদীসে নিষেধ করা হয় নাই; বরং হারাম উপায়ে রিয্ক উপার্জন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মানুষ

সাধারণত মনে করে সে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি ও লুটতরাজ প্রভৃতি অবৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করা বুঝি দোষের কিছু নয়। হাদীস প্রমাণ করে যে, ইহা মানুষের ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক। বরং মানুষের উচিত হালাল পথে রিয্ক লাভ করার জন্য চেষ্টা করা; পূর্ণ নির্ভরতা, নিঃসংশয় মনে এবং অতীব ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহকারেই তাহা করা উচিত। যাহা তাহার ভাগ্যে পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট, তাহা সে এইভাবেই লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইতে একবিন্দু কম সে পাইবে না। যে কোন উপায়ে রিয্ক উপার্জন করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা কোন বুদ্ধিমানে কাজ নয়। এই দুনিয়ায় মানুষের আসল মর্যাদা ও সৃষ্টি-উদ্দেশ্য হইতেছে খিলাফতের বিরাট ও মহান দায়িত্ব পালন।

عَنْ اَبِىْ مُوْسى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى (مسند احمد، بيهقى)

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের 'প্রিয়তম' ও লক্ষ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিবে, সে তাহার পরকালের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিবে। আর যে পরকালকে 'অধিকতর প্রিয়' রূপে গ্রহণ করিবে, সে অবশ্যই তাহার দুনিয়ার দিক দিয়া বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অতএব নশ্বর জগতের মুকাবিলায় স্থায়ী ও অক্ষয় পরকালকেই গ্রহণ কর। — মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা যে ব্যক্তি দুনিয়াকেই নিজের অধিকতর প্রিয় জিনিসরূপে গ্রহণ করিবে, সে তাহার মনের ঝোঁক-প্রবণতা ও যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা দুনিয়া লাভের জন্যই নিয়োজিত করিবে। পরকালের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা ও সাধনাকেই পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিবে। অন্তত তাহার জন্য খুব কম চেষ্টাই সে করিতে পারিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। ফলে তাহার পরকালের দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অবধারিত।

অনুরূপভাবে পরকালকে যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসিবে, সে সর্বোতভাবে কেবল পরকালীন সুখ-শান্তির জন্যই কাজ করিবে, পরকালীন জীবনকে উজ্জ্বল ও শান্তিপূর্ণ করার জন্যই যত্নবান হইবে। দুনিয়া পূজারীদের ন্যায় কেবল দুনিয়ার জন্য কোন কাজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। ইহার ফল সুস্পষ্টরূপে এই হইবে যে, বৈষয়িকতার দৃষ্টিতে সে অনগ্রসর হইয়া পড়িবে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি আয়েশ-আরাম তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইবে।

আর অবস্থা যখন এইরূপই— দুনিয়া চাহিলে যখন পরকালের শান্তি পাওয়া যায় না আর পরকালের সুখ চাহিলে যখন ইহজীবনের সুখ-শান্তি হইতে হাত ধুইতে হয় এবং উভয় ক্ষেত্রের সুখ-শান্তি যখন সমানভাবে পাওয়ার কোন উপায় নাই— একটিকে গ্রহণ করিলে অপরটিকে যখন ত্যাগ করিতেই হয়, তখন উভয়ের মধ্যে স্থায়ী ও অবিনশ্বর জিনিসের জন্য চেষ্টিত হওয়া— নিয়োগ করা স্বীয় যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও শক্তি— প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই কর্তব্য। আর যাহা ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর, অল্প দিন ও অল্প সময় পরই যাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তাহার জন্য একবিন্দু পরিমাণ শক্তি-সামর্থ্য ও চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই কাজ হইতে পারে না। অতএব নিছক এই নশ্বর দুনিয়ার সুখ-শান্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টিত না হইয়া মুখ্যত পরকালের সুখ-শান্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করাই প্রত্যেক ঈমানদার লোকের কর্তব্য।

আল্লাহ্‌র সম্পর্কহীন দুনিয়ার অভিশাপ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ - (ترمذى، ابن ماجه)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সাবধান, দুনিয়া ও দুনিয়ার বুকে যাহা কিছু আছে তাহার সব কিছুরই উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ— বঞ্চিত আল্লাহ্‌র রহমত হইতে কিন্তু আল্লাহ্‌র স্মরণ ও আল্লাহ্‌র সহিত যে সব জিনিসের কোন না কোন সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা এই পর্যায়ে নয়; আলিম ও দ্বীনী ইলম শিক্ষার্থীও তাহা হইতে মুক্ত। — তিরমিযী, ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যা এই দুনিয়া সাধারণত মানুষকে আল্লাহ হইতে গাফিল করিয়া দেয়, মানুষ দুনিয়ার লোভ-লালসার পংকিল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলে। এই সময় আল্লাহ্‌র কথা, আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা মানুষ ভুলিয়া যায়। ইহার ফলে মানুষ এবং সেই সঙ্গে যে সব জিনিস লইয়া মানুষের কারবার সবকিছু আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। ইহাই দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের অবস্থা। কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্যাপারের দৃষ্টিতে চরম মূর্খতা সন্দেহ নাই; তবে যাহারা দুনিয়ায় বসবাস করিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ আঞ্জাম দিয়াও আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যায় না, আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখিয়া আল্লাহ্‌র দাসত্ব করিয়া আল্লাহ আইন ও বিধান মুতাবিক যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে— মানবীয় দায়িত্ব পালন করে, তাহাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। বিশেষত দ্বীন-ইসলামের উজ্জ্বল জ্ঞান যাহারা লাভ করিয়াছে এবং যাহারা এই শিক্ষা লাভে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহাদের প্রতিও আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হইতে থাকে। কেননা তাহারা কোন মুহূর্তেই আল্লাহকে ভুলিয়া যায় না। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا - (فاطر - ٢٨)

নিশ্চয়ই আল্লাহকে কেবলমাত্র তাহারাই ভয় করে, যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কিত দ্বীনী ইলম জানে।

মোটকথা, এই দুনিয়ার যে সব কাজ— যে সব জিনিস কোন না কোন রূপে আল্লাহ্‌র সহিত আল্লাহ্‌র দ্বীনের সহিত সংশ্লিষ্ট, কেবল তাহাই আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু যে সব কাজ ও জিনিস আল্লাহ্‌র দ্বীনের সহিত সম্পর্কশীল নয়, তদনুরূপও নয়— আর ইহাকেই বলা হয় দুনিয়া— তাহা সবই আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত ও অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য। মানুষের জীবন সম্পর্কেও এই কথাই সত্য। এই দুইটি হাদীস একত্রিত করিলে প্রকৃত ব্যাপার সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

দুনিয়া পূজারী গুনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ مِنْ اَحَدٍ يَمْشِىْ عَلَى الْمَاءِ الا

ابْتَلَتْ قَدَمَاهُ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ كَذَالِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَايَسْلَمُ مِنَ الذُّنُوْبِ - (بيهقى)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) একদা সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'এমন কেহ আছে কি, যে পানির উপর দিয়া চলে অথচ তাহার পদদ্বয় উহাতে ভিজিয়া যায় না ?' সাহাবাগণ বলিলেন, 'না, হে রাসূল এমন কেহই হইতে পারে না।' অতঃপর রাসূলে করীম (স) বলিলেন ঃ 'দুনিয়াদার লোকেরাও ঠিক এইরূপই গুনাহ হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।'

ব্যাখ্যা দুনিয়া পূজারী বা দুনিয়াদার বলিতে বুঝায় সেই ব্যক্তিকে, যে এই দুনিয়া লাভ করাকেই নিজ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ মানুষ বাস্তবিকই গুনাহ হইতে— আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইতে কখনই বাঁচিতে পারে না। কেননা গুনাহ হইতে বাঁচা তাহার পক্ষে তখনই সম্ভব হইতে পারে, যদি সে বাস্তবিকই আল্লাহকে ভয় করে— অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় রাখিয়া তাঁহার বিধান অনুযায়ী কাজ করে। আর ইহা যে ব্যক্তি করিবে, সে কখনও দুনিয়া অর্জন করাকে নিজে একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।

কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালীন নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তিই হইবে যাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সে যেহেতু দুনিয়া ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া যাইবে না— আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাঁহারই দ্বীনের ভিত্তিতেই সে দুনিয়ার কাজ করিবে, সেই জন্য সে কখনই 'দুনিয়াদার' হইবে না। বাহ্যত দুনিয়ায় বসবাসকারী হইয়াও এবং দুনিয়ার কাজে লিপ্ত থাকিয়াও সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী গুনাহ হইতে দূরেই থাকিবে। বস্তুত ঈমানদার লোকের ইহাই কর্মনীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার জীবনধারাকে এমনিভাবে বাস্তবায়িত করিয়া গিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরামও ছিলেন এইরূপ জীবন পদ্ধতির বাস্তব প্রতীক। কাজেই তাঁহারাই দুনিয়ার মুসলমানদের আদর্শস্থানীয় লোক।

عَنْ مُسْتَوْرِدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الدُّنْيَا فِىْ الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اُصْبُعَهُ هٰذِهٖ وَاَشَارَ يَحْيٰى بِالسَّبَّابَةِ فِىْ الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ (مسلم)

হযরত মুস্তাওরিদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র শপথ, পরকালের তুলনায় দুনিয়া শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কেহ যদি তাহার এই অঙ্গুলি (হাদীসের এক বর্ণনাকারী উহার অর্থ বুঝাইতে গিয়া অনামিকা অঙ্গুলির দিকে ইশারা করিলেন অর্থাৎ কেহ যদি তাহার অনামিকা অঙ্গুলি) সমুদ্রে ডুবাইয়া বাহির করিয়া আনে, অতঃপর সে দেখিবে যে, সেই অঙ্গুলি কতটুকু লইয়া ফিরিয়াছে।
—মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটির মূল লক্ষ্য হইতেছে পরকালের তুলনায় দুনিয়ার সংক্ষিপ্ততা ও ভোগ-সম্ভোগ সামগ্রীর স্বল্পতা এবং পরকালে দীর্ঘস্থায়িত্ব ও উহার নেয়ামত আস্বাদনের অফুরন্ততা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে দুনিয়া ও পরকালের পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ সমুদ্রের পানিতে একটি অঙ্গুলি ডুবাইয়া উঠাইয়া নিলে তাহাতে যতটুকু পানি লাগিয়া থাকে, তাহার পরিমাণ সমুদ্রের অতলস্পর্শ পানির তুলনা অতি কম ও একেবারে সামান্য বরং সত্য কথা এই যে, পরিমাণের দিক দিয়া এই দুয়ের মাঝ কোন তুলনাই চলে না। পরকাল অপেক্ষা এই দুনিয়া, দুনিয়ার জীবন, আয়ু ও দ্রব্য-সামগ্রীর স্বল্পতাও ঠিক ততখানি সামান্য ও নগণ্য।

নবী করীম (স)-এর উপস্থাপিত এই দৃষ্টান্ত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। সমুদ্র পানিতে একটি অঙ্গুলি ডুবাইলে উহাতে কিছু পরিমাণ পানি অবশ্যই লাগিয়া যায়। সেই পানির একটি আয়তনও অবশ্য থাকে। উহার স্বাদ ও ব্যবহারিক মূল্য যে অতি সামান্য ও নগণ্য তাহাও সুস্পষ্ট। অনুরূপভাবে দুনিয়ারও একটি আয়তন রহিয়াছে, আছে ইহার নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল, আছে অসংখ্য নেয়ামত এবং উহার স্বাদ ও আস্বাদনের সুযোগ। কিন্তু এই সবই অত্যন্ত সামান্য, পরিমাণে স্বল্প, আস্বাদনের সুযোগ সীমাবদ্ধ এবং উহার ব্যবহারিক মূল্য একেবারে নগণ্য। পক্ষান্তরে সমুদ্রে ডুবানো অঙ্গুলির সহিত জড়িত পানির তুলনায় সমুদ্র কত গভীর, উহার আয়তন কত বিরাট, উহার স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ এবং উহার ব্যবহারিক মূল্য কত অসীম। পরকালের জীবনও ঠিক অনুরূপভাবে সীমা সমাপ্তিহীন, আয়তন ও নিয়ামত আস্বাদনের সুযোগ অনন্ত ও অফুরন্ত।

বস্তুত এই দুনিয়া ও দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস অতি সাধারণ, অতি সামান্য, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরকাল অসীম ও অনন্ত। আর অসীমের সহিত সসীমের ও অনন্তের সহিত

অন্তের কোন তুলনাই চলে না। কাজেই দুনিয়াকে কোন দিক দিয়াই পরকালের সহিত, দুনিয়ার জীবনকে পরকালীন জীবনের সহিত কোন তুলনা করা একেবারেই অবান্তর। এখানে রাসূলে করীম (স) যে দৃষ্টান্তটির অবতারণা করিয়াছে তাহা শুধু প্রকৃত ব্যাপারটি বুঝাইবার জন্য মাত্র।

প্রকৃত অবস্থা যখন এইরূপ তখন পরকালকে ভুলিয়া যাহারা দুনিয়ার পশ্চাতে অন্ধভাবে ছুটিতে থাকে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে একবিন্দু চিন্ত করে না— সম্পূর্ণ বে-পরোয়া হইয়া চলে, তাহাদের মতো নির্বোধ ও অপরিণামদর্শী আর কেহই হইতে পারে না।

ঈমানদার ও কাফিরদের দৃষ্টিতে দুনিয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ لِلْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ দুনিয়া মুমিন লোকদের জন্য কয়েদখানা আর কাফির লোকদের জন্য স্বর্গ। — মুসলিম

ব্যাখ্যা জেলখানার জীবনের বড় পরিচয় এই যে, সেখানে কয়েদী বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা পাইতে পারে না, বরং প্রত্যেকটি মুহূর্ত ও প্রত্যেকটি কাজেই সেখানে পরের হুকুম মানিয়া চলিতে হয়। যখন খাইতে দেওয়া হয়, তখনই খাইতে পায়; যাহা কিছু দেওয়া হয়, তাহাই খাইতে বাধ্য হইতে হয়; যাহা পান করিতে দেওয়া হয় তাহা পান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, যখন যে কাজ করিতে দেওয়া হয়, কয়েদীকে ঠিক তাহাই করিতে হয়, উহার বিপরীত কিছু করার তাহার কোন স্বাধীনতাই থাকে না। মোটকথা, কয়েদখানায় কোন বন্দীই নিজ ইচ্ছা ও বাসনা-কামনা অনুসারে কোন কাজই করিতে পারে না। বরং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, প্রত্যেকটি কাজ করিতে হয় পরের হুকুম মতো।

কয়েদখানার আর একটি দিক এই যে, কোন বন্দীই জেলখানাকে মন দিয়া ভালবাসে না। যত দীর্ঘদিনই সেখানে থাকিতে বাধ্য হউক না কেন, উহার সহিত তাহার মনের কোন সম্পর্কই স্থাপিত হয় না, উহাকে কেহ নিজের ঘর-বাড়ি মনে করে না। বরং প্রতিটি মুহূর্ত জেলখানার বাহিরে যাওয়ার জন্য তাহার মন উন্মুখ হইয়া থাকে। ঈমানদার লোকদের জন্য এই দুনিয়াও ঠিক অনুরূপভাবে একটি জেলখানা, এখানে তাহারা বন্দীদশায় দিন কাটাইতে থাকে।

কিন্তু বেহেশতের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে কাহারও কোন বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হইতে হইবে না, প্রত্যেকেই সেখানে নিজ ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারিবে। প্রত্যেকেরই মনোবাঞ্ছা সেখানে পূর্ণ হইবে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ - (حم السجدة ٣١)

তোমাদের জন্য বেহেশতে তাহাই হইবে, যাহা তোমাদের মন পাইতে ইচ্ছা করিবে এবং সেখানে তাহাই লাভ করিতে পারিবে যাহা তোমরা পাইতে চাহিবে।

এমনকি লক্ষ্য অর্জিত হইয়া যাওয়ার পরেও উহা হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা কাহারো মনে জাগ্রত হইবে না। উহার অপরিমেয় নেয়ামতে কাহারো অরুচি ধরিবে না। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

فِيْهَا مَاتَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ - (زخرف : ٧١)

বেহেশতে তোমরা তাহা সবই পাইবে, যাহা তোমাদের মন চাহিবে, যাহা দর্শনে তোমাদের চক্ষু তৃপ্ত ও আনন্দিত হইবে। আর তোমরা সেখানে চিরদিন বসবাস করিবে।

সূরা কাহাফে বলা হইয়াছে ঃ

لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا - (الكهف -١٠٩)

বেহেশতবাসী বেহেশত হইতে অন্য কোথায়ও যাইতে চাহিবে না।

বস্তুত আলোচ্য হাদীসে ঈমানদার লোকদের জন্য জীবন যাপনের এক সুস্পষ্ট ধারার উল্লেখ করা হইয়াছে। দুনিয়ায় তাহাদের জীবন কাফিরদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও অবাধ অনিয়মতান্ত্রিক হইবে না; বরং তাহারা নিয়মানুবর্তী ও আদর্শবাদী জীবন যাপন করিবে— ইহাই তাহাদের কর্তব্য। দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি মনের কোন গভীর সম্পর্কও তাহারা স্থাপন করিবে না। এবং সব সময়ই এই সত্য সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিবে যে, এই দুনিয়াকে বেহেশতের ন্যায় অবাধ উন্মুক্ত মনে করা, ইহার সহিত মনের সম্পর্ক স্থাপন করা, ইহার স্থূল আনন্দ ও স্ফূর্তিকে নিজ জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ কুফরী নীতি। প্রকৃতপক্ষে এই হাদীস ঈমানদার লোকদের জন্য একটি দর্পনের ন্যায়, ইহাতে তাহারা প্রত্যেককে নিজ নিজ চরিত্র ও মনের প্রকৃত রূপ দেখিয়া লইতে পারে। তাই দুনিয়ার প্রতি তাহার মনের ভাব যদি ঠিক সেইরূপ হয়, যাহা হয় কয়েদখানার সহিত কয়েদীর তবে সে ঈমানদার লোক সন্দেহ নাই। আর এই দুনিয়াকেই যদি 'স্বর্গ' মনে করে, লক্ষ্য ও বাঞ্ছিত মনে করে, তবে তাহার মনে কুফরী ভাবধারা বিরাজমান আছে বলিয়া মনে করা যায়।

পরকালের চিন্তা

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَأَطَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جُبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَا للّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجَارُوْنَ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْذَرٍّ يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ - (مسند احمد، ترمذى، ابن ماجاه)

হযরত আবূযর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছে যে, রাসূল করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি আদৃশ্য জগতের এমন সব বিষয় দেখিতে পাই, যাহা তোমরা দেখিত পাও না, এমন সব আওয়াজ শুনিতে পাই যাহা তোমরা শুনিতে পাও না। আকাশ মণ্ডল 'চড়চড়' করিতেছে, আর 'চড়চড়' করাই স্বাভাবিক। আমি সেই মহান আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, আকাশ মণ্ডলে এমন চার আঙ্গুল

প্রশস্ত স্থানও নাই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মস্তক রাখিয়া সিজদায় পড়িয়া নাই। আমি যে সব বিষয় জানি তোমরাও যদি তাহা জানিতে, তবে তোমরা খুব কমই হাস্যরস করিতে পারিতে; বরং খুব বেশি করিয়া কান্নাকাটি করিতে এবং সুখ-শয্যায় স্ত্রীদের সহিত মিলন-স্বাদও গ্রহণ করিতে পারিতে না। অধিকন্তু তোমরা আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ ও আর্ত-চীৎকার করিতে করিতে জঙ্গল বা ঊষর মরুভূমির দিকে বাহির হইয়া পড়িতে— হাদীস বর্ণনাকারী আবূযর অতঃপর বলেন, হায়! আমি যদি এমন একটি গাছ হইতাম যাহা কাটিয়া ফেলা হইত।

— মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে পরকাল ও অদৃশ্য জগত সম্পর্কে এক ভয়াবহ ইঙ্গিত ও চিত্ত আলোড়নকারী এক ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহা এই পর্যায়ের হাদীসের মধ্যে এক উন্নত ধরনের হাদীস। হাদীসের শুরুতে রাসূলের প্রকৃত মর্যাদা ও স্থান (position) বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, রাসূল যাহা দেখেন, সাধারণ মানুষ তাহা দেখিতে পায় না এবং রাসূল যাহা শুনিতে পান, সাধারণ মানুষের কর্ণকুহরে সে ধ্বণি পৌঁছায় না। ইহা হইতে রাসূল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িতেছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান অর্জনের যে সাধারণ উপায়-উপকরণ দান করিয়াছেন, উহার সীমা ও পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাহা এই বস্তুজগত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। গায়বী জগত সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভেরই উপায় তাহাদের করায়ত্ত নয়। এই কারণে অদৃশ্য জগত সম্পর্কীয় জরুরী জ্ঞান ও তথ্য লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে রাসূলের উপর অবতীর্ণ ও তাঁহার বর্ণিত এতদসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের প্রতি ঈমান গ্রহণ। কাজেই আলোচ্য হাদীস হইতে পরকাল ও অদৃশ্য জগত সম্পর্কে যে প্রকম্পনকারী ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া ঐকান্তিক মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিত চেষ্টা করাই কর্তব্য।

হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রতাপ ও দাপট এবং ফেরেশতাদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে আকাশ - মন্ডল চড়চড় করিতেছে, আর আকাশ মন্ডলে চার আংগুল জায়গাও এমন নাই, যেখানে ফেরেশতাগণ মস্তক অবনত করিয়া সিজদায় পড়িয়া নাই। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য যে কি, কি ইহার সঠিক রূপ ও ধরন, তাহা আয়ত্ত করা মানুষের সাধ্যাতীত। তবে যতটুকু বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহা অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিয়া লওয়াই ঈমানদার লোকের কর্তব্য।

পরকালের দিকে ইঙ্গিত করিয়া রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ আমি যাহা জানি তাহা সব তোমরা জানিতে পারিলে তোমরা কম হাসিতে ও কাঁদিতে অনেক বেশি। বস্তুত হাসি ও কান্না আপেক্ষিক। আনন্দের জিনিস দেখিলে বা জানিলে মানুষ হাসিয়া উঠে আর দুঃখ ও বিপদের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে কিংবা জানিতে পারিলে মানুষ কাঁদিয়া উঠে। ইহা মানুষের চিরন্তন স্বভাব। আর পরকালের ভয়াবহ রূপ যেহেতু মানুষের চোখের আড়ালে এবং সে সম্পর্কে সরাসরি জানিবার কোন উপায় নাই, তাই আজ মানুষ সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিলতিতে পড়িয়া আছে। আর এই জন্যই মানুষ আজ হাসি-আনন্দ ও নানাবিধ স্বাদ আস্বাদনে মশগুল হইয়া আছে। কিন্তু পরকালের এই অন্তরাল যদি দীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়,— যেমন রাসূলের নিকট ইহা দীর্ণ হইয়াছে— তাহা হইলে মানুষের এই হাসি-আনন্দ নিমেষে বাতাস প্রদীপের মতো নিভিয়া ও মিলিয়া যাইত। তখন সেই ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে মানুষ থরথর করিয়া কাঁপিত, নিজের পরিণাম চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িত ও দিনরাত চীৎকার করিয়া কান্নাকাটি করিতে বাধ্য হইত এবং কোন প্রকার আনন্দ উৎসব ও স্বাদ আস্বাদনে লিপ্ত হইতে পারিত না।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূযর (রা) পরকালের চিন্তায় এতদূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেনঃ হায়! আমি মানুষ হইয়া জন্মিলাম কেন, আমি যদি একটি গাছ হইতাম তাহা হইলে আমার পক্ষে পরকালের কোন চিন্তা ছিল না, উহাকে কাটিয়া ফেলা হইত, আল্লাহ্র নিকট হিসাব নিকাশ ও শাস্তি পুরস্কারের ভয়াবহ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যাইতাম।

পরকাল ও অদৃশ্য জগতের এই ভয়াবহ অবস্থা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ অন্তরালে রাখা হইয়াছে এই জন্য যে, তাহাদের উপর যে খিলাফতের মহান দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে ও রাসূল বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এই জীবন পরিচালনা করা যে তাহাদের কর্তব্য, ইহা তখন সম্ভব হইত না। মানুষ পরকালের আসন্ন বিপদ ভয়ে অস্থির হইয়া ঘর-বাড়ি পরিবার-সমাজ সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে চলিয়া যাইত। আর তাহা হইলে এই নিখিল সৃষ্টি ও মানুষের জন্ম ও জীবন অর্থহীন হইয়া পড়িত।

কিন্তু আল্লাহ যেহেতু মানুষকে পরকাল সম্পর্কে গাফিল করিয়াও রাখিতে পারেন না, এই কারণে রাসূলের মারফতে মানুষকে সেই সম্পর্কে আভাষ দান করিয়াছেন, যেন মানুষ আল্লাহ্র অর্পিত দায়িত্বসমূহ পুরাপুরি পালন করিয়া পরকালের কঠিন আযাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

পরকালের জন্য প্রস্তুতি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ رَجُلٌ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَاَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُولٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرْفِ الدُّنْيَا - وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ -

(طبرالى، معجم الصغير)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি বলিল ঃ লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে ? উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেন ঃ লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং উহার জন্য যে সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাহারাই হইতেছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক যাহারা দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করিতে পারে।

—তাবরানী, মুজিমুস সগীর

ব্যাখ্যা প্রকৃত বুদ্ধিমান কে, আলোচ্য হাদীসে তাহারই জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। দুনিয়ার সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষ বুদ্ধিমান তাহাকেই বলে যে ছলে-বলে-কৌশলে নিজেকে বড় ধনী ও অধিকতর সুখী করিয়া লইতে পারে। আর যে ব্যক্তি সাদাসিদা জীবন যাপন করে, কোন প্রকার শঠতা ও পরস্বাপহরণের আশ্রয় লয় না এবং এই কারণেই ধন-দৌলত সংগ্রহ কিংবা নিজেকে অপেক্ষাকৃত সুখী করিয়া তোলা সম্ভব হয় না— তাহাকে লোকেরা নির্বোধ ও সোজা বান্দা মনে করিয়া অনুকম্পার যোগ্য বলিয়া মনে করে।

রাসূলে করীম (স)-এর আলোচ্য বাণী হইতে ইহার বিপরীত কথাই জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন ঃ যে লোক অধিক মাত্রায় মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তীকালের নিরাপত্তার

জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। বস্তুত যে কৃষক রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া জমি তৈয়ার করে ও বীজ বুনায়, পরবর্তীকালে সেই জমির বুকে সোনার ফসল ফলাইতে ও তাহা কাটিয়া আনিয়া ঘরে বোঝায় দিতে পারে, পারে পরবর্তী দিনগুলো সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতে। কিন্তু যে কৃষক এই পরিশ্রম করিতে রাজি হয় না, পারে না কিছুদিন পরে ফসল লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে, তাহার পক্ষে প্রথমোক্ত কৃষকের মত সুখ লাভ করা সম্ভব হইতে পারে না। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমোক্ত কৃষকই বুদ্ধিমান আর দ্বিতীয় কৃষক একান্তই নির্বোধ।

অনুরূপভাবে যে লোক দুনিয়ার আনন্দ স্ফূর্তিতে মাতিয়া যায় ও পরকাল সম্পর্কে একেবারেই গাফিল হইয়া পড়ে, সে কখনো স্থায়ী সুখের অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু যে লোক এই দুনিয়ার কষ্ট স্বীকার করে ও মৃত্যুর পরবর্তীকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, পরকালের স্থায়ী সুখ তাহার ভাগ্যেই জুটিতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন এক দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিকতা। মৃত্যু ইহার এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করে মাত্র, কিন্তু জীবনকে— জীবনের ধারাবাহিকতা ও দায়িত্বকে চিরতরে শেষ করিয়া দেয় না। পরন্তু মৃত্যুর পূর্ববর্তী জীবন সীমাবদ্ধ, ইহার পরবর্তী স্তর অনন্ত— অসীম। অসীমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সসীম সময়ে কষ্ট স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। পক্ষান্তরে সসীম সময়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অসীমের দুঃখ ও কষ্ট আহরণ করা কখনো কোন বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে না। আলোচ্য হাদীসে এই কথা অতি সুন্দরভাবে ও অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

পরকালের জওয়াবদিহি

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْدَهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ - (ترمذى)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়িতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হইবে ঃ নিজের জীবনকাল সে কোন্ কাজে অতিবাহিত করিয়াছে, যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করিয়াছে, ধন-সম্পদ কোথা হইতে উপার্জন করিয়াছে, কোথায় তাহা খরচ করিয়াছে এবং যে জ্ঞান সে লাভ করিয়াছে, তদনুযায়ী কতদূর কাজ (আমল) করিয়াছে?

ব্যাখ্যা মানুষের এই জীবনকাল একটি কঠিন পরীক্ষা বা প্রস্তুতির সময়। এখানে আল্লাহ মানুষকে যত কিছু নেয়ামত— অমূল্য দ্রব্য-সম্পদ দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে হাদীসে উল্লিখিত পাঁচটি জিনিস মৌলিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাহা হইতেছে মানুষের জীবন, যৌবন-কাল, ধন-সম্পদ উপার্জন করার সুযোগ ও ব্যবহার করার ক্ষমতা এবং জ্ঞান ও বিদ্যা ।

মানুষ না চাহিয়াই এই জীবন লাভ করিয়াছে বিধায় এই জীবনের মূল্য সে কিছুমাত্র অনুধাবন করে না, হাসিয়া খেলিয়া এই অমূল্য জীবন অতিবাহিত করে। জীবনের দীর্ঘ কালের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে তাহার যৌবনকাল। জীবনের যাহা কিছু স্বাদ-আনন্দ, চাঞ্চল্য, তাহা সবই এই সময়ই হইয়া থাকে। এই সময় মানুষ ভাল করিতেও পারে আর মন্দ করাও সম্ভব। কিন্তু যুবকরাই হয় সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল-বল্লাহারা। এই অমূল্য যৌবন শক্তিকে তাহারা ভাসাইয়া দেয় গড্ডালিকা প্রবাহে। শেষে এমন একদিন আসে, যখন যৌবন শেষ হইয়া যায়, ফুরাইয়া যায় জীবনের যাবতীয় সঞ্চয়— তখন সে কাঁদিয়াও বিগত যৌবন ফিরাইয়া পাইতে পারে না।

ধন-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ব্যাপারেও ঠিক অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। মানুষ অর্থ লোলুপতায় অন্ধ হইয়া যায়, ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়াই ধন লুটিতে থাকে— লালসার বহ্নিতে সেই জাতীয় ধন-সম্পদকে ইন্ধনের ন্যায় জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়। জ্ঞান ও বিদ্যার্জন সম্পর্কেও মানুষ দায়িত্ব কম অনুভাব করে। মনে করে না যে, এই সবকয়টি সম্পর্কে একদিন ইহার প্রকৃত দাতার— আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করিতে হইবে। সেই অনুভূতি থাকিলে মানুষ এই অমূল্য সম্পদ ও শক্তির এইরূপ অপচয় করিতে পারিত না। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট ইহার প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই যে জওয়াবদিহি করিতে হইবে, পুংখানুপুংখরূপে হিসাব দিতে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِىْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رض يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ - (بخارى، رياض الصالحين)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা হযরত নবী করীম (স) আমার স্কন্ধদ্বয়ে হাত দিয়া বলিয়াছেন ঃ তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে বসবাস কর, যেন তুমি একজন পথিক— দূরের যাত্রী। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) ইবনে উমর (রা) প্রায়ই বলিতেনঃ যখন সন্ধ্যা হইবে, তখন সকালের অপেক্ষা করিও না, আবার যখন সকাল হইবে, তখন সন্ধার অপেক্ষা করিও না। সুস্থ অবস্থাকে রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য (নেক ও পূর্ণ কাজের পাথেয় হিসাবে) গ্রহণ কর এবং জীবন থাকা অবস্থায় মৃত্যুর পরবর্তীকালের জন্য (আমলের মূলধন) সংগহ করিয়া লও। — বুখারী, রিয়াযুস সালেহীন

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِىِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرَضِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيٰوتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ - (ترمذى)

আমর ইবনে মাইমুন (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন কর। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনের, রোগের পূর্বে স্বাস্থ্যের, দারিদ্রের পূর্বে সচ্ছলতার, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকালের এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনের। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা হাদীস দুইটির মূল বক্তব্য প্রণিদানযোগ্য। প্রথমোক্ত হাদীসে ঈমানদার ব্যক্তির আর্থিক জীবন যাপনের ধারা ও দৃষ্টি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, দুনিয়ায় একজন পথিকের— দূরের যাত্রীর— ন্যায় জীবন যাপন কর। বস্তুত পথিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্থায়ী বাসিন্দার দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হইয়া থাকে। একজন স্থায়ী বাসিন্দা প্রত্যেকটি বৈষয়িক কাজকে এমনভাবে সম্পন্ন করে, যেন সে এখানে চিরদিন থাকিবে— অক্ষয়, অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। সেইজন্য সে তাহার প্রকৃত গন্তব্যস্থল— পরকাল— এর জন্য কিছুই করিতে পারে না, সেই দিকে তাহার মন ও লক্ষ্য আরোপ করে না। ফলে এই নশ্বর দুনিয়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাজ করিয়াও আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে শুষ্ক ফলের মত ঝরিয়া পড়ে। ফলে সে হয় অত্যন্ত অসহায়। কেননা সেখানকার সুখ-সুবিধার জন্য সে কিছুই করে নাই। পক্ষান্তরে একজন দূর পথের যাত্রী কোথায়ও স্থায়ী হইয়া থাকে না, মঞ্জিলে মঞ্জিলে সাময়িকভাবে তাহাকে আসন গাড়িতে হইলেও সেখানে শিকড় মজবুত করিয়া চিরস্থায়ীভাবে থাকার বন্দোবস্তের জন্য সে কোন চেষ্টা করে না। একজন ঈমানদার ও একজন পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য অনিবার্যরূপে দেখা যায়। পরকালে অবিশ্বাসী কাফির ব্যক্তি তাহার সকল শক্তি কর্মক্ষমতা ও মনের ঝোঁক-প্রবণতাকে নিয়োজিত করে পার্থিব সুখ-সুবিধা বিধানের উপর, পরকালের উন্নতির দিকে তাহার একটুও লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু একজন ঈমানদার ব্যক্তি বৈষয়িক সুখ সুবিধা যতদূর হউক, আর না-ই হউক তাহার আসল লক্ষ্য দৃষ্টি ও ঝোঁক-প্রবণতা থাকে পরকালে প্রতি।

মনের রাখিতে হইবে যে, এখানে ইহজীবনকে ভুলিয়া গিয়া বৈরাগ্যবাদ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আসল ব্যাপার হইতেছে শুধু তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ ও প্রাধান্য দান করা। ঈমানদার ব্যক্তি পরকালকে অধিকতর গুরুত্ব দান করে, কাফির ব্যক্তি তাহা করে না। বরং তাহার নিকট দুনিয়াই হয় একমাত্র গুরত্বপূর্ণ স্থান। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই সে সমগ্র জীবনের কর্মসূচী রচনা ও কার্যধারা পরিচালনা করিয়া থাকে।

এইজন্য বর্তমানের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে যথাযথ গুরুত্ব দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানের কোন কাজকেই ভবিষ্যতের আশায় অবহেলা করা কোন বুদ্ধিমানেরই কাজ হইতে পারে না। অন্তত যে কোন মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে, এইটুকু কথাও যাহারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে, তাহারাও তাহা করিতে পারে না। কেননা এই মুহূর্তটির কাজ যদি এখনই সম্পন্ন না করি তবে এক নিমিষ পরে যদি আমার মৃত্যু ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে সেই কাজ চিরজীবনের তরে অকৃতই থাকিয়া যাইবে। উপরিউক্ত দ্বিতীয় হাদীসটি এই কথাই আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেয়।

পরকালের নিদর্শন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَ

اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ

مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتّٰى اِذَا قَضٰى حَدِيْثَهٗ قَالَ اَيْنَ أُرَهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِذَا أُضِعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ - (بخارى، كتاب العلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, এমন এক সময়, যখন নবী করীম (স) এক মজলিসে বসিয়া লোকজনের সাথে কথা বলিতেছিলেন, একজন বেদুইন ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল ঃ কিয়ামত কবে হইবে ?

কিন্তু নবী করীম (স) কোন জওয়াব না দিয়া তাঁহার কথা বলিয়াই যাইতেছিলেন। তখন লোকদের মধ্য হইতে কেহ বলিল ঃ নবী করীম (স) কথাটি শুনিতে পাইয়াছেন বটে, কিন্তু কথাটি তিনি পছন্দ করেন নাই। আর কেহ বলিল ঃ নবী করীম (স) মোটেই শুনিতে পান নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন তাঁহার কথা সম্পূর্ণ করিলেন তখন বলিলেন ঃ কোথায় ? .... হযরত আবূ হুরায়রা হইতে হাদীসটির বর্ণনাকারী বলেন যে, সম্ভবত কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি সম্পর্কেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বেদুইন বলিলঃ এই যে, আমিই জিজ্ঞাসাকারী, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নবী করীম (স) বলিলেন ঃ যখন আমানত বিনষ্ট করা হইবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করিল ঃ আমানত বিনষ্ট হওয়ার অর্থ কি ? নবী করীম (স) বলিলেন ঃ দায়িত্বের ব্যাপার যখন উহার অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হইবে, তখনই কিয়ামতের অপেক্ষা কর। — বুখারী

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে কিয়ামতের অনিবার্যতা এবং উহার নিদর্শন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দৃঢ়তা সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। একজন বেদুইন মুসলমান দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তাহার এই আগমন ছিল একান্ত জ্ঞান লাভের জন্য। এই কারণে ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য হাদীসটিকে কিতাবুল ইলম-এর শুরুতেই সংযোজিত করিয়াছেন। দ্বীন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য, এইজন্য তাহাকে সুদূর দেশে যাত্রা করিতে হইলেও তাহা করাই বাঞ্ছনীয়। ইসলামের প্রথম পর্যায়ে নবদীক্ষিত মুসলিমদের মনে যে ইসলাম সম্পর্কিত জরুরী জ্ঞানের জন্য প্রবল উৎসাহ ও উদ্যোগ ছিল, তাহা আলোচ্য হাদীস হইতে প্রমাণিত হইতেছে। অপরদিকে নবী করীম (স) অবসর সময় অনুসারী লোকদের সম্মুখে ইসলামের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা পেশ করিতেন। সাহাবিগণ তাঁহার নিকট হইতেই সব কিছু জানিয়া লইতেন, কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইলে তাহাও তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দূর করিতেন, হাদীস হইতে এই কথাও স্পষ্টভাবে জানা যায়।

বেদুইন ব্যক্তির জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূল করীম (স) উহার জওয়াব দেন নাই, তিনি তাঁহার কথার পূর্ব ধারাকে বজায় রাখিয়াছেন এবং তাহা শেষ হওয়ার পরই তিনি নতুন প্রশ্নকারীর দিকে লক্ষ্য দিয়াছেন। ইহা হইতে ইসলামের মজলিসী আদব-কায়দা ও রীতি-নীতি নিঃসন্দেহে জানা যায়। প্রথমত ঃ কেহ কোন কথা বলার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকিলে তাহার মাঝখানে অপর কাহারো কোন কথা বলা উচিত নয়। ইহাতে বক্তার কথার ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত হয়, কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এইভাবে কোন মজলিস চলিলে সেখানে একজনের

কথার মাঝখানেই অপর একজন কথা বলিয়া উঠে, একজনের কথা শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য একজন কথা শুরু করিয়া দেয়— উহাকে আর যাহাই হউক সভ্য লোকদের মজলিস মনে করা যাইতে পারে না। ঠিক এই কারণেই নবী করীম (স) বেদুইন প্রশ্নকারীর প্রশ্নে জওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই দান না করিয়া এই শিক্ষাই দিলেন যে, কথা শেষ হওয়ার পূর্বে কথার মাঝখানেই (নূতন) কাহারো কথা বলা উচিত নয়। পরন্তু জওয়াব দানকারীর জন্যও রাসূল এই শিক্ষাই পেশ করিলেন যে, কথার মাঝখানে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও পূর্ব কথা শেষ না করিয়া সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয়, সেই কথা শেষ করিয়াই পরবর্তী কথার দিকে লক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে।

আলোচ্য হাদীসের মূল বিষয়বস্তু হইতেছে কিয়ামত। প্রশ্নকারী কিয়ামত কখন হইবে, তাহা নিশ্চিতভাবে জানিতে চায়। জওয়াবে নবী করীম (স) নির্দিষ্ট দিন-তারিখের উল্লেখ করেন নাই। কেননা উহার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো জানা নাই। তবে উহার নিদর্শসমূহের কথা রাসূল (স) বলিতে পারেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন কিয়ামত হওয়ার পূর্বে মানব সমাজে যে সব ঘটনা অনিবার্যরূপে ঘটিবে সেই সবের কথা। তাই রাসূল (স) কিয়ামতের অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে আলোচ্য হাদীসে একটি বিশেষ নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই নিদর্শনের কথা বলিতে গিয়া রাসূল (স) বলিয়াছেন اِذَا اُضِيْعَتِ الْاَمَانَةُ "যখন আমানত বিনষ্ট করা হইবে"— (তখনি কিয়ামত হইবে)। অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে মানব সমাজে ব্যাপকভাবে আমানত নষ্ট হওয়ার ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবে। আমানত কাহাকে বলে? আমানত বিশেষ কোন জিনিসের নাম নয়। এই শব্দটি 'আমনুন' শব্দ হইতে নির্গত হইয়াছে; অর্থাৎ শান্তি, নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা, বিশ্বাসপরায়ণতা। একজন অপরজনকে বিশ্বাস করিয়া যে কোন ব্যাপারেই তাহার উপর নির্ভর করে তাহাই আমানত। এইরূপ কোন জিনিস, কোন কথা, কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ বা পদও আমানত হইতে পারে। রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ এইভাবে বিশ্বাস করিয়া একজনের উপর নির্ভর করা হইলে সেই বিশ্বাস রক্ষা করিয়া কাজ করা মুমিন মাত্রেরই কর্তব্য, বিশ্বাস নষ্ট করা— বিশ্বাসঘাতকতা করা মহাপাপ। এই পাপ যখন ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে শুরু করিবে, যখন কেহ কাহারো বিশ্বাস রক্ষা করিয়া কাজ করিবে না, বরং প্রতি ব্যাপারেই বিশ্বাসঘাতকতা করিব, তখন মনে করিতে হইবে যে, কিয়ামতের আর বেশি দেরী নাই। আমানত বিনষ্ট হওয়ার কথার অধিকতর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে বেদুইন জিজ্ঞাসা করিল, আমানত কিভাবে ধ্বংস ও বিনষ্ট হইবে ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহার জওয়াবে নবী করীম (স) ইরশাদ করিলেন ঃ اِذَا وُسِّدَ الاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ —যখন দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহ উহার অনুপযুক্ত লোকদের উপর ন্যস্ত করা হইবে।" হাদীসে উক্ত اَلْاَمْرُ শব্দটি পূর্বোক্ত আমানত শব্দের বদলেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার অর্থ করা হইয়াছে ঃ

اَلْاَمْرُ الْمُتَعَلِّقُ بِالدِّيْنِ كَا لْخِلَافَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْفُتَاءِ - (فتح المبدى-ج١ص ٨٧)

দ্বীনের সহিত সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় যথা রাষ্ট্রীয় খিলাফত, বিচারকার্য ও ফতওয়া দান বা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম।

আর এই সব দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম যখন এমন সব লোকের উপর ন্যস্ত করা হইবে, যাহারা দ্বীন ও আমানত রক্ষার দৃষ্টিতে অনুপযুক্ত লোক, তখনি কিয়ামত নিকটবর্তী বলিয়া মনে করিতে

হইবে। উপরে اَلْاَمْرُ -এর যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, খিলাফত তথা রাজ্য শাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারকার্য, আইন প্রণয়ন ও ফতওয়া দান—এই সবই দ্বীন সম্পর্কিত ব্যাপার; ইহার কোনটিই দ্বীন-বহির্ভূত কাজ নয়। যাহারা এই সব ব্যাপারকে দ্বীন বহির্ভূত মনে করে তাহারা ভ্রান্ত। উপরন্তু এই সব ব্যাপার দ্বীনের বিবেচনায় অনুপযুক্ত লোকদের উপর ন্যস্ত করা মহাপাপ এবং কিয়ামতের অন্যতম প্রধান নিদর্শন বিশেষ। আর দ্বীনের বিবেচনায় অনুপযুক্ত তাহারা, যাহারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, যাহারা দ্বীন অনুযায়ী জীবন যাপন করে না; যাহারা আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর নাফরমান।

বলা বাহুল্য, প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ কিয়ামত কখন হইবে। রাসূল (স) ইহার উত্তরে বলিলেন ঃ যখন আমানত বিনষ্ট হইবে। ইহার কারণ এই যে, এই অবস্থা সম্পর্কিত জওয়াবেই কালগত প্রশ্নের উত্তর নিহিত রহিয়াছে। ইবনে বাত্তাল বলিয়াছেন ঃ

فِيْهِ اَنَّ الْاَئِمَّةَ ائْتَمَنَهُمُ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ وَفَرَضَ عَلَيْهِمُ النُّصْحَ فَاذَا قَلَّدُوا لِلْاَمْرِ غَيْرَا اَهْلِ الدِّيْنِ فَقَدْ ضَيَّعُوا الْاَمَانَةَ وَفِيْهِ اَنَّ السَّاعَةَ لَاتَقُوْمُ حَتّٰى يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ - (فتح المبتدى- ج، ص۸۷)

হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, জননেতাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের জন্য আমানতদার বানাইয়াছেন এবং তাহাদের কল্যাণ কামনাই তাহাদের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহারা যখন বেদ্বীন লোকদেরকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেয় (কিংবা নিজেরা দায়িত্বশীল হইয়াও বেদ্বীন হইয়া যায়) তখন আমানতকে তাহারা বিনষ্ট করে। ইহা হইতে এই কথাও জানা যায় যে, বিশ্বাসঘাতক ও খিয়ানতকারী লোক যখন সাধারণভাবে আমানতদার, দায়িত্বশীল, দেশনেতা, শাসনকর্তা, উযীর, গভর্নর বা প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি নিয়োগ হইতে শুরু হইবে, ঠিক তখনই কিয়ামত নিকটবর্তী বলিয়া মনে করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে কিয়ামত আসিতে পারিবে না।

পরকালের পাথেয়

عَنْ اَنَسٍ رض اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتٰى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلَّا اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَىْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرْحَهُمْ بِهَا - (بجارى، مسلم)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক ব্যক্তি বলিল ঃ হে রাসূল! কিয়ামত কবে হইবে ? রাসূল বলিলেন ঃ তোমার মঙ্গল হউক, কিয়ামতের জন্য তুমি কি পাথেয় যোগাড় করিয়াছ ? সেই ব্যক্তি বলিল ঃ আমি উহার জন্য কিছুই যোগাড় করি নাই। তবে আমি আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসি। রাসূল বলিলেন ঃ তুমি যাহাকে ভালবাস, কিয়ামতে তুমি

তাহারই সঙ্গে থাকিবে। হযরত আনাস (রা) বলিলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ এই কথায় যত খুশী হইয়াছেন তত আর কিছুতে হন নাই। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর নিকট কিয়ামতের সময় ও দিন-তারিখ জানিতে চাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু রাসূল (স) সরাসরি এই সম্পর্কে কোন জওয়াব না দিয়া প্রশ্নকারীর দৃষ্টি কিয়ামতের সময় বা দিন-তারিখ হইতে অপরদিকে ফিরাইয়া লইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের দিন-তারিখ জানিতে চেষ্টা করা মূলতই অর্থহীন, একেবারেই নিষ্ফল কাজ। বস্তুত কিয়ামত কখন বা কোন্ দিন হইবে, চিন্তার এই পন্থা ঠিক নয়। ইহা জানিয়া কাহারো বিশেষ কোন লাভ নাই। কেননা কিয়ামত যখন হইবার তখন তো তাহা হইবেই। মুসলমানের তো মূল চিন্তার বিষয় হইতেছে এই যে, কিয়ামতের অনিবার্য কঠিন দিনে মুক্তির উপায় কি ? সেই দিনের জন্য কি পাথেয় সংগ্রহ করা হইয়াছে ? মুসলিম ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা সব ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বস্তুত মুসলমানের সঠিক আচরণ এই যে, হয় তাহারা কাজের কথা বলিবে, না হয় চুপ করিয়া থাকিবে। চিন্তার এই বিলাস ও উহার অভ্যাস মানুষকে ধ্বংস করে। মানুষ এই ধরনের চিন্তায় পড়িয়া অগ্রসর হইতে হইতে বিভ্রান্ত হইয়া যায়, অন্তরে স্বস্তি ও স্থিরতা হারাইয়া ফেলে। তখন মন ও মগজের অবস্থা গভীর পংকে নিপতিত জন্তুর মতো এমন হইয়া যায় যে, উহা হইতে মুক্তি পাওয়ার হাজারো চেষ্টা করা সত্ত্বেও উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না।

ইসলামে ঈমানের ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত এবং তাহা খুবই অল্প সময় সাপেক্ষ। কিন্তু তদনুযায়ী আমল করার জন্য সমগ্র জীবনও যথেষ্ট নয়। কর্মে-অনুপ্রাণিত মানুষ কেবল এই ধরনের চিন্তার বিলাস করার অবসর পায় না। তাহার মন সব সময় কেবল সেই সব চিন্তায়ই নির্লিপ্ত থাকে, যাহা মানুষের বাস্তব জীবনের সহিত জড়িত। আর সেই বিষয়ে সে চিন্তা করেও কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, তাহাকে তদনুযায়ী আমল করিতে হইবে। এইজন্য নয় যে, মনের বিলাস তৃপ্ত করিবে ও উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে। এইজন্য নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ -

আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, হয় সে কাজের কথা— ভাল কথা বলিবে, না হয় চুপ করিয়া থাকিবে।

ঠিক এই কারণেই আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) প্রশ্নকারীর জওয়াব দান করিত গিয়া এই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, কিয়ামত কবে হইবে সেই চিন্তা করায় কোনই ফায়দা নাই; বরং পরকালে মুক্তির কোন উপায়, কোন পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছ কিনা, তাহাই ভাবিয়া দেখ। এইজন্য সঠিক আকীদা ও নেক আমল দ্বারা জীবনকে সজ্জিত কর, জীবনের লব্ধ ও অবকাশটুকু বেকার ও নিষ্ফল চিন্তায় আর অতিবাহিত করিয়া দিও না।

হাদীসের শেষাংশে রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ তুমি তাহারই সঙ্গী হইবে যাহাকে তুমি ভালবাস। ভালবাসার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হইতেছে আনুগত্য ও অনুসরণ। আনুগত্য ও অনুসরণহীন ভালবাসার মৌখিক দাবির— অন্তত সাহাবীদের যুগে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কেননা তাঁহাদের হৃদয়মন ভালবাসার অনিবার্য ফল হিসাবে আনুগত্যে ভরপুর। তাহাদের বাস্তব

জীবন ছিল আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের অধীন এবং অনুসারী। ফলে যিনি রাসূলের যত নিকটবর্তী ছিলেন, তিনিই রাসূলের আনুগত্য ততবেশি করিতেন। আনুগত্যের ঊর্ধ্বে কিংবা আনুগত্য সম্পর্কে বেপরোয়া করিয়া দেওয়ার মতো কোন রাসূল প্রেম সাহাবাদের মহান যুগে পাওয়া যাইত না। তাঁহাদের কর্মমুখর জীবন রাসূল প্রেমের বাস্তব নির্দশন এই পেশ করিয়াছে যে, তাঁহারা রাসূলের প্রত্যেকটি ছোট-বড় কাজের অনুসরণ করা— সেইজন্য জীবন-ধন উৎসর্গ করিয়া দেওয়াও পরম ভাগ্যের ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন। সাহাবাদের রাসূল প্রেমের বাস্তবরূপ ছিল সর্বক্ষেত্রে তাঁহার অনুসরণ। ইহার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস ও সাহাবাচরিতের প্রতি পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

কিয়ামতের দিন সঙ্গী হওয়ার অর্থ কি ?

কিয়ামতের দিন রাসূলের সঙ্গী হওয়ার অর্থ এই যে, রাসূল (স) কে যে ভালবাসিবে, কিয়ামতের দিন সে রাসূলে করীম (স) ও তাঁহার অনুসারীদের দলে শামিল হইয়া হাশরের ময়দানে হাজির হইবে এবং সে রাসূলের সাথে সাথে থাকিবে। কেননা এই দুনিয়ায় যে লোক রাসূলে আনুগত্য করিল— রাসূলের কাজের অনুসরণ করিল— এই আনুগত্য ও অনুসরণের ফলে সে-ই হাশরের দিন অনিবার্যরূপে রাসূলের সঙ্গী ও সাথী হইবে। তাহাকে রাসূলের সাহচর্য হইতে কিছুতেই দূরে রাখা হইবে না। এই সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا - (النساء -٦٩)

যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতপ্রাপ্ত— নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককার লোকদের সঙ্গী হইবে। আর এই লোকদের সঙ্গী হওয়া বড়ই উত্তম— বড়ই ভাগ্যের ব্যাপার।

কুরআন মজীদের এই আযাতকে সম্মুখে রাখিয়া আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কিয়ামতের দিন রাসূল সাহচর্য কেবল তাহারাই লাভ করিতে পারিবে, যাহারা এই দুনিয়ায় রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিবে ও তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিবে। উপরিউক্ত আয়াতে রাসূলের সঙ্গী হওয়ার সুসংবাদ কেবল সেই লোকদেরকেই দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রাসূলের আনুগত্য করার অর্থ হইতেছে তাঁহার আদেশগুলি যথাযথভাবে পালন করা ও তাঁহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে স্বেচ্ছায় বিরত থাকা এবং তাঁহার সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

হাদীসের শেষভাগে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) সাহাবী যুগের বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রশ্নকারীর জওয়াবে রাসূলের এই ধরনের কথা বলায় সাহাবিগণ এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ইসলাম কবুল করার পর ততদূর সন্তুষ্ট আর কিছুতেই হইতে পারেন নাই। রাসূলের প্রতি সাহাবীদের কতখানি গভীর ভালবাসা ছিল এবং রাসূলের সাহচর্য লাভ করার আশায় তাঁহারা কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বস্তুত রাসূলের প্রতি সাহাবাদের যতদূর খাঁটি ভালবাসা ছিল, দুনিয়ার ইতিহাসে কোন নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে না।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَئَيْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلٰى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَاسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ - (مسند احمد)

উকবা ইবন আমের (রা) নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন তোমরা দেখিতে পাইবে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে তাহার অসংখ্য পাপ ও নাফরমানী সত্ত্বেও তাহার বাসনা অনুযায়ী দুনিয়ার অফুরন্ত নিয়ামত দান করিতেছেন, তখন মনে করিবে যে, ইহা আল্লাহ্র তরফ হইতে 'ইস্তেদরাজ' বা ঢিলদান ছাড়া আর কিছুই নয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন, 'যখন তাহারা সেই সব কথাই ভুলিয়া গেল, যাহার উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তখন আমরা তাহাদের সম্মুখে সকল জিনিসেরই দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিলাম। এইভাবে যখন তাহারা প্রদত্ত নিয়ামত পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল ও তাহা ভোগ-ব্যবহারে মগ্ন হইল তখন সহসা আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিলাম। ইহার দরুন তাহারা অতিশয় নিরাশ ও হতাশ হইয়া গেল।
— মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা কাহাকেও বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ-সম্ভারে নিমজ্জিত দেখিয়া এই কথা মনে করা কখনই ঠিক হইতে পারে না যে, আল্লাহ বুঝি তাহার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। বরং মনে করিতে হইবে যে, আল্লাহ তাহাকে এক কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কেননা, অতঃপর আল্লাহ তাহাকে এমনভাবে কঠিন আযাবের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবেন যে, তাহা হইতে তাহার রক্ষা পাওয়াই সম্ভব হইবে না।

আল্লাহ্র ঢিল দেওয়ার ব্যাপারটি ঠিক বড়শি দ্বারা মাছ শিকারের মতো। যে মাছটি যত বড় হইবে, তাহাকে শিকার করার জন্য তত বড় বড়শি এবং ততদীর্ঘ সূত্রের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বড়শি মুখে বিদ্ধ হওয়ার পর ডাঙায় উঠাইবার জন্য মাছের ছোট ও বড় আকার অনুপাতে কম-বেশি ঢিল দিতে হয়। এইভাবে মাছ যখন খুব ঘুরিয়া ফিরিয়া মুক্তির জন্য দিগ্বিদিগ ছুটিয়া শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন একটি আকস্মিক টান দিয়া উহাকে ডাঙায় তুলিয়া লওয়া হয়। যদিও বড়শি বিদ্ধ হওয়ার পর ডাঙায় উঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হতভাগ্য মাছ মনে করে ঃ "আমি মুক্ত, আমি যে দিকে ইচ্ছা ছুটিয়া যাইতে পারি।" আমাদের জীবনেও আল্লাহ্র তরফ হইতে এই নিয়মেরই কাজ দেখিতে পাইতেছি। কাজেই কাহারো বৈষয়িক উন্নতি— তাহা যে

কোন প্রকারেই হউক না কেন্ দেখিয়া কিছুমাত্র সন্দিগ্ন হওয়ার কারণ নাই। আল্লাহ্‌র শাশ্বত নিয়ম যথাসময় কার্যকরী হইবেই।

ঈমানদার ব্যক্তির বৈষয়িক জীবন

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ - (مسلم)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ দুনিয়া মিষ্টিদ্রব্য ও শ্যামল-সতেজ। আল্লাহ তা'আলা এইখানে তোমাদের খিলাফত— প্রতিনিধিত্ব— দান করিয়াছেন, যেন তিনি দেখিতে পান যে, তোমরা কিভাবে ও কি কাজ কর। — মুসলিম

ব্যাখ্যা দুনিয়া— দুনিয়ার যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী মানুষের জন্য সুমিষ্ট ও সুস্বাদু করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে; ইহা চির সবুজ, তাজা-বতাজা এবং চির শ্যামল। এই সব কিছু ভোগ-ব্যবহার করিয়াই মানুষকে এখানে জীবন যাপন করিতে হয়। ইহা না হইলে পৃথিবীতে মানুষের জীবন একেবারে অচল হইয়া পড়িত। কিন্তু মানুষকে এই সবের একচ্ছত্র স্বাধীন ও নিরংকুশ মালিক করিয়া দেওয়া হয় নাই। বরং এই পৃথিবীতে মানুষকে করা হইয়াছে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। মানুষ এই দুনিয়ায় নিজের ইচ্ছাও বাসনা অনুযায়ী চলিতে পারে না, মানুষ এখানে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, আল্লাহই এই সব কিছুর মালিক, অতএব মানুষকে এখানে প্রত্যেকটি কাজ— প্রত্যেকটি জিনিসের ভোগ ও ব্যবহার আল্লাহকে প্রকৃত মালিক ও নিজেকে আল্লাহ্‌র গোলাম ও প্রতিনিধি মাত্র মনে করিয়া আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী আঞ্জাম দিতে হইবে এবং ইহার মধ্য দিয়া আল্লাহ্‌র মর্জী পূরণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ - (الادب المفرد)

মিকদাম ইবনে মা'দী কারাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তুমি নিজে যাহা কিছু খাও, তাহা তোমার জন্য সদকা, যাহা তোমার সন্তানদেরকে খাওয়াও, তাহা তোমার জন্য সদকা; যাহা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও, তাহা তোমার জন্য সদকা এবং যাহা তোমার সেবক কর্মচারীকে খাওয়াও, তাহাও তোমার জন্য সদকা। — আল আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যা ঈমানদার ব্যক্তি কেবলমাত্র হালাল উপায়েই রোজগার করিয়া থাকেন এবং ইসলামী বিধানে যাহাকে ভরণ–পোষণ করার দায়িত্ব তাহার উপর অর্পণ করা হইয়াছে, সে দায়িত্বও ঠিক এই অনুভূতি লইয়া পালন করে যে, ইহা আল্লাহ্‌র নির্দেশ— আল্লাহ্‌র অর্পিত দায়িত্ব। ইহা যথাযথভাবে পালন না করিলে আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াবদিহি করিতে হইবে। এই অনুভূতি লইয়া সে নিজে যাহা খায়, সন্তান, স্ত্রী, চাকর ও অন্যান্য লোকদের যাহা কিছুই সে খাওয়ায় তাহাই

তাহার পক্ষে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ হইয়া থাকে। এই জন্য অন্য এক হাদীসে নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ 'মুসলমান মূসার মায়ের ন্যায়।' অর্থাৎ মূসা (আ)-এর মা নিজের সন্তানকে দুধ খাওয়াইয়াছিলেন, ইহা তাহার স্বাভাবিক দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তবুও তিনি এই দায়িত্ব পালন করিয়া ফিরাউনের নিকট হইতে বেতন পাইয়াছেন। ঈমানদার লোকেরা ঠিক এই রকমই। সে নিজে খায়, অন্যান্য নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকদের সে খাওয়ায়, যাহা তাহার স্বাভাবিক কর্তব্য, যাহা পালন না করিলে দুনিয়ায়ই তাহাকে জওয়াবদিহি করিতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সে আল্লাহ্‌র নিকট হইতেও সওয়াব লাভ করিবে।

عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَه وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَالْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَه هَوَا هَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللهِ - ٨

ترمذى)

শাদ্দাদ ইবনে আওস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ বুদ্ধিমান হইতেছে সেই ব্যক্তি যে আত্মসমালোচনা ও আত্মযাচাই করিতে অভ্যস্ত এবং মৃতুর পরের জীবনের জন্য (ইহজীবন) কাজ করে। পক্ষান্তরে দুর্বল ও সাহসহীন সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে প্রবৃত্তির লালসার দাস করিয়া দিয়াছে এবং ইহা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে (অনুগ্রহ ও দান পাওয়ার) প্রত্যাশী। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা যে ব্যক্তি আত্মসমালোচনা করিতে অভ্যস্ত, যে নিজেকে প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রত্যেকটি দিক যাচাই ও পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং নিজের যে সব ত্রুটি ধরা পড়ে, যাহা কিছুর অভাব ও ভ্রান্তি অনুভূত হয় তাহার সংশোধনের চেষ্টা করে, সে-ই প্রকৃত বুদ্ধিমান লোক, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা, যে ভুলত্রুটির জন্য পরকালে নিশ্চিতরূপে শাস্তি পাইতে হইবে এবং যাহার শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়া সম্ভব হইবে না, তাহা হইতে যদি আজ দুনিয়ার জীবনে নিজেকে পবিত্র রাখিতে পারা যায় তবে তাহা বাস্তবিকই দূরদর্শী ব্যক্তির কাজ, তাহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু যে নিজেকে লালসার গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছে, কখনই নিজেকে যাচাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং নিজেরই ত্রুটি নিজের হাতে কঠোরভাবে সংশোধন করিতে প্রস্তুত হয় না, তাহার মন যে কত দুর্বল, সে যে দুনিয়ার কোন বিরাট জাতীয় দায়িত্ব পালনের উপযোগী হইতে পারে না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু সর্বাধিক ধৃষ্টতা দেখায় সেই ব্যক্তি, যে নিজকে লালসার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াও— আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নাফরমানীর মধ্যে অহর্নিশ লিপ্ত থাকিয়াও— আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত পাইবার আশা রাখে। তাহার এই কথা বুঝা উচিত যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিতরণেরও একটা নিয়ম আছে এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী ঐসব লোক কিছুতেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাইতে পারে না, যাহারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করিতে আদৌ প্রস্তুত নয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكَبِىْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيْلٍ - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (স) আমার কাঁধ ধরিলেন এবং বলিলেন ঃ তুমি দুনিয়ায় একজন প্রবাসী অথবা পথিকের ন্যায় জীবন যাপন কর। — বুখারী

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا لِىْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا - (ترمذى)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ দুনিয়ার সহিত আমার কি সম্পর্ক ? আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেন কোন আরোহী পথ চলিতে চলিতে কোন গাছের নীচে ছায়ায় (অল্প সময়ের জন্য) আশ্রয় লইল এবং কিছুক্ষণ পর সেই গাছকে নিজ জায়গায় রাখিয়া সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা নবী করীম (স)-এর এই সংক্ষিপ্ত ও ছোট্ট নির্দেশ বাণী দুইটি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। দুনিয়ায় একজন ঈমানদার ব্যক্তির জীবনের ধারা কি হইবে, তাহা এই সংক্ষিপ্ত হাদীসে উপমার সাহায্যে চমৎকারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুনিয়ায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপমা দেওয়া হইয়াছে প্রবাসী কিংবা পথিকের সাথে। একজন লোক যে সাধারণত নিজের আসল ঘর-বাড়ি হইতে বহুদূরে প্রবাস জীবন-যাপন করে, তাহার কোন কাজেই কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সব কিছুই তাহার অস্থায়ী ও সাময়িক ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কেননা তাহার মনস্তত্ত্ব সব সময়ই এইরূপ থাকে যে, এখানে আমি স্থায়ীভাবে থাকিতে আসি নাই; বরং আজ হউক, কাল হউক, এক বৎসরে হউক, পাঁচ বৎসরে হউক, আমাকে এইখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই সে কোন কিছু স্থায়ী ও সুদৃঢ় ব্যবস্থা করে না, তাহার দরকারও মনে করে না। বরং সে শুধু এতটুকু ব্যবস্থা করিয়া লওয়াই যথেষ্ট মনে করে যে, কোনক্রমে দিন কাটিলেই হয়, প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হইতে বিশেষ কোন অসুবিধা যেন না হয়। উপরন্তু তাহার মনে সেই প্রবাসী অবস্থার দিকে আকৃষ্ট থাকে না বরং সব সময়ই তাহার স্মরণ হয় তাহার আসল বাড়ির কথা, সেই দিকেই সে মনের এক স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে। এবং কোন রকমে কাজ সম্পন্ন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্যই তাহার মন সব সময় উদগ্রীব হইয়া থাকে। যাহারা বিদেশে থাকেন তাহারাই এই কথাটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন।

রাসূল বলিতেছেন যে, এই দুনিয়ায় একজন মুসলমানের জিন্দেগীও ঠিক এইরূপই হওয়া উচিত। তাহার নিঃসন্দেহে মনে করা উচিত যে, তাহাকে এখানে চিরদিনের জন্য কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়া পাঠানো হয় নাই। বরং এখানে সে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্যই আসিয়াছে। হাজার চেষ্টা করিলেও সকল জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি-সম্পদ ব্যয় করিয়া অটুট অক্ষয় কোন রক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলেও— সে এখানে চিরদিন থাকিতে পারিবে না। এখান হইতে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। অতএব তাহার জীবন ধারা ঠিক প্রবাসীদের মতোই হওয়া উচিত। কেননা এখানে সে মূলতই প্রবাসী। এই দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ তাহাকে নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়াই পাঠাইয়াছেন। তাহা ছাড়া তাহার এই কথাও জানা নাই যে, এখানে তাহার সময় কতটুকু আর কখন তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। এই অজ্ঞাত অবস্থায় প্রত্যেক দুনিয়াবাসীরই কর্তব্য হইতেছে, এখানকার দায়িত্ব পালন করিয়া 'আসল বাড়িতে' যাওয়ার জন্য সতত প্রস্তুত হইয়া থাকা, যেন যখনি এখানের সীমায়িত সময় শেষ হইয়া যাইবে ও আসল বাড়িতে যাওয়ার জন্য ডাক আসিবে, তখনি যেন সে সেইদিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তখন যেন তাহাকে এই কথা ভাবিতে না হয় যে, "সময় তো ফুরাইয়া গেল, কিন্তু যে জন্য আমাকে পাঠানো হইয়াছিল তাহা তো সম্পন্ন হয় নাই।"

দ্বিতীয় বাক্যাংশ হইতেছে, 'আবিরু সাবীল'— পথ অতিক্রমকারী, পথিক অর্থাৎ একজন পথিক যেভাবে তাহার মঞ্জিলে, মকসুদের দিকেই সব সময় খেয়াল রাখিয়া পথ অতিক্রম করে। লক্ষ্যে পৌছিতে বিলম্ব হইতে পারে, পথ চলায় ব্যাহত হইতে পারে, তাহার নির্দিষ্ট পথ হারাইয়া যাইতে পারে— এমন কোন কাজই সে কখনো করিতে প্রস্তুত হয় না; বরং পথে যথ প্রকার বাধা, দুঃখ, আঘাতই আসুক না কেন, সবকিছুই সে অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া তাহার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া যায়— নবী করীম (স) বলেন যে, একজন মুমিন ব্যক্তির জীবনও ঠিক এইরূপই হওয়া বাঞ্ছনীয়। পথিক যেমন মনে করে যে, পথ বা পথের কোন বাঁক তাহার শেষ মঞ্জিল নয়, বরং ইহা পথ-ই, তাই সে পথে কখনো স্থায়ীভাবে আসন গাড়িয়া বসে না। অনুরূপভাবে একজন ঈমানদার ব্যক্তিরও মনে করা উচিত যে, এই দুনিয়ার জীবনই তাহার আসল জীবন নয়। আর পথ যেহেতু কখনো স্থায়ী বসবাস করার উপযোগী নয়, বরং উহা সব সময়ই অতিক্রম করার জন্য হইয়া থাকে এবং পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই শেষ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব, তাহার পূর্বে নয়— ঠিক তেমনি মুমিনের এই জীবন কোন অসীম ও অশেষ জীবন নয়, ইহাকে অতিক্রম করিয়াই তাহার আসল মঞ্জিলে পৌছা সম্ভব হইবে। তাই এই জীবনকে কোন চিরস্থায়ী অক্ষয় জিনিস করিয়া তোলার জন্য চেষ্টা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পথিক সব সময়ই ঠিক ততটুকু পরিমাণ পাথেয় লইয়া যাত্রা শুরু করে, যতটুকু তাহার পথে অপরিহার্য হয়, অধিক বোঝা লইয়া সে কখনোই পথের কষ্ট স্বীকার করিতে রাজি হয় না, ঠিক ঈমানদার ব্যক্তির জীবনেও বোঝার বাহুল্য সৃষ্টি করিতে কখনো প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়।

এই হাদীস হইতে আরো দুটি কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমত, হাদীসে বলা হইয়াছে كُنْ فِى الدُّنْيَا —দুনিয়ায় থাক— বসবাস কর। দুনিয়া ত্যাগ করিতে, ইহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বলা হয় নাই। তাই দুনিয়া ত্যাগ করিয়া জঙ্গলবাসী হওয়া, বৈষয়িক জীবন ও সংসারধর্ম পালন না করিয়া বৈষ্ণবী, বৈরাগী হওয়া ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ।

—১/১৫

তাই যাহারা ইসলামের নামে দুনিয়া ত্যাগের ভাবধারা প্রচার করে, তাহারা মূলত ইসলামের উপর কুঠারাঘাত করে।

দ্বিতীয়ত, বলা হইয়াছে ঃ عَابِرُ سَبِيْلٍ —'পথ অতিক্রমকারী'। পথিক প্রত্যেকটি মুহূর্তেই গতিবান হইয়া থাকে, যখনই তাহার গতি থামিয়া যায় তখনই সে তাহার 'পথিক জীবন' ত্যাগ করে, মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছার কোন সম্ভাবনাই তখন থাকে না। ঠিক একজন ঈমানদার ব্যক্তির জীবনও গতিশীল জীবন হইবে, স্থবির অচল জড়পদার্থ হইয়া থাকা তাহার জীবনধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া পথ উহার আরম্ভ (Starting point) হইতে শেষ লক্ষ্যবিন্দু (The End) পর্যন্ত একটানা সরল রেখার মতো চলিয়া গিয়াছে। পথিকের গতিশীলতার মধ্যে রহিয়াছে বিবর্তন ও পরিবর্তনের শাশ্বত ভাবধারা। মূল পথ এক রেখা হইয়া ঋজুভাবে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু উহার দুই দিকের পরিবেশ একরূপ নয়। পথে বিভিন্ন স্তরে উহা বিভিন্ন রূপ হইয়া আছে।

অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তির জীবনধারাও কোন জড়, স্থবির ও পরিবর্তনহীন জীবন হইবে না; বরং উহার গতি যেমন অব্যাহত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি উহার স্তরও পরিবর্তনশীল হওয়া আবশ্যক। এক একটি স্তর পথিকের সম্মুখে বাহ্যত শেষ মঞ্জিলের রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইলেও কোথাও সে স্তব্ধ হইতে— ক্ষান্ত হইতে প্রস্তুত হইবে না; বরং প্রত্যেক স্তরেই সে বলিবে, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

প্রসঙ্গত এই কথাও অনুধাবন করা আবশ্যক যে, যেখানে গতি আছে সেখানে কোন পংকিলতা জমা হইতে পারে না, তাহা ক্ষুদ্র ঝর্ণাধারা হউক আর বিশাল নদী-সমুদ্রই হউক। পংকিলতা সেখানেই পুঞ্জীভূত হইতে পারে— হইয়া থাকে, যেখানে গতি নাই। হাদীসে মুসলিম ব্যক্তির জীবন পথিকের ন্যায় যাপন করার নির্দেশ দিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাহার জীবন যেন কখনো গতি না হারাইয়া বসে।কেননা জীবনে যদি গতি থাকে তবে ব্যক্তি তথা সমষ্টিগত জীবনের সকল ক্ষুদ্র দোষত্রুটি ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে, গোটা জীবন এক গতিময় পরিচ্ছন্ন ধারায় পরিণত হইতে পারিবে। বস্তুত এইরূপ জীবনই মুসলিমের কাম্য।

দ্বিতীয় হাদীসেও ঠিক এই কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে গাছের ছায়ায় সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণকারী আরোহী পথিকের সহিত মুসলিম জীবনের তুলনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, একজন আরোহী পথিক ছায়া গ্রহণের জন্য হয়তবা সাময়িকভাবে কোন গাছের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু সেখানে সে কখনই স্থায়ী হইয়া বসবাস করিতে শুরু করে না, একটু বিশ্রাম লইয়াই সে আবার লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করে। একজন ঈমানদার ব্যক্তির জীবনও এমনই হওয়া উচিত। আর এই কথা যেমন ঈমানদান লোকদের ব্যক্তি জীবনের জন্য তেমনি তাহাদের সমষ্টিগত ও জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও। কোথাও ইহার সামান্য ব্যতিক্রম দেখা দিলেই বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

এক কথায় জীবনের অস্থায়িত্বের মধ্যে গতি স্থায়িত্ব, একটানা একই পথের মধ্যে স্তর বৈচিত্র্য— ইহাই হইতেছে মুসলিম জীবনের ধারা এবং ইহাই হইতেছে আলোচ্য হাদীসদ্বয়ের প্রতিপাদ্য।

আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا -
(ترمذی، ابن ماجاه)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল কর যেভাবে তাওয়াক্কুল করা উচিত, তবে তিনি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে রিয্ক দান করিবেন, যেমন করিয়া তিনি রিয্ক দেন পক্ষীকুলকে। উহারা সকাল বেলা শূন্য পেটে ক্ষুধার্থ বাহির হয় আর সন্ধ্যাবেলা ভরাপেটে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। — তিরমিযী, ইবনে মাজাহা

ব্যাখ্যা এই হাদীসটি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। প্রথমত, ইহাতে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষত মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন রিয্কের ব্যাপারে তো আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করিতে বলা হইয়াছে। আল্লাহ্র মতো অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, সর্বশক্তিমানের উপর যেরূপ ও যতখানি তাওয়াক্কুল করা উচিত বা সম্ভব যতখানি তাওয়াক্কুল পাইবার তিনি উপযুক্ত ততখানি। আল্লাহ্র প্রতি কতখানি দৃঢ় ঈমান ও অচল অটল বিশ্বাস থাকিলে যে এইরূপ তাওয়াক্কুল করা যায়, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে।

তৃতীয়ত, আল্লাহ্র উপর অনুরূপ তাওয়াক্কুল করিলেই আল্লাহ পূর্ণমাত্রায় রিয্ক দান করিবেন। তিনি কোন তাওয়াক্কুলকারীকেই বঞ্চিত করেন না, অভাব অনটনে ফেলেন না।

চতুর্থত, আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করিলে বাস্তবিকই রিয্ক পাওয়া যায়। আল্লাহ্র রিয্কদান ক্ষমতা যে অসীম ও সর্বাত্মক, তাহা বুঝাইবার জন্য হাদীসের শেষভাগে একটি বাস্তব দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, ইহা সকলেই দেখিতে পারে যে, সকাল বেলা পক্ষীকুল নিজ নিজ কুলায় হইতে শূন্যপেটে বাহির হইয়া পড়ে। উহাদের কোন খাদ্যভাণ্ডার সঞ্চিত নাই, জানা নাই কোথায় পেটভরা খাদ্য পাওয়া যাইবে। উহারা শূন্যলোকে উড়িতে শুরু করে। তখন আল্লাহ্র রিযিকের প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতাই হয় স্বাভাবিকভাবে উহাদের একমাত্র সম্বল। তাই দেখা যায়, সন্ধ্যা বেলা উহারা ঠিক পেটপূর্ণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াই ফিরিয়া আসে।

মানুষও যদি আল্লাহ্র প্রতি অনুরূপভাবে পূর্ণ তাওয়াক্কুল করিতে পারে, তবে আল্লাহ তাহাকেও ঐরূপ পূর্ণমাত্রায় রিয্ক দান করিবেন। বস্তুত কর্মক্ষমতাহীন পক্ষীকুলকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার বুকে রিয্ক দানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে মানুষের ন্যায় আশরাফুল মাখলুকাতের জন্যে রিয্কের ব্যবস্থা না করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। অভুক্ত যদি কেহ থাকিয়া যায় তবে তা মানুষেরই নিজস্ব পাপ, অপরাধ, আল্লাহ্র উপর পূর্ণমাত্রায় তাওয়াক্কুলের অভাব এবং স্বার্থপরদের মনগড়া অর্থনীতি ও ধন বন্টনে ভুল ব্যবস্থার কারণেই হইয়া থাকে। কাজেই যদি সর্বসাধারণ মানুষের জন্য রিয্কের ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র

উপর পূর্ণ মাত্রায় তাওয়াক্কুল করিত হইবে এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌র দেওয়া ধন ও খাদ্য বন্টননীতিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, পক্ষীকুল আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে; কিন্তু খাদ্যের সন্ধান ও চেষ্টা-সাধনা হইতে বিরত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া কুলায় বসিয়া থাকে না।

মুমিনের জীবন— কাফিরের জীবন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَاَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهٖ فَوْقَ اَنْفِهٖ - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি তাহার গুনাহ সম্পর্কে এতদূর ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে যে, সে মনে করে ঃ যেন কোন পাহাড়ের পাদদেশে বসিয়া আছে এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তে সে এই ভয় করে যে, পাহাড় তাহার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোক গুনাহকে মনে করে একটি মাছির মতো, যাহা তাহার নাকের ডগার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছে। (এবং সে তাহাকে হাতের ইশারায় তাড়াইয়া দিয়াছে)। এই বলিয়া হাদীসে বর্ণনাকারী আবূ শিহাব নাকের উপর হাত দ্বারা ইশারা করিলেন। —বুখারী

ব্যাখ্যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রসিদ্ধ খ্যাতিসম্পন্ন ও উচ্চ সম্মানিত সাহাবী। দ্বীন ইসলামের ভাবধারা অনুধাবন ও ইসলামী জ্ঞান পারদর্শিতায় শীর্ষস্থানীয়। উপরে তাঁহারই একটি বাণী পেশ করা হইয়াছে। হাদীস বিজ্ঞানের পরিভাষায় সাহাবীর বাণীকে বলা হয় 'আসর' (اثر)। এই আসরই তাঁহার উপরিউক্ত রূপ জ্ঞান প্রতিভার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাহার এই কথা কুরআন ও হাদীসের মৌলিক ভাবধারার নির্যাস।

মুমিন ব্যক্তির দ্বারা যে নাফরমানী কাজ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই তাহার গুনাহ; তাহা ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তাহার সম্পর্ক মনের সহিত হউক আর মগজের সহিত হউক, মুখের সহিত হউক কিংবা দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত হউক। তাহা ব্যক্তিগত পাপই হউক আর সমষ্টিগত গুনাহই হউক। ইবাদত, নৈতিকতা, পারস্পরিক কাজকর্ম, বান্দার হক, সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, দাওয়াত ও জিহাদ— জীবনের যে কোন বিভাগ এবং যে কোন কাজের ব্যাপারেই হউক না কেন এবং যে কোন কারণেই হউক না কেন।

মুমিন ব্যক্তি এই গুনাহকে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভয়াবহ মনে করে। এই ব্যাপারে তাহার মনে এই আতংকের ভাব বর্তমান থাকে যে, সে যেন পর্বতের নিম্নদেশে বসিয়া আছে এবং যে কোন মুহূর্তে এই পাহাড় ভাঙ্গিয়া তাহার উপর পড়িতে পারে, সে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহকে— তাহা যত ক্ষুদ্র ও সামান্যই হউক না কেন, কখনো সামান্য ও নগণ্য মনে করিতে পারে না। বরং সে সব সময়ই তাহার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ সম্পর্কে এতদূর সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে যে, আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও পরকালীন কঠিন শাস্তির ভয়ে সে কাঁপিতে থাকে। সামান্য গুনাহ হইয়া গেলও সে মনে করে তাহার মাথায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ও

নিজেকে সেই গুনাহ হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে তাহার আর রক্ষা নাই। তাই সে অবিলম্বে তওবা করিয়া নিজেকে আল্লাহ্‌র ফরমাবরদারীর পথে পরিচালিত করে। পরকালীন শাস্তি হইতে বাঁচিবার জন্য সে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চায়, মনে করে, আল্লাহ্‌র পানা ছাড়া বান্দার রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় নাই। সেইজন্য সে আল্লাহ্‌র নিকট কান্নকাটি পর্যন্ত করিতে শুরু করে। আল্লাহ্‌র রুজ্জুকে দৃঢ়তা সহকারে ধারণ করে এবং ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র ফরমাবরদারী করা, আল্লাহ্‌র সন্তোষের পথ অনুসরণ করা ও আল্লাহ্‌র নাফরমানীর পথ হইতে বাঁচিয়া থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। বস্তুত প্রকৃত ঈমানের ইহাই বাস্তব ফল এবং ইহাই হইতেছে নির্ভুল নিদর্শন।

পক্ষান্তরে গুনাহ্‌গার ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সত্যকে ভুলিয়া যায়। আল্লাহ্‌র ভয় তাহার মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটিতে পারে না। সত্যকে— পরের অধিকারকে— ভুলিয়া যাওয়ার পরিণাম হইতেছে নির্ভীকতা, বেপরোয়াভাব ও মর্যাদাহানিকর কাজ গ্রহণ। পাপস্পৃহা ও বেপরোয়া হইয়া আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হইয়া যাওয়া। পাপকে— সে (পাপ যত বড়ই হউক না কেন) কোন অপরাধের কাজ বলিয়া মনে করে না। কখনো শয়তানের ফেরেবে পড়িয়া পাপ করিলেও তাহার মনে অনুতাপ জাগে না। বস্তুত ইহা কেবলমাত্র বেঈমান লোকদেরই ভূমিকা হইতে পারে। হাদীসের মূল শিক্ষা এই যে, কে ঈমানদার ও কে বেঈমান তাহা ব্যক্তির বাস্তব জীবনের কাজকর্মের ভিতর দিয়াই সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। এক কথায় বলা যায়, গুনাহ হইয়া গেলে ব্যক্তির মনে যদি অনুতাপ জাগে ও তওবা করিতে প্রস্তুত হয়, তবে সে ঈমানদার। আর পাপে যদি বেপরোয়া ভাব হয়, বড় বড় পাপকেও উপেক্ষা করে, তাহাতে যদি একটুকুও ভয়, আতংক বা অনুতাপ না জাগে, তবে সে বেঈমান।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَقَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَاالنَّجَاةُ فَقَالَ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَالْيَسَعْ بَيْتَكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ - (مسند احمد، ترمذى)

হযরত উকবা ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি রাসূলে করীম (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম ও আরয করিলাম যে, মুক্তির উপায় কি, তাহা বলিয়া দিন। উত্তরে তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ তোমার জিহ্বা তোমার আয়ত্তে রাখ, তোমার ঘরকে প্রশস্ত কর এবং নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কান্নাকাটি কর।

— মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা মুক্তির উপায় কি, জিজ্ঞাসা করা হইলে রাসূলে করীম (স) যে তিনটি উপায় ঘোষণা করিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। প্রথম জিহ্বা সংযত রাখা— জিহ্বাকে স্বীয় আয়ত্বে রাখা এবং স্বীয় আদর্শানুযায়ী উহাকে ব্যবহার করা। অন্য কথায় মুখে আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত কোন কথা উচ্চারণ না করা। বস্তুত জিহ্বা স্বীয় কন্ট্রোলে না থাকার দরুন মানব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত যে বিপর্যয় ও ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; পক্ষান্তরে উহাকে সংযত রাখিলে, স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায় উহাকে ব্যবহার করিলে কত যে বিপদ, গণ্ডগোল ও তিক্ততা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহারও হিসাব নাই। জিহ্বা সংযত না থাকিলে, তিক্ত কথা বলার অভ্যাস থাকিলে কত মানুষের হৃদয় তাহার জিহ্বা-তরবারির বিষাক্ত আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই জন্য আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল নানাভাবে ও নানা প্রসঙ্গে জিহ্বাকে সংযত করার নির্দেশ ও উপদেশ দিয়াছেন। বিশেষত ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিকেরই ইহা বিশেষ কর্তব্য— ইহা ইসলামী জিন্দেগীর বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বলা হইয়াছে, নিজের ঘর সব সময় উদার, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া রাখিতে। যখনই কোন মেহমান আসিবে, সে যেন ইসলামী সমাজের কোন ব্যক্তিরই ঘরের দ্বারদেশ হইতে প্রতিহত ও বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য না হয়। বরং যেন সেই ঘরের সাদর সম্বর্ধনা লাভ করিতে পারে। মুসলমান মুসলমানের নিকট যাইবে ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু একজন মুসলমান অপর একজনের দুয়ারে গিয়া যদি সম্বর্ধনা না পায় তাহা হইলে সামাজিক জীবনে নিবিড় ঐক্য, বন্ধুতা ভালবাসা গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য হযরতের এই নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে রাসূলের আরো অনেক বাণী হাদীস গ্রন্থ সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার ভিত্তিতে ইসলামী শরীয়তের এই বিধান রচিত হইয়াছে যে, মেহমান আসিলে তাহার আতিথ্য করা ওয়াজিব।

তৃতীয় বলা হইয়াছে, স্বীয় কৃত কাজের দরুন অশ্রু বর্ষণ করিতে, নিজের ভুল স্বীকার করিয়া আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হইতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কান্নাকাটি করিতে।

ভুল-ভ্রান্তি, দোষ, পদস্খলন মানুষেরই হইয়া থাকে এবং মানুষ যদি অনুতপ্ত হয় তবে আল্লাহ্ অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইহা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু মানুষই যদি পাপ করে কিন্তু সেই জন্য অনুতপ্ত না হয়, পাপ করিয়া আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে তবে তাহা চরম ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই। আল্লাহ্র নিকট শির্ক ছাড়া সব অপরাধেরই ক্ষমা আছে; কিন্তু হয়ত ক্ষমা নাই এই ধৃষ্টতার। কাজেই প্রত্যেক ঈমানদার মানুষেরই উচিত স্বীয় অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, নিজ গুনাহের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। এই ক্ষমা প্রার্থনাও কৃত্রিম হওয়া উচিত নয়, আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য ক্রন্দন ও অশ্রু বর্ষণও অপরিহার্য।

এক কথায় বলা যায়, উল্লেখিত তিনটি জিনিস যথাযথরূপে কার্যকর হইলে মানব সমাজ অসংখ্য বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং বর্ষিত হইতে পারে আল্লাহ্র তরফ হইতে অফুরন্ত শান্তি ও সমৃদ্ধি।

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ- (ابن ماجه، ترمذى، بيهقى)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির ইসলামী জিন্দেগীর সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ইহাই হইতে পারে যে, সে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কথা ও কাজ পরিহার করিয়া চলিবে।

— ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা হাদীসের অর্থ সুস্পষ্ট। যে কাজ বা কথার কোন অর্থ হয় না, যাহার কোন সার্থকতা নাই, ফল নাই, ফায়দা নাই, দুনিয়া আখিরাতে কোন দিক দিয়াই যাহার কোন উপকারিতা নাই, এমন কাজ করা ঈমানদার মুসলমানদের উচিত নয়। এই ধরনের সকল কাজ হইতে নিজেকে দূরে রাখাই কর্তব্য। কেননা মুসলমানদের জিন্দেগীর একটি মুহূর্তও নষ্ট করা নিষ্ফল ও বেকার কাজে অতিবাহিত করা একেবারেই অনুচিত। কাজেই মুসলিমের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সুফলদায়ক কাজে ও কথায় কাটানো কর্তব্য। মানুষকে আল্লাহ্র দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামত সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। তন্মধ্যে মানুষের জীবন— জীবন-কালের প্রত্যেকটি মুহূর্ত কিভাবে কাটানো হইয়াছে তাহা অন্যতম। অতএব প্রত্যেকটি মুহূর্তই যাহাতে আল্লাহ্র সন্তোষ এবং কোন না কোন সুফলজনক কাজে ব্যয়িত হয়, সেই জন্য সচেতন ও সতর্ক হইয়া থাকাই মুসলিমের কর্তব্য।

বস্তুত মুসলিম জীবনের ইহা অন্যতম মূলমন্ত্র। ইহার প্রেরণায়ই মুসলমান এককালে এতদূর দায়িত্ব সম্পন্ন ও প্রত্যেকটি মুহূর্ত কর্মতৎপর হইয়াছিল যে, এইদিক দিয়া তাহারা ছিলেন দুনিয়ার আদর্শ, তাহারা হইয়াছিলেন বিশ্বজয়ী। কিন্তু উত্তরকালে যখন সময় ও জীবনের মূল্যবোধ মুসলমানগণ হারাইয়া ফেলে, তখন সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইয়া গেল তাহাদের চরম অধঃপতন। ইহা এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রকৃত মুসলিম ঃ প্রকৃত মুহাজির

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ - (بخاری)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) নবী করীম (স) হইতেই বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম সে-ই, যাহার রসনা ও হাত হইতে মুসলিমগণ রক্ষা পায় এবং মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে। — বুখারী

ব্যাখ্যা হাদীসে উল্লেখিত 'হাত' মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিশেষ। কিন্তু এখানে 'হাত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রকৃত হাতও বুঝায় এবং ক্ষমতা ও আধিপত্যও ইহার অর্থ হইতে পারে। অপরের অধিকারে অনধিকার চর্চা করা হইলে, ন্যায়সঙ্গত অধিকার না থাকা সত্ত্বেও অপরের কোন জিনিস জোরপূর্বক দখল করিয়া লইলে তাহা হস্তক্ষেপ বুঝায়; যদিও এই কাজ প্রকৃত হস্ত দ্বারা করা হয় না।

হাদীসের প্রথম অংশে মুসলিম ব্যক্তির সত্যিকার পরিচয় দান করা হইয়াছে। মুসলিমের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, সে কাহারো একবিন্দু ক্ষতি করে না, কাহাকেও কোন ভাবেই কষ্ট দেয় না। যাহার রসনা ও হাত দ্বারা অপর মুসলিম আঘাত প্রাপ্ত হয়, সে যাহাই হউক মুসলিম নয়। দুনিয়ার একজন অপরজনের ক্ষতি করিতে পারে প্রধানত এই দুইটি অঙ্গ দ্বারা। তন্মধ্যে 'রসনা' (জিহ্বা বা মুখে)-র কথাই প্রধান। ইহার আঘাত পড়ে মানুষের মনের উপর এবং উহার ক্ষত গভীর ও অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া থাকে, কিন্তু অস্ত্রের আঘাত পড়ে মানুষের শরীরের উপর, যাহার পীড়ন অপেক্ষাকৃত কম। এই জন্য এক আরব কবি বলিয়াছেন ঃ

جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ
وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

বল্লমের আঘাত শুকাইয়া যায়,
কিন্তু রসনার আঘাত কখনো সারে না।

এই কথার সত্যতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। মুখ ও মুখের কথাই মানুষের প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত সত্ত্বাকে প্রকাশ করে। মুখের কথাই তাহার স্বরূপ ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কি, কোন স্বভাব ও প্রকৃতির, তাহা তাহার মুখের কথা শুনিলেই নিঃসন্দেহে জানিতে পারে যায়। ইহা যেমন সত্য, তেমনি এই কথাও সত্য যে, যাহার মুখের কথায় অপর লোক আঘাত পায়, অপরকে আঘাত দিয়া যে কথা বলিতে অভ্যস্ত, সে ইসলামের হুকুম-আহকাম যতই পালন করুক না কেন, ইহা তাহার একটি বিরাট ত্রুটি, ইহার দরুন প্রকৃত ও পূর্ণ মুসলিম হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

ইতিহাসে মুসলিমের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাহারা মিষ্টভাষী, তাহাদের কথায় প্রাণ গলিয়া যায়, মন কাড়িয়া লয়। প্রথম যুগের মুসলিমের এই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় ছিল বলিয়াই তাঁহারা তদানীন্তন দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মন জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইসলামের দ্রুত

বিস্তার লাভের মুলে অসংখ্য কারণের মধ্যে ইহা ছিল একটি উল্লেখ্যযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিশেষত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ইহা একটি অপরিহার্য গুণ। এই গুণ না থাকিলে কেহ যেন ইসলামী দাওয়াতের কাজ না করে; করিলে তাহার দ্বারা ইসলামের প্রচার হওয়া তো দূরের কথা, ইসলামের প্রতি লোকদের বীতশ্রদ্ধা জাগিবে, ইসলাম হইতে লোকেরা দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে।

সাধারণভাবে কোন সময়ই যেমন কাহাকেও আঘাত দিয়া কথা বলা নিষিদ্ধ, তেমনি ইসলাম প্রচারের কাজে ইহা বিশেষভাবে আপত্তিকর।

এই কারণেই রাসূলে করীম (স) অত্যন্ত মিষ্টিভাষী ছিলেন। কুরআন মজীদেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - (ال عمران - ۱۰۹)

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই হে নবী, তুমি বিনম্র হইয়াছ, অন্যথায় তুমি যদি রূঢ় ভাষী ও পাষাণ মনের অধিকারী হইতে, তবে সব লোক তোমার চতুষ্পার্শ্ব হইতে ভাগিয়া যাইত।

— আল ইমরান ঃ ১০১

রাসূলে করীম (স) যে রূঢ়ভাষী ছিলেন না, বিনয়ী ও নম্র ছিলেন, তাহার মুখের কথায় যে মানুষ আত্মহারা হইয়া যাইত আল্লাহ তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবেই একথার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি চান প্রত্যেকটি মুসলিমও ঠিক সেই গুণেই গুণান্বিত হইবে।

মুখের কথার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলে করীম (স) হাতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। হাতও মানুষের এমন একটি হাতিয়ার, যাহার দ্বারা অপরের ক্ষতিও করা যায়, উপকারও করা যায়; অপরকে আঘাতও দেওয়া যায়, তাহার কল্যাণও করা যায়। তাই রসনার সঙ্গে সঙ্গে হাতকেও অপরের ক্ষতি সাধন হইতে বিরত রাখিতে রাসূলে করীম (স) নির্দেশ দিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, হাত বলিতে কেবল নির্দিষ্ট একটি অঙ্গকে বুঝানো হয় নাই, অন্যায়ভাবে মানুষের যে ক্ষতি বা অপকারই করা হইবে, তাহাই হস্ত দ্বারা সাধিত হইল বলা যাইবে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

اَلْيَدُهِيَ اسْمٌ لِلْجَارِحَةِ وَلٰكِنَّ الْمُرَادُ مِنْهَا اَعَمُّ مِنْ اَنْ تَكُوْنَ يَدًا حَقِيْقَةً اَوْ يَدًا مَعْنُوِيَّةً كَالْاِسْتِيْلَاءِ عَلٰى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَانَّهٗ اَيْضًا اِيْذَاءٌ لٰكِنْ لَا بِالْيَدِ الْحَقِيْقَةِ - (عمدة القرى ج - ص۱۳۱)

হাত একটি অঙ্গ বিশেষ, কিন্তু এখানে প্রকৃত হাতও অর্থ হইতে পারে আর ভাব অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন অপরের হক অনধিকারভাবে দখল করা। কেননা ইহাও এক প্রকারের কষ্টদান— যদিও তাহা প্রকৃত হাত দ্বারা হয় না। — উমদাতুলকারী ঃ ১৩১

বলা বাহুল্য, হাদীসে কেবল মুসলিমকেই সকল প্রকার কষ্ট দান হইতে রক্ষা করার কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু সাধারণভাবে সব মানুষই ইহার অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের দ্বিতীয় ও শেষ অংশে

প্রকৃত মুহাজিরের পরিচয় দান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে।

'মুহাজির' 'হিজরত' শব্দ হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহার আভিধানিক অর্থ পরিত্যাগ করা। এক ব্যক্তি যখন ইসলাম কবুল করে, তখন হইতে তাহার হিজরতের কাজ শুরু করিতে হয়। প্রথমে তাহার মন ও মগজ হইতে ইসলামের বিপরীত আকীদাসমূহ বহিষ্কৃত করে— ইহা তাহার প্রথম হিজরত। দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ্‌র যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে, হারাম জিনিস ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সকল নিষিদ্ধ জিনিস ও কাজ পরিত্যাগ করার জন্য পূর্ণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র অপরিহার্য। তৃতীয় পর্যায়ে সে এই দিকে মনোনিবেশ করে। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করিতে চায়। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা এই দিক দিয়া যদি চরম নৈরাশ্যজনক ও দুরধিগম্য মনে হয় তখন সে নিরুপায় হইয়া সেই সমাজ ও দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রচলিত ভাষায় ইহাকেই বলে হিজরত। কিন্তু উপরে আলোচনা হইতে জানা গেল যে, ইহাই আসল ও একমাত্র হিজরত নয়। হিজরতের আসল অর্থ ত্যাগ করা আর দেশ ত্যাগ করা ইহার চূড়ান্ত পর্যায় ও সর্বশেষ উপায়। কাজেই যে লোক প্রকৃত মুহাজির হইতে চায় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগ করা তাহার প্রথম কর্তব্য, তাহা না করিয়া শুধু দেশ ত্যাগ করিলেই হিজরত হয় না এবং যে তাহা করে, সেও 'মুহাজির' হয় না।

আলোচ্য হাদীসে প্রকৃত মুসলিম ও মুহাজিরের রূপ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা সরাসরি আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কশীল। বাহ্য দৃষ্টিতে ও সরকারী দফতরে মুসলিম ও মুহাজির সংখ্যাতীত ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ দফতরে মুসলিম ও মুহাজিরকে সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য।

মুসলমানের সমাজ জীবন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرَءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ – (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই; সে না তাহার উপর জুলুম করিবে, না তাহাকে লজ্জা বা লাঞ্ছনা দিবে, আর না তাহাকে হীন ও ছোট মনে করিবে। অতঃপর রাসূলে করীম (স) নিজের বক্ষস্থলের দিকে ইশারা করিয়া তিনবার বলিলেন ঃ তাকওয়া এখানেই। মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তাহার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে— ছোট মনে করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মাল ও ইজ্জত অপর সমস্ত মুসলমানের উপর হারাম। — মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসে কয়েকটি মূল কথার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। প্রথমত, মুসলমান মুসলমানের ভাই বলিয়া বিশ্ব মুসলিমের সামগ্রিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এই কথাটি দুই দিক দিয়াই সত্য। বংশ ও রক্তের দিক দিয়া সকলেই যখন বাবা আদম ও মা হওয়ার সন্তান— অধস্তন পুরুষ, তখন মুসলমানদের পরস্পরের ভাই হওয়ার সত্যতা সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে আদর্শবাদের দিক দিয়াও এই কথা নির্ভুল। কেননা প্রত্যেক মুসলিমই যখন একই ইসলামী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী এবং বাস্তব জীবনে উহার অনুসরণকারী ও উহার প্রতিষ্ঠাকামী তখন তাহারা একই পথের পথিক, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথী ও সাহায্যকারী এবং সহকর্মী। যেহেতু ইসলামী আদর্শ বিশ্বাস ও অনুসরণের দিক দিয়াই মুসলমান মুসলমান বলিয়া পরিচিত হয়, কাজেই মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব আদর্শবাদের দৃষ্টিতেই অধিকতর প্রকট।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অনিবার্য দাবি এই যে, একজন মুসলমান অপর মুসলমানের উপর কিছুতেই জুলুম করিবে না, তাহার সহিত খারাপ ব্যবহার করিবে না, তাহার হক অপহরণ করিবে না বা নষ্ট হইতে দিবে না। অন্যায়ভাবে তাহাকে মারধোর করিবে না, তাহাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালী করিবে না। এইরূপ ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রহিয়াছে প্রত্যেক মুসলমানের প্রত্যেক মুসলমানের উপর। এই অধিকার পূর্ণ না হইলেই জুলুম হয়।

তৃতীয়ত, নিজে তো জুলুম করিবেই না, তাহাকে অসহায়, আশ্রয়হীন এবং পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুহীন করিয়া রাখিয়া অপরকে তাহার উপর জুলুম করার সুযোগও করিয়া দিবে না। কারণ প্রত্যেক মুসলিমেরই অপর মুসলিমের উপর এই হক বর্তিয়াছে যে, বিপদে-আপদে সে তাহার সাহায্য করিবে, তাহার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইবে, যেন কেহ তাহাকে একবিন্দু কষ্ট দিতে না পারে।

চতুর্থত, কোন মুসিলমই যেন অপর মুসলিমকে হীন, নীচ ও ছোট এবং নিজেকে বড়, উচ্চ ও উন্নত বলিয়া মনে না করে। কেননা তাহারা সকলেই যখন এক পিতামাতার সন্তান তখন একজন আর একজনকে কোন্ অধিকারে ঘৃণা করিতে পারে— ছোট মনে করিতে পারে?

পঞ্চমত, তাকওয়া পরহেজগারীর মূল উৎস ও কেন্দ্র হইতেছে মানুষের হৃদয়। হৃদয়ের ভূমিতে তাকওয়ার বীজ বপন করা হইলে ও উহার শিকড় মজবুত হইতে পারিলে মানুষের বাহ্যিক আমল-আখলাক ও আচার-ব্যবহার, চরিত্র ও যাবতীয় কাজকর্মও ঠিক হইতে পারে, ইসলামের পবিত্র ভাবধারায় ব্যক্তি জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের ভূমিতেই যদি তাকওয়ার স্থান পাইতে না পারে, তবে বাহ্যিক বেশ-ভূষা যতই ফিটফাট করা হউক না কেন, প্রকৃত তাকওয়া লাভ হইবে না। কেননা বাহ্যিক বেশ-ভুষায় না চরিত্র পরিবর্তিত হয়, না ব্যক্তির পরকাল নিরাপত্তাপূর্ণ হয়।

শেষ কথা এই যে, মুসলিম সমাজে কোন মুসলমানের জান-মাল ও আবরুর উপর বিনা কারণে হামলা করা নিকৃষ্টতম ও ঘৃণার্হ কাজ। ইহার শাস্তি দুনিয়ায় ইসলামী ফৌজদারী আইনেই অত্যন্ত কঠোর এবং আখিরাতে তো এই লোক আল্লাহ্র কঠিন্ আযাবে নিক্ষিপ্ত হইবে।

বর্তমান মানব সমাজের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই হাদীসের গুরুত্ব অসাধারণ। এই হাদীসের ভাবধারা দুনিয়ার সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে পরিস্ফূট হইলে সর্বগ্রাসী সম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শোষণ এবং সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক নিপীড়ন বন্ধ হইতে

পারে। মানুষ বাঁচিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে। অন্যথায় মানুষের পার্থিব জীবন মৃত্যুর চাইতেও ক্লেশদায়ক ও মর্মান্তিক হইবে।

ইসলামী জীবনের শপথ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت رض وكَانَ شَهِدَ بَدْراً وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاء لَيْلَةَ الْعَقَبَة اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهٗ عَصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِه بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰه شَيْئًا وَّلَا تُسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَاتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفِىٌ مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰه وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ -

(بخارى)

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে— তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তিনি 'আকাবা' রাত্রিতে নিযুক্ত নেতাদের অন্যতম— যে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন, তখন তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার সাহাবীদের একদল উপস্থিত ছিল ঃ তোমরা আমার নিকট এই কথার উপর 'বায়আত' কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন জিনিসই শরীক করিবে না, তোমরা চুরি করিবে না, জ্বিনা করিবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করিবে না, তোমরা পরস্পরের উপর সামনা-সামনি মিথ্যা-মিথ্যি দোষারোপ করিবে না এবং তোমরা ভাল কাজের ব্যাপারে কখনো নাফরমানী করিবে না। তোমাদের মধ্যে যে যে এই 'বায়আত' যথাযথভাবে পালন করিবে, তাহার প্রতিফল ও পুরস্কার দান আল্লাহ্‌র উপর বর্তিবে। আর যে এই নিষিদ্ধ কাজগুলির মধ্য হইতে একটিও করিবে এবং সেই জন্য দুনিয়ায় কোন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে, তবে ইহা হইবে তাহার গুনাহের কাফ্‌ফারা। আর যে ইহার মধ্য হইতে কোন একটি কাজও করিবে; কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে ঢাকিয়া দিবেন, তবে এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার গুনাহ্ ক্ষমা করিবেন আর ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি দান করিবেন। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর আমরা এই কথাগুলি মানিয়া লইয়া রাসূলের নিকট 'বায়আত' করিলাম। — বুখারী

ব্যাখ্যা হাদীসটি বুখারী শরীফে মোট পাঁচটি স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সহীহ মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফেও ইহার শব্দের কিছু পার্থক্য সহকারে উদ্ধৃত রহিয়াছে।

হাদীসের প্রথমাংশে মূল বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত উবাদার পরিচয় দান প্রসঙ্গে দুইটি কথা বলা হইয়াছে। প্রথম এই যে, তিনি বদর যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক বিরাট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। রাসূলে করীম (স) মদীনায় হিজরত করার

অল্প কয়েক বৎসর পরই এই মহাসংগ্রামের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, ইহা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। মদীনা হইতে কয়েক মাইল দূরে বদর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহা 'বদর যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে শরীক থাকা এক বিশেষ সৌভাগ্যের ব্যাপার। স্বয়ং আল্লাহর তা'আলাও এই যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবীদের প্রশংসা করিয়াছেন। এই কারণেই হযরত উবাদার পরিচয় দান প্রসঙ্গে এই কথার উল্লেখ জরুরী মনে করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় পরিচয় এই দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি আকাবার রাত্রে নিযুক্ত বারোজন নেতার মধ্যে একজন। আকাবা 'মিনা' নামক স্থানে অবস্থিত এক পাহাড়। এই স্থানে নবী করীম (স) মদীনার আনসারদের নিকট হইতে ইসলাম গ্রহণ, পালন ও সর্বপ্রকারে রাসূলে করীম (স)-এর সাহায্য সহযোগিতার দায়িত্ব গ্রহণের 'বায়আত' ও প্রতিশ্রুতি এবং উহার উপর শপথ গ্রহণ করেন। এই 'বায়আত' গ্রহণের কাজ দুইবার অনুষ্ঠিত হয়।

একবার হজ্জের সময়ে নবী করীম (স) কয়েকজন আনসারকে ডাকিয়া এক স্থানে বসাইয়া তাহাদের সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন ও আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহাদেরকে কুরআন মজীদের বিশেষ অংশ পাঠ করিয়া শোনাইয়াছিলেন। আখেরি নবীর আগমন সম্পর্কে তাঁহারা পূর্বেই ইয়াহূদীদের নিকট হইতে খবর পাইয়াছিলেন। তাহারা ইয়াহূদীদের পূর্বেই সেই প্রতীক্ষিত আখেরী নবীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার প্রতি সর্বাগ্রে ঈমান আনার উদ্দেশ্য রাসূলের এই দাওয়াত কবুল করিয়া লন। অতঃপর তাহারা মদীনায় ফিরিয়া গিয়া রাসূলের এই কথা প্রচার করেন এবং পরবর্তী বৎসরে মোট বারোজন লোক রাসূলের সহিত কথা বলার জন্য একত্রিত হন। ইহাদের একজন ছিলেন হযরত উবাদা। তাঁহারা সকলে রাসূলের নিকট এই হাদীসের উল্লেখিত শপথ গ্রহণ করেন। ইহাই আকবার প্রথম 'বায়আত'। পরবর্তী বৎসর মোট সত্তরজন লোক রাসূলের নিকট 'বায়আত' করার উদ্দেশ্য এই একই স্থানে একত্রিত হন। তখন রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্য হইতে বারোজন নেতা বাছাই করিয়া দাও। পরে উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে বারোটি গোত্রের বারোজন নেতা বাছাই করিয়া দেওয়া হয়। হযরত উবাদা (রা) ছিলেন 'বনী আওফ' গোত্রের নকীব। ইহাই আকাবার দ্বিতীয় শপথ।

আলোচ্য শপথ বাণীতে মোট ছয়টি দফার উল্লেখ করা হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) মদীনায় যে ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইতেছিলেন এই ছয়টি দফা উহার বুনিয়াদী নীতি বিশেষ। ইহাতে প্রথমত আল্লাহ্র একত্ব স্বীকার করা ও কোন দিক দিয়াই আল্লাহ্র সহিত অপর কোন জিনিসই শরীক না করার কথা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাই ইসলামের প্রথম ও মূল কথা। ইসলামী জীবন দর্শনের প্রথম ও ভিত্তিগত কথা ইহাই। ইহারই উপর কায়েম হয় ইসলামী জিন্দেগীর বিরাট প্রাসাদ।

দ্বিতীয়ত, 'তোমরা চুরি করিবে না।' চুরি করা ইসলামী আইন বিধানে এক গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ। শরীয়তের ভাষায় ইহা কবীরা গুনাহ। ইসলামী সমাজে এই চুরি ও পরস্বাপহরণের কোন অবকাশ নেই। বস্তুত যে পরের মাল চুরি করিয়া নিতে পারে, সে আল্লাহ্র হক কাড়িয়া লইয়া অপর যে কোন সত্ত্বাকে দিয়া শির্কের মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত হইতে পারে।

তৃতীয়ত, 'জ্বিনা বা ব্যভিচার করিবে না', জ্বিনা-ব্যভিচারও ইসলামী আদালতে মারাত্মক ফৌজদারী অপরাধ। ইহা যেমন অপরের অধিকার হরণ তেমনি পরের ইজ্জত-আবরু

বিনষ্টকারীও বটে। ইহা দ্বারা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কলুষতার বিষ সংক্রমিত হইয়া পড়ে। এই অপরাধ কোন এক পক্ষের অমতে জবরদস্তি করিয়া কিংবা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে হইলেও ইহা কঠোর দণ্ডযোগ্য এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

চতুর্থত, 'তোমাদের সন্তানদের হত্যা করিবে না।' সন্তান হত্যা করার আরব জাতির মধ্যে সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হইয়াছিল। এই জঘন্য হত্যাকার্যে কেবল কন্যা সন্তানরা বলি হইত না পুত্র সন্তানকেও অনুরূপ নির্মমভাবে হত্যা করা হইত। ইহা ছিল মানবতার তথা মানব বংশের নিরাপত্তার পক্ষে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। ইহা বন্ধ করা ছিল ইসলামের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার প্রথম পর্যায়ের কাজ।

পঞ্চমত, 'কাহারো উপর মিথ্যা-মিথ্যি ও সামনা-সামনি গুরুতর দোষ আরোপ করিবে না'। মিথ্যা-মিথ্যি বড় বড় গুনাহের কাজের দোষ কাহারো মাথায় চাপাইয়া দেওয়া আরবদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। ইহার ফলে সমাজ ছিল তিক্ত ও জর্জরিত। ইসলামী সমাজে ইহার কোনই স্থান থাকিতে পারে না।

ষষ্ঠত, 'ন্যায়সঙ্গত কাজে নবীর নির্দেশ অমান্য করিবে না'। নবী করীম (স) যে সমাজ তৈয়ার করিতে যাইতেছিলেন তাহাতে নেতার আনুগত্য করা ছিল এক অপরিহার্য দায়িত্ব। কিন্তু তদানীন্তন আরব জাতি ছিল বিক্ষিপ্ত, অসংগঠিত। নেতার আনুগত্য বলিতে কোন জিনিস সেখানে ছিল না বা তাহারা এই সম্পর্কে কিছু জানিত না ও বুঝিত না। এই জন্য প্রথম শপথেই এই সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা একান্তই জরুরী ছিল। কিন্তু নবী করীম (স) 'বিনাশর্তে নেতার আনুগত্য করার' অন্ধত্বকে কখনো চালু করিতে পারেন না। এই জন্যই নেতার নাফরমানী না করার প্রতিশ্রুতিতে স্পষ্ট ভাষায় মারুফ শব্দের শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত নবী করীম (স) নেতার আনুগত্য করার যে পদ্ধতি চালু করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা শর্তহীন আনুগত্য নয়, তাহা মা'রুফ শর্তের অধীন। অর্থাৎ কোন নেতাই শর্তহীন আনুগত্যের দাবি করিতে পারে না। তাহাকে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ করিতে হইবে এবং তাহাতেই সে আনুগত্য পাইতে পারে সাধারণ মানুষের নিকট। অন্যথায় সাধারণ লোক কোন পাপ বা অন্যায় কাজে নেতার আনুগত্য করিতে বাধ্য নয়, না তাহা করা সঙ্গত হইতে পারে।

মা'রুফ কাহাকে বলে? এই সম্পর্কে আল্লামা বায়যাভী বলিয়াছেন ঃ

اَلْمَعْرُوْفُ مَاعُرِفَ مِنَ الشَّارِعِ حُسْنُهُ -

মা'রুফ তাহা, যাহার ভাল হওয়ার কথা শরীয়তদাতার নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

'নিহায়া' গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ

هُوَاسْمُ جَامِعٌ لِكُلِّ مَاعُرِفَ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِحْسَانِ اِلَى النَّاسِ وَكُلُّ مَانَدَبَ اِلَيْهِ الشَّرْعُ وَنَهٰى عَنْهُ مِنَ الْمُحْسَنَاتِ وَالْمُقْبِحَاتِ -

ইহা এক ব্যাপক নাম, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও জনগণের কল্যাণমূলক প্রত্যেক কাজ, আর যে সব ভাল কাজকে শরীয়ত সমর্থন করিয়াছে ও যে সব খারাপ কাজকে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে, এমন সব কাজই ইহার মধ্যে শামিল। অর্থাৎ 'খারাপ ও নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকা ও ভাল কাজ করা মা'রুফ'।

যদিও রাসূলের আনুগত্য শর্তহীনভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতিদাতাদের মনে পবিত্র তওহীদী প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য এইখানে এই শর্তের উল্লেখ

করা হইয়াছে। প্রকারান্তরে এই কথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রাসূল মা'রুফ ছাড়া আর কোন আদেশ করেন না। দ্বিতীয়, আল্লামা শারকাভীর ভাষায় ঃ

تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ طَاعَةُ مَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

এ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া যে, আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া কাহারো হুকুম পালন করা জায়েয নয়।

এই সম্পর্কে এই হাদীসে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হাদীসের শেষাংশের এই ছয় দফা ভিত্তিক শপথ পালন করা ও না করার পরিণাম সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ এই শপথ গ্রহণ করা হইতেছে এই উদ্দেশ্যে যে, ইহা যথাযথভাবে পালন করা হইবে। কাজেই যে তাহা পালন করিবে, এই শপথের উপর মজবুতীর সহিত অটল হইয়া থাকিবে, সে ইহার পুরস্কার পাইবে। আর সে পুরস্কার দান হইবে আল্লাহ্র উপর বর্তিত কাজ। আল্লাহ তাহাকে নিশ্চয়ই পুরস্কার দান করিবেন।

কিন্তু যদি কেহ ইহার কোন একটি শর্তেরও খিলাফ করে, তবে তাহার দুইটি অবস্থা হইতে পারে। প্রথমত, সে উহার কারণে ধৃত হইয়া ইসলামী আদালতে নীত হইতে পারে এবং তাহাকে জ্বিনা, চুরি, নরহত্যা ও মিথ্যা দোষারোপের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। এই দণ্ডভোগ করিলে ইহা তাহার পরকালীন শাস্তির জন্য কাফ্ফারা হইবে। আর যদি সে ধরা না পড়ে তবে তাহার সম্পর্কে বিচার ফয়সালা করা এবং শাস্তি দেওয়া না-দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার।

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, অপরাধীর শাস্তি দান করিতে আল্লাহ্ তা'আলা বাধ্য নন। আর এই কারণে কোন অনুগত বান্দাকে সওয়াব দান করাও আল্লাহ্র উপর মূলত ওয়াজিব নয়। আর হাদীসে এই ব্যাপারটি যখন সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপর বর্তানো হইয়াছে, তখন এই কথাও জানা গেল যে, কোন লোক যদি কবীরা গুনাহ করিয়া তওবা করার পূর্বেই মরিয়া যায় তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাকে মাফ করিয়া প্রথমেই বেহেশতে দাখিল করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া শাস্তি দিতেও পারেন, সেখান হইতে বেহেশতে পৌঁছাইতেও পারেন। এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণত আল্লাহ্র উপর সোপর্দ।

হাদীসটি ইহাও প্রমাণ করে যে, অপরাধের দণ্ডদান পরকালের আযাব হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়। হযরত আলী (রা) হইতে ইহার সমর্থনে নিম্নোক্ত কথাটি বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَصَابَ ذَنْبًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِىْ الدُّنْيَا فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يُّثْنِىَ بِالْعُقُوْبَةِ عَلٰى عَبْدِهٖ فِىْ الْاٰخِرَةِ -

কেহ যদি কোন গুনাহ করে এবং সেইজন্য দুনিয়ায়ই সে দণ্ডিত হয়, তবে পরকালেও আল্লাহ তাহার বান্দার উপর দ্বিতীয়বার আযাব দিবেন ইহা— হইতে তিনি উর্ধ্বে।

اِنَّ قَتْلَ الْقَاتِلِ حَدٌّ وَّارْدَاعٌ لِغَيْرِهٖ وَاَمَّا فِىْ الْاٰخِرَةِ فَالطَّلَبُ لِلْمَقْتُوْلِ قَائِمٌ لِاَنَّهُ لَمْ يَصِلْ اِلَيْهِ حَقٌّ -

হত্যাকারীর হত্যা 'হদ্দ' অপরকে নরহত্যা হইতে বিরত রাখার ব্যবস্থা মাত্র। পরকালে তো নিহতের দাবি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকিবে। কেননা তাহার হত্যাকারীকে হত্যা করা হইয়া থাকিলেও সে নিজে তাহার হক পায় নাই।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন ঃ অনেক হাদীস হইতে জানা যায় যে, হত্যাকারীকে হত্যা করা হইলেই নিহিত ব্যক্তির হক আদায় হইয়া যায়। ইবনে হাব্বান বর্ণনা করিয়াছেন ঃ إِنَّ السَّيْفَ مَحَاءُ لِلْخَطَايَا—"তরবারী তাহার সব গুনাহ খাতা বিলীন করিয়া দেয়"। তাবারানী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَى كُلَّ شَيْءٍ "হত্যার অপরাধে হত্যাকারীকে হত্যা করা হইলে এই হত্যা তাহার সব গুনাহকেই মিটাইয়া ফেলে।" হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَايَمُرُّ الْقَتْلُ بِذَنْبٍ الاَّمَحَاهُ—হত্যার শাস্তিস্বরূপ হত্যা হইলে তাহা কোন গুনাহই অবশিষ্ট রাখে না উহাকে আমলনামা হইতে মুছিয়া ফেলে। কাযী ইয়ায বলিয়াছেনঃ অধিকাংশ মনীষীর মতে 'হদ্দ' (দণ্ডদান) কাফ্ফারার কাজ করে অর্থাৎ অপরাধের দণ্ড ভোগ করিলে গুনাহও মাফ হইয়া যায়।

হাদীসটির শিক্ষা

জাতীয় পুনর্গঠন ও নবতর জাতি গঠনের ব্যাপারে এই হাদীস এক অতুলনীয় মৌলিক শিক্ষা পেশ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে সমাজনেতা জনগণ— অন্য কথায় রাষ্ট্রপ্রধান ও নাগরিক সাধারণের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট নীতি পালন করার প্রতিশ্রুতি দান ও গ্রহণ অপরিহার্য। ইহা সমাজবিজ্ঞানের মূলকথা। নবী করীম (স) ইসলামী জাতি গঠনের সূচনায় আকাবার বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট এই শিক্ষাই উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ জনগণকে নির্দিষ্ট একটি আদর্শবাদের ভিত্তিতে পরিচালনা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে নেতা নির্বাচন আবশ্যক, যেন তাহারা সবসময় জনসাধারণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে ও প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দান করিতে পারে। নবী করীম (স) আকাবার সাধারণ বায়আত গ্রহণের পূর্বেই এই নেতা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাহাদের সংখ্যা ছিল বারো। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) এই নেতৃবৃন্দেরই একজন। সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাসূলের এই কাজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

তৃতীয়ত, নতুন জাতি গঠন কিংবা মৃত জাতির পুনর্গঠনের প্রথম পর্যায়ে যে মৌলিক বিষয়ে জনগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা দরকার, নবী করীম (স) এখানে সেই সব কয়টি বিষয়ের উপরই বায়আত গ্রহণ করিয়াছেন।

সুন্নাত ও বিদয়াত

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رض قَالَ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ

وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرٰى اخْتِلاَ فًا كَثِيْرًا وَاِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ - (ترمذى)

ইরবাদ ইবনে সারীয়া (রা) বলেন ঃ একদিন ফজরের নামাযের পর নবী করীম (স) অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী উপদেশ দান করেন, যাহার দরুন আমাদের চক্ষু অশ্রু প্লাবিত হইয়া গেল ও মন সাংঘাতিক রকমে কম্পিত হইল। একজন বলিলেন ঃ ইহা তো বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির মতোই উপদেশ দান। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদেরকে কি উপদেশ দেন ? রাসূল বলিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করিতে এবং শ্রবণ ও আনুগত্য করার উপদেশ দিতেছি, যদিও কোন হাবসী গোলাম তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যাহারা ভবিষ্যতে জীবিত থাকিবে তাহারা অসংখ্য ব্যাপারে মতভেদ দেখিতে পাইবে। এইরূপ অবস্থায় তোমাদেরকে বিদয়াত হইতে বাঁচিতে হইবে। কেননা তাহা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও গোমরাহী। তোমাদের যে কেহ এই যুগে পৌঁছিবে, তাহার পক্ষে আমার সুন্নাত ও হেদায়েত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাত দাঁত দ্বারা শক্ত করিয়া কামড়াইয়া ধরা অবশ্য কর্তব্য। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা হাদীসটি তিরমিযী শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার 'হসানুল সহীহুন' বলিয়া ইহার পরিচয় দিয়াছেন। আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ ও দারেমী শরীফেও এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। 'ইবনে মাজা' গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে ঃ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِىْ الاَّ هَالِكٌ - কথাটুকু অতিরিক্ত উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ আমি তোমাদেরকে উজ্জ্বলতম শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতেছি। ইহা রাত্র-দিনের মতই উজ্জ্বল। যে ধ্বংস হইতে চায়, কেবল সেই ব্যক্তিই ইহা হইতে বাকা পথ অবলম্বন করিতে পারে। মুসনাদে আহমদ ও আবূ দাউদ শরীফে উল্লেখিত হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে ঃ "প্রত্যেক নতুন কথাই বিদয়াত এবং প্রত্যেকে বিদয়াতই সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা।"

হাদীসটিতে নবী করীম (স)-এর উপদেশ উল্লেখিত হওয়ায় ইহার গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে মুসলিম উম্মতকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের বাণী শোননো হইয়াছে। আর এই বিদায়ী পয়গাম দেওয়া হইয়াছে সেই নবী কর্তৃক, যাহার পর আর কোন নবী আসিবার নয়। এক কথায় এই অসিয়ত— এই উপদেশই হইতেছে রাসূলে করীম (স)-এর সর্বশেষ বাণী।

নিজের একক প্রচেষ্টায় গঠিত জাতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে নবী (স)-এর মনে এই আশংকার উদ্রেক হইয়াছিল যে, ইহাকে কোন দিক দিয়াই যেন বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি স্পর্শ করিতে না পারে। এই জন্য যে সব চোরাপথ দিয়া বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া তিনি আশংকাবোধ করিয়াছিলেন, সেই সেই পথ চিরতরে বন্ধ করার জন্য তিনি আগাম উপদেশ ও হেদায়েত দান করিয়াছেন। এই হাদীসে প্রদত্ত হেদায়েত বিশেষভাবে তাকওয়া, শ্রবণ ও আনুগত্যকরণ এবং সুন্নত অনুসরণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার ফলে বিপর্যয় ও

বিভ্রান্তির সকল পথ স্বতঃই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কয়টি কথার বিপরীত দিক হইতেছে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর পথ। আর তাহা হইতেছে আল্লাহকে ভয় না করা, ইসলামী সমাজের সামগ্রিক নিয়ম লংঘন করা ও বিদয়াতের কাজ করা।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (স)-এর এই বিদায় উপদেশ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। এতদসত্ত্বেও উম্মত যদি বিভ্রান্ত হইয়া যায়, তবে তাহার পূর্ণ দায়িত্ব হইতেছে উম্মতের নিজের, এই ব্যাপারে রাসূল (স)-এর কোন ত্রুটিই থাকে নাই। তিনি বিদায় গ্রহণের পূর্বে যাহা কিছু দিবার ছিল, তাহা পুরাপুরিভাবে জাতিকে দান করিয়া গিয়াছেন। বস্তুত তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রাখিয়া যান নাই।

পরন্তু রাসূলের উম্মত যদি কখনো গোমরাহ হইয়া যায়, তবে রাসূল (স)-এর এই শেষ ও বিদায়ী-উপদেশের আলোতে ও ইহারই ভিত্তিতে উহার পনর্গঠনের কাজও অতি সহজেই সম্পন্ন করা যাইতে পারে। আর ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, রাসূল (স)-এর গঠিত উম্মতের পুনর্গঠনের কাজে এই উপদেশে উল্লিখিত ভিত্তি ছাড়া আর কোন পথেই করা সম্ভব নয়।

অতঃপর এক-একটি বিশষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই।

তাকওয়া

'তাকওয়া' মূলত মানুষের একটি আভ্যন্তরীণ গুণ বিশেষ। মনের অবস্থা যখন মানুষকে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও অসন্তোষজনক কাজ হইতে বিরত থাকিতে উদ্বুদ্ধ করে, ঠিক সেই অবস্থাকেই বলা হয় 'তাকওয়া'। এই গুণ যাহার মনে ফুটিয়া উঠিবে, উহার আলোক-প্রভা সমগ্র জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেই। কিন্তু ইহা বর্তমান না থাকিলে বাহ্যিক তাকওয়া যতই পরিলক্ষিত হইবে, তাহা আনুষ্ঠানিকমাত্র— তাহা অন্তসারশূন্য। এইরূপ তাকওয়া না আল্লাহ্‌র হক রক্ষা করিতে পারে, না পারে বান্দার হক রক্ষা করিতে। নবী করীম (স) ইতিপূর্বে উল্লেখিত এক হাদীসে এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন ঃ 'তাকওয়া এইখানে'। এই বলিয়া তিনি তাঁহার বক্ষদেশ দেখাইয়া দেন।

মনের আভ্যন্তরীণ এই গুণ যখন দুর্বল হয়, ম্লান হইয়া আসে, তখন আমলের দিকে বিপর্যয় শুরু হইয়া যায়। আর এই উম্মতের বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হওয়ার প্রকৃত কারণ ইহাই। কাজেই উহার সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য এই গুণটি আল্লাহকে ভয় করার পবিত্র ভাবধারা সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। ইহাই জাতির মৃতদেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবে।

শ্রবণ ও আনুগত্য করা

ইহার অর্থ শাসক ও নেতৃস্থানীয়দের সকল কথা ও হুকুম-আইন কবুল করার মনোভাব লইয়া শ্রবণ করা ও তাহা মানিয়া চলা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা। এখানে বিশেষভাবে ইসলামের সমাজ শৃংখলার আনুগত্য করা, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত আনুগত্য ও শৃঙ্খলাকে পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করার কথাই বলা হইয়াছে। এই জামা'আতী শৃঙ্খলে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে উহার সংশোধন করিতে চেষ্টিত হইতে হইবে।

উহা ভঙ্গ ও লংঘন করা কিংবা উহা ছিন্ন করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করা জায়েয নয়। কিন্তু উহাতে যদি মৌলিক বিপর্যয় দেখা দেয় তবে ইসলামেরই কারণে উহার বাধ্যবাধকতা নির্বিচারে মানিয়া চলাও যুক্তিসঙ্গত নয়।

বলা হইয়াছে ঃ "কোন হাবসী গোলাম তোমাদের আমীর নিযুক্ত হইলেও"— ইহার অর্থ এই যে, তোমাদের আমীরকে যদি তোমরা এই কারণে অপছন্দ কর যে, সে এককালে ক্রীতদাস ছিল কিংবা সে দাস বংশজাত লোক; কিন্তু অধিকাংশ লোকের মতানুকূল্যে তাহাকে আমীর নির্বাচিত করা হইয়া থাকিলে এবং সে কুরআন সুন্নাত মুতাবিক তোমাদের পরিচাল ও শাসন করিতে থাকিলে তাহার আনুগত্য করা সকলের প্রতিই ফরয। এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, আরব অভিজাতদের উপর হাবসী গোলামকে আমীর নিযুক্ত করা শরীয়ত বিরোধী নয়। বরং এই ব্যবস্থাই বর্ণ-বংশ, ভাষা ও ভৌগলিক আঞ্চলিকতার সকল প্রবার বিভেদ ও বিদ্বেষ গৌরবের মূল উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে।

সমাজ জীবনের মূল কথা হইতেছে শৃঙ্খলা ও আনুগত্য। শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আদর্শ মানিয়া চলার প্রবণতা। এই প্রবণতা যখন সঠিক রূপ পরিগ্রহণ করে ঠিক তখনই সমাজের সকল ফয়সালা ও নির্দেশ কার্যকর হইতে পারে। আর এইরূপেই সমাজ মজবুত বুনিয়াদে স্থাপিত হইতে পারে, অক্ষুণ্ন হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যে সমাজ এই গুণদ্বয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে উহার নিঃশেষ ধ্বংস হইয়া যাইতে ততটুকু বিলম্ব হইতে পারে, যতটুকু বিলম্ব হয় সমুদ্র কিনারের সেই প্রাসাদটি ধ্বসিয়া পড়িতে, যাহার তলদেশ পানির স্রোতে ধুইয়া গিয়াছে।

খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাত

হাদীসে "হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাত" শক্ত করিয়া ধরিতে বলা হইয়াছে। এখানে খলীফাদের দুইটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি হইতেছে তাহাদের রাশেদ হওয়ার গুণ আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, 'হিদায়াতপ্রাপ্ত' হওয়ার কথা। অন্য কথায়, যে সব খলীফা ঈমান ও ইসলামের সুপ্রশস্ত রাজপথে অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে চলে এবং সকল প্রকার কাজ সূক্ষ জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি সহকারে রাসূল (স)-এর উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।

'খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাত' বলিতে বুঝানো হইয়াছে তাহাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় কাজ। এই সব কাজ তাহারা যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে, তাহা যেহেতু কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের ভিত্তিতে হইবে, এইজন্য তাহা সুন্নাতে রাসূলেরই বাস্তব ব্যাখ্যা ও রূপের মর্যাদাসম্পন্ন হইবে। বস্তুত কুরআন ও সুন্নাতে যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক মূলনীতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বাস্তব রূপায়ণের অনেকভাগ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল রাসূলের পরবর্তী খলিফাদের উপর, আর তাহাদের দ্বারা তাহা বাস্তবিকই রূপায়িত হইয়াছে, উহার কোন একটি দিকও অবাস্তব থাকিয়া যায় নাই। এইজন্য রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী ফেতনা ও বিপর্যয়কালে মুসলিম জাতিকে পুনর্গঠনের জন্য তাহাই হতে পারে উজ্জ্বল আদর্শ। যখনই এই ব্যাপারে কোন মতভেদ সৃষ্টি হইবে, তখন হেদায়েতপ্রাপ্ত

ও ইসলামের পথে দৃঢ়তা ও দূরদৃষ্টি সহকারে চলিত খলীফাদের আদর্শানুযায়ী কাজ করাই উম্মতের লোকদের কর্তব্য। এই ব্যাপারে পারস্পরিক সকল মতভেদ পরিহার করিয়া তাহাদেরই রীতিনীতি ও শাসন-পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত অকুণ্ঠিত হৃদয়ে।

কিন্তু এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, খুলাফায়ে রাশেদুনের নিজস্ব কোন কথা স্বতঃই দলীল হইতে পারে না। আল্লামা শাওকানী তাঁহার রচিত 'ইরশাদুল ফুসুল' গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

বিদয়াত

'বিদয়াত' অর্থ এমন কোন পথ বা কাজকে শরীয়ত সম্মত বলিয়া মানিয়া লওয়া, যাহা বাস্তবিকই শরীয়তের কোন দলীলের উপর ভিত্তিশীল নয়। বিদয়াত ও ইজতিহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। নতুন কোন্ ব্যাপার বা বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলে শরীয়তের দৃষ্টিতে উহার মর্যাদা কি হইবে, উহার সম্পর্কে কোন রীতিনীতি অবলম্বন করা উচিত তাহা ইজতিহাদের সাহায্যেই ঠিক করা হয় ও এই উপায়ে সেই সম্পর্কে কোন ফয়সালা গ্রহণ করা। কিন্তু বিদয়াতের ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দেওয়া ও সেই সম্পর্কে শরীয়তের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে লোকদের মনের কামনা ও ঝোকপ্রবণতা অনুযায়ী শরীয়ত সম্মত নয় এমন কাজ করাকেই বিদয়াত বলা হয়। কুরআন মজীদে ইহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছে 'রাহবানিয়াত'। সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থী রীতিনীতি অনুযায়ী কৃচ্ছ্রসাধনা করা দুনিয়ার হালাল জিনিসও পরিহার করিয়া চলা এবং ঘরের নিভৃত কোণ কিংবা নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদিকেই 'রাহবানিয়াত' বলা হইয়াছে। ইহার পরিণাম হইতেছে মন হইতে আদর্শভিত্তিক বিপ্লবী ভাবধারা ও কর্মতৎপরতা পরিহার এবং বহির্মুখিতা, বিশ্বজয় ও আন্দোলনমূলক কার্যকলাপ ভুলিয়া ইয়াতীম, মিসকীন ও নেহায়েত নিরীহ হইয়া কালাতিপাত করা। দুনিয়া-সমাজের সার্বিক কর্তৃত্ব ফাসিক-ফাজির ও আল্লাহ্‌র দুশমনের হস্তে তুলিয়া নেক লোকদের নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব হইয়া থাকাও পরিষ্কার বিদয়াত। কেননা কুরআন, সুন্নাত ও ইসলামের মৌলিক ভাবধারার ইহা সম্পূর্ণ বিপুরীত জিনিস। আলোচ্য হাদীসে বিশেষভাবে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, তাহযীব, তমদ্দুন ও সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিদয়াত সম্পর্কেই সাবধান করা হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে যে, খিলাফতকে 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজত্বে পরিণত করা, কুরআন ও সুন্নাতের মুলনীতি আইন-কানুন বাদ দিয়া ইচ্ছামত শাসন কার্য পরিচালনা করা, উত্তরাধিকার নীতি অনুযায়ী সম্পত্তির বন্টন না করা, সুদ-জুয়ার প্রচলন করা, ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার হরণ করা, মানুষের মধ্যে বর্ণ-বংশ-অর্থ পরিমান ইত্যাদির ভিত্তিতে পার্থক্য করা এই সবকিছুই বিদয়াত। মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ ভিতি সৃষ্টির অনুকূল সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচলন না করা, নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ, নৃত্য-গীত-অভিনয়, বংশরোধ ইত্যাদিও বড় বড় বিদয়াত সন্দেহ নাই। কবর-পূজা, আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারো জন্য মানত মানা, তাহার নিকট বিপদে সাহায্য বা কোন জিনিস প্রার্থনা করা যে বিদয়াত, তাহা তো সর্বজনস্বীকৃত। বিদয়াত সম্পর্কে রাসূল (স) বলিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ নূতন, বাহির হইতে আমদানী করা ও শরীয়তের ভিত্তিহীন জিনিস এবং উহার পরিণাম সুস্পষ্ট গোমরাহী— এই জিনিসগুলির পরিণামও পরিষ্কার ভ্রষ্টতা— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, বিদয়াতকে 'হাসানা' ও সাইয়্যেরা' নামে ভাগ করার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। বিশেষত পূর্ববর্ণিত ব্যাখ্যা ও আলোচনার দৃষ্টিতে উহার শ্রেণী বন্টন একেবারেই অর্থহীন। হাদীস যখন সুস্পষ্ট ভাষায় 'সকল বিদয়াতকেই ভ্রষ্টতা' বলিয়াছে, তখন কিছু সংখ্যক বিদয়াতকে উহার আওতা বহির্ভূত মনে করা ধৃষ্টতা ও শরীয়তের বিকৃতকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বিদয়াতের সংজ্ঞা দিয়াছেন এইরূপ ঃ 'বিদয়াত' অর্থ নূতন কথার সৃষ্টি করা, যাহার কোন মূলই বর্তমান নাই। যাহার মূলে শরীয়তের কোন দলীল রহিয়াছে, তাহা বিদয়াত নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদয়াত অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত জিনিস।

ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - (بخارى، مسلم)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নূতন জিনিস আনয়ন করিবে, যাহা আসলে উহার মধ্যে নয়, তবে তাহা প্রত্যাহারযোগ্য। — বুখারী, মুসলিম।

ব্যাখ্যা হাদীসে উল্লেখিত আমর اَمْرٌ শব্দের অর্থ দ্বীন-ইসলাম। হাদীসের মোটামুটি অর্থ নিম্নরূপঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ الْاِسْلَامِ رَاْيًا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَنَدٌ ظَاهِرٌ اَوْ خَفِىٌّ مَلْفُوْظٌ اَوْ مُسْتَنْبِطٌ مَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ - (قاله القاضى فِىْ الشفاء)

যে ব্যক্তি ইসলামে এমন কোন মত আবিষ্কার করিবে, যাহার কুরআন ও সুন্নাতে কোন সুস্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা কথিত বা ইজতিহাদের সাহায্যে বাহির করা কোন সনদ নাই, তাহা প্রত্যাহৃত হইবে। — ফিকাহ

এখানে اَمْرٌ শব্দের উপরিউক্ত রূপ পরিচয় হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ প্রকাশিত ও প্রমাণিত। এমনভাবে যে, তাহা কোন দৃষ্টিমানের চোখ হইতে গোপন থাকিতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا - (مائده - ٣)

আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করিয়া দিলাম। তোমাদের প্রতি আমাদের নিয়ামত সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন— জীবন ব্যবস্থা— হিসাবে পছন্দ করিলাম।

এখন যদি কেহ উহার কোন অতিরিক্ত ও বাহিরের সম্পর্কহীন জিনিস চাপাইয়া দেয় এবং তাহাও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত জিনিস বলিয়া প্রচার করে, তবে তাহা আল্লাহ্র নিকট কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না, সম্ভব নয় উহার প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা। কেননা মূলত

দ্বীন-ইসলাম তো এক পূর্ণ ও পরিণত জিনিস, ইহাতে কোন জিনিসের বৃদ্ধি করিতে চাহিলে তাহা নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক হইবে। বিশেষত সম্পূর্ণ ইসলামকে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া ইহাকে অপমান করা হইবে।

আলোচ্য হাদীসে কুরআন ও সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং উহাতে উহার বিরোধী— উহার মূল ব্যবস্থাপনা ও ভাবধারার সহিত খাপ খায় না এমন কোন জিনিসকেই বরদাশত না করার নির্দেশ দিতেছে।

প্রসঙ্গত এই কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে খালেস নিয়তে ইজতিহাদ করা হইলে এবং এই ধরনের ইজতিহাদের সাহায্যে কোন কথা প্রমাণ করা হইলে তাহা এই পর্যায়ে পড়িবে না, তাহা প্রত্যাহৃত হইবে না, বরং কুরআন হাদীস অনুযায়ী আমল করিতে হইলে এই ধরনের ইজতিহাদ গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। কেননা ইজতিহাদ করিয়া যাহা বলা হইল, তাহা কুরআন হাদীসের বিরোধী বা বিপরীত কিছু নয় এবং উহা কুরআন হাদীস উপস্থাপিত বিস্তারিত জীবন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যশীল। তাহা বিদয়াত নয়। বিদয়াত হইতেছে তাহা যাহা ইসলামের মৌলিক ভাবধারার সহিত কিছুমাত্র খাপ খায় না।

হাদীসের গুরুত্ব

عَنِ الْمِقْدَادِبْنِ مَعْدِى كَرَبَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اِنِّى اُوْتِيْتُ الْكِتَابُ وَمِثْلُهُ مَعَهٗ اَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ - (ابوداؤد)

হযরত মিকদাদ ইবনে মাদী কারাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হযরত রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; রাসূলের করীম (স) বলিয়াছেন ঃ জানিয়া রাখ, আমাকে কুরআন মজীদ দেওয়া হইয়াছে এবং উহার সহিত অনুরূপ আর এক জিনিস। সাবধান থাকিও, সম্ভবত এক ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্ত হইয়া নিজ আসনে বসিয়া বলিতে থাকিবে যে, তোমরা কেবল এই কুরআন মজীদই ধারণ কর, উহাতে যাহা হালাল দেখিতে পাও, তাহাকেই হালাল মনে কর, আর উহাতে যাহা হারাম জানিতে পার, তাহাকেই হারাম বলিয়া মনে কর। — আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ইসলামী শরীয়তের উৎস নির্ধারণের ব্যাপারে এই হাদীসটির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক উপস্থাপিত শরীয়ত দুইটি উৎস হইতে চিরদিন গৃহীত হইবে। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদ আর অপরটি রাসূলের হাদীস বা সুন্নাহ। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কোন কার্যকারিতা হইতে পারে না। এই ব্যাপারে কোন দিন যেন মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় এবং লোকেরা যেন হাদীস বা সুন্নাহকে বাদ দিয়া কেবল কুরআনের উপর নির্ভর করিতে শুরু না করে, সেই উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম (স) অত্র হাদীসে দুইটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন ঃ لا اِنِّى اُوْتِيْتُ الْكِتَابُ وَمِثْلُهُ مَعَهٗ —মনে রাখিও, আমাকে আল্লাহ্‌র কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার সহিত উহারই মতো আরো একটি জিনিস।"

ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেন ঃ এই বাক্যাংশের দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি এই যে ঃ

انَّهُ أُوْتِىَ مِنَ الْوَحِىِّ الْبَاطِنِ غَيْرِ الْمَتْلُوِّ مِثْلُ مَاأُعْطِى مِنَ الظَّاهِرِ الْمَتْلُوِّ -

রাসূলের করীম (স) গোপন ও গায়র মতলূ ওহীর সূত্রে তেমনি একটি জিনিস প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেমন তাহাকে দেওয়া হইয়াছে প্রকাশ্য মতলূ ওহীর সূত্রে।

অর্থাৎ রাসূল (স)-এর প্রতি দুই প্রকারের ওহী নাযিল হইয়াছে। এক প্রকারের ওহী যাহা তিলাওয়াতযোগ্য, যাহা প্রকাশ্য— এই সূত্রে তাহাকে কুরআন মজীদ দেওয়া হইয়াছে। আর দ্বিতীয় প্রকারের ওহী হইতেছে যাহা গোপন ও তিলাওয়াতযোগ্য নয়— এই সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের সমষ্টি হইতেছে হাদীস। কাজেই কুরআনের মতো হাদীসও মুসলমানদের মানিয়া চলা আবশ্যক। অন্যথায় রাসূল (স) কে সঠিকভাবে ও পূর্ণরূপে মান্য করা হয় না। আর ইহার দ্বিতীয় অর্থ হইতে পারে ঃ

انَّهُ أُوْتِىَ الْكِتَابُ وَحْيًا يُتْلٰى وَأُوْتِى مِنَ الْبَيَانِ -

রাসূল (স)-কে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এমন ওহীর সূত্রে যাহা তিলাওয়াত করা হয়— যায় এবং সেই সঙ্গে তাহাকে উহার ব্যাখ্যাও দান করা হইয়াছে।

অর্থাৎ তাঁহাকে কিতাব দেওয়ার পর কিতাবের যাবতীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা করার, বিশেষকে সাধারণ ও সাধারণকে বিশেষ পর্যায়ে নির্ধারণ করার, উহার উপর উহার পরিপূরক হিসাবে কোন কিছু বৃদ্ধি করার এবং কুরআনে উল্লেখ নাই— এমন বিষেয়ে শরীয়তের বিধান তৈয়ার করিবার অনুমতি ও ক্ষমতা তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইয়াছে। অতএব রাসূল (স) এই পর্যায়ে যে আদশেই দিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়া কুরআনের আদেশের মতোই ওয়াজিব এবং কুরআনের মতোই তদনুযায়ী আমল করা মুসলিমদের জন্য কর্তব্য।

হাদীসের শেষাংশে রাসূলে করীম (স)-এর এই কাজের বিরোধিতা সম্পর্কে তিনি আর একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। বলিয়াছেন ঃ সম্ভবত একজন স্বচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্ত ব্যক্তি তাহার আসনে বসিয়া কেবল কুরআনকে ধারণ করিয়া চলিতে, উহার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করিতে বলিবে ও সুন্নাতকে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিবে। হাদীসে উক্ত رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلٰى أَرِيْكَتِه বলিতে বুঝানো হইয়াছে ইমাম খাত্তাবীর ভাষায় ঃ

أَصْحَابُ التُّرْفَةِ وَالدَّعَةِ الَّذِيْنَ لَزِمُوْا الْبُيُوْتَ وَلَمْ يَطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَمْ يَغْدُوْا وَلَمْ يَرُوْحُوْا فِىْ طَلَبِهِ فِىْ مَظَانِّهِ وَاقْتِبَاسِهِ مَنْ أَهْلِهِ - (معالم السنن ج ٤ - ص ٢٩٨)

যেসব লোক সুখী বিলাসী, যাহারা ঘরের বাহির হয় না এবং যোগ্য লোকদের নিকট সকাল-সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়া কিছুমাত্র ইলম হাসিল করে না।

বস্তুত হাদীস বা সুন্নাত সম্পর্কে যাহারা আদৌ জ্ঞান লাভ করে নাই, যোগ্য লোকদের নিকট উহার অধ্যয়ন করে নাই, তাহারা হাদীসের গুরুত্ব আদৌ বুঝিতে পারে না; আর যাহারা অধিকতর সুখী ও বিলাসী জীবন যাপন করে, তাহারা এই কারণেও হাদীসের বিরোধিতা করিতে পারে যে, হাদীস যেহেতু কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা, কুরআনী হুকুম পালনের বাস্তব নিয়ম প্রদর্শনকারী, তাই হাদীস গ্রহণ করিলে কুরআনের স্বেচ্ছামূলক ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকিবে না

বরং এক ধরাবাধা নিয়ম অনুসারেই সব কাজ আঞ্জাম দিতে হইবে। আর তাহা এই সব বিলাসী সুখী লোকদের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার।

হাদীসে বিগত তেরো চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাসে প্রমাণ করে যে, রাসূল (স)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী একান্তই সত্য। হাদীসের বিরোধিতা সবযুগেই কেবল উপরিউক্ত পরিচয়ের ব্যক্তিরাই করিয়াছে, অন্য কেহ নয়।

জাতীয় উত্থান ও পতন ভিত্তি

عَنْ عَمْرِ وابْنِ شُعَيْبٍ رض عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَوَّلُ صَلَاحِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ وَاَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَلْاَمَلُ -

আমর ইবনে শু'য়াইব (রা) তাঁহার পিতা, তাঁহার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এই জাতির প্রথম কল্যাণ ও পূণ্যময় গুণ হইতেছে ইয়াকীন ও যুহদ; আর এই উম্মতের প্রথম বিপর্যয় ও ধ্বংসের চিহ্ন হইতেছে কৃপণতা ও দীর্ঘায়ু লাভের বাসনা। — বায়হাকী

ব্যাখ্যা জাতীয় উত্থানের নিয়ম এবং উহার ভিত্তির মৌলিক দর্শন এই সংক্ষিপ্ত হাদীসে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমত, মুসলিম জাতিকে এখানে নবী করীম (স) উম্মত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জাতি (Nation) ও উম্মত শব্দদ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক বিদ্যমান। এক ভৌগলিক অঞ্চল ও একটি রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী এক বর্ণ, বংশ ও এক ভাষাভাষী লোক একটি জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমান এই ধরনের কোন জাতি নয়। আসলে তাহারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর একটি আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত জনসমষ্টি। কাজেই মুসলিকে জাতির (Nation) পরিবর্তে উম্মত বলাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য মুসলিম জাতীয়তার এই ভিত্তিগত স্বাতন্ত্র্য অন্যান্যদের সহিত উহার মৌলিক পার্থক্য সম্মুখে রাখিয়া মুসলমানকে 'জাতি' বলা ভুল হইবে না।

দ্বিতীয়ত, রাসূলে করীম (স) এই মুসলিম জাতির কল্যাণ, উত্থান ও উৎকর্ষ লাভের প্রথম বুনিয়াদ হিসাবে দুইটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি 'ইয়াকীন' আর দ্বিতীয়টি 'যুহদ'।

ইয়াকীন يَقِيْنٌ বলিতে বুঝায় এমন এক প্রকারের জ্ঞান, যাহাতে শোবাহ্ সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই; উপরন্তু তাহা সাধারণ জ্ঞান ও জানার উর্ধ্বে এক দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ জ্ঞান। আল্লামা রাগিব ইসফাহানী বলিয়াছেন ঃ

هُوَ صِفَةُ الْعِلْمِ فَوْقَ الْمَعْرِفَةِ وَالدِّرَايَةِ - (المفردات)

ইহা এক প্রকার জ্ঞান, যাহা সাধারণ জ্ঞান ও ধারণা-বুদ্ধির উর্ধ্বে।

আল্লামা জাওহারী লিখিয়াছেন ঃ

اَلْيَقِيْنُ الْعِلْمُ وَزَوَالُ الشَّكِّ

কোন বিষয়ে জানা ও সন্দেহ-সংশয়মুক্ত হওয়া।

আল্লামা নফসী ও অন্যান্য মণীষিগণ বলিয়াছেন ঃ

انَّهُ الْعِلْمُ الَّذِىْ لَايَحْتَمِلُ النَّقِيْضُ -

ইহা এমন ইলম, যাহার বিপরীত কিছু হওয়া সম্ভব নয়। (ঐ)

হাদীসে ব্যাখ্যাকারীদের মতে আলোচ্য হাদীসে 'ইয়াকীন' অর্থ এই নিগূঢ় তত্ত্ব গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জানিয়া লওয়া যে, এই দুনিয়ায় যে যাহা লাভ করে, যাহার উপর যাহা লাভ কিংবা খারাপ অবস্থা আসিয়া পড়ে, তাহা সবই আল্লাহ্র নিকট হইতে এবং আল্লাহ্র ফয়সালা অনুযায়ীই হইয়া থাকে।

আর 'যুহদ' زهد; অর্থ দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট না হওয়া, উহার ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ না করা।

বস্তুত এই দুইটি গুণ সাধারণভাবে কোন জাতির মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকিলে তাহারা এক আদর্শ চরিত্রবান দিগ্বিজয়ী জাতিতে পরিণত হইতে পারে। সকল প্রকার নীচতা, হীনতা ও কলুষতা হইতেও মুক্ত হইয়া বীরদর্পে তাহারা জীবন পথে পদক্ষেপ করিতে পারে। পারে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র পথে জান-মাল, সময়-সামর্থ্য সব কিছু উৎসর্গ করিতে এবং কোন প্রকার কৃপণতা ও লোভ তাহাদেরকে এই পথে চলিতে বাধাগ্রস্ত করিতে পারে না। আর এই গুণ অর্জিত হইলে সকল ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে অকুণ্ঠিত চিত্তে ঝাঁপাইয়া পড়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কাজেই বলা যায়, কি ব্যক্তি, কি জাতি— উম্মত, সকল প্রকার উন্নতি ও উৎকর্ষতার মূল চাবিকাঠিই হইতেছে এই দুইটি গুণ।

কিন্তু সাধারণ মানুষ— বিশেষভাবে মুসলিম জাতি— যখন এই গুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে দুনিয়ার ক্ষুদ্র শক্তির মানুষ ধন-অস্ত্র ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে; যদি মনে করিতে শুরু করে যে, বিপদে পড়িলে অমুক ব্যক্তি বা শক্তি আমাকে সাহায্য করিবে, আমার বিপুল ধন-সম্পত্তি আমাকে উদ্ধার করিবে, তবে সে দুর্বলমনা কাপুরুষ হইয়া যাইতে বাধ্য। যদি কেহ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য জীবন-প্রাণ কুরবান করিতে রাজি না হয়; বরং দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকার জন্য আকুল হইয়া পড়ে, তবে সে হইবে ভীত বিহ্বল ব্যক্তি। সে কোন দিন— তাহার দ্বারা কোন বিরাট জাতীয় উথানমূলক কাজ সম্পন্ন হওয়াও সম্ভবপর হইবে না

রাসূলে করীম (স)-এর এই বাণীর আসল উদ্দেশ্য হইতেছে মুসলিম উম্মতকে বিশেষ হেদায়েত দান এবং এই কথা জানাইয়া দেওয়া যে, জাতীয় কল্যাণ ও উত্থান লাভ করিতে হইলে নিজেদের মধ্যে ইয়াকীন দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ আল্লাহ্র ভরসা এবং দুনিয়ার জাঁকজমক ও আনন্দ স্ফূর্তির প্রতি অনাসক্তির গুণ অবশ্যই অর্জন করিতে হইবে। আর যতদিন এই গুণে গুণান্বিত থাকিবে ততদিন তোমাদের কিছুমাত্র পতন হইতে পারিবে না। পতন হইবে তখন, যখন এই গুণ হইতে জাতি বঞ্চিত হইয়া যাইবে।

বৈরাগ্যবাদ নয়— আল্লাহ্র উপর দৃঢ় প্রত্যয়

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا بِاِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لَّاتَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ

مِمَّا فِيْ يَدَيِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُوْنَ فِيْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ اِذَا اَنْتَ اُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ فِيْهَا لَوْاَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ -

(ترمذی، ابن ماجه)

হযরত আবূযর গিফারী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ দুনিয়ার ব্যাপারে হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করিয়া লওয়া ও নিজের ধন-মাল বিনষ্ট করা 'যুহদ' বা বৈরাগ্য নয়। বরং দুনিয়ার প্রকৃত যুহদ এবং উহার সঠিক মানদণ্ড হইতেছে এই যে, তোমার নিকট বা তোমার আয়ত্তে যাহা কিছু আছে তদপেক্ষা অধিক ভরসা ও নির্ভরতা গ্রহণ করিবে সেই জিনিসের উপর যাহা আল্লাহ্‌র নিকট ও আল্লাহ্‌র কব্জায় রহিয়াছে। উপরন্তু তোমার উপর যখন কোন কষ্ট বা বিপদের কারণ ঘটিবে, তখন উহার পরকালীন সওয়াব ও লাভ উহার প্রতি আগ্রহ তোমার মনে অধিকতর প্রবল হইবে— উহা তোমার প্রতি সঙ্ঘটিত না হওয়ার কামনা ও বাসনা অপেক্ষাও বেশি।

— তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা 'যুহদ' বা পরহেজগারী সম্পর্কে বর্তমানে মুসলিম সমাজে সম্পূর্ণ গায়র ইসলামী ধারণা প্রভাবশীল হইয়া রহিয়াছে। দুনিয়ার হালাল জিনিসসমূহকে নিজের প্রতি হারাম মনে করা— হারাম মনে করিয়া উহার ভোগ-ব্যবহার না করাকেই বর্তমানে পরহেজগারী মনে করা হইতেছে। দুনিয়ার নিয়ামত, আরাম-সুখের উপকরণ বিধিসঙ্গত স্বাদ-আস্বাদনকে পর্যন্ত নিজের উপর হারাম মনে করা হয়। ফলে না কখনও কোন স্বাদের জিনিস গ্রহণ করে, না শীতল পানি পান করে, না ভাল ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে, না নরম শর্য্যায় বিশ্রাম করে; কোথাও হইতে এমন কিছু জিনিস আসিয়া গেলেও তাহা পরিহার করিয়া চলে। বস্তুত ইহা ইসলামী আদর্শ মুতাবিক পরহেজগারী নয়, ইহাকে 'হিন্দুয়ানী ও বেদান্তবাদী বৈরাগ্যবাদ' বলা যাইতে পারে। নবী করীম (স) আলোচ্য হাদীসে পরহেজগারী সম্পর্কিত এই ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিবাদ করিয়াছেন— ইহা যে ভুল ধারণা, সঠিক ধারণা নয়, তাহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন।

রাসূলের করীম (স) এই কথার সারমর্ম এই যে, আল্লাহই সারেজাহানের এবং উহার যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর একচ্ছত্র মালিক, মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে আল্লাহ্‌র একান্ত দাস ও বান্দা হিসাবে। কাজেই প্রকৃত মালিক ও প্রভু মানুষের জন্য যাহা কিছু হালাল করিয়াছেন— তাহা যাহাই হউক না কেন— তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে ও আগ্রহান্বিত মনে গ্রহণ করাই বান্দার কর্তব্য। পরহেজগারীর নামে তাহা ত্যাগ করিলে ও নিজের উপর তাহা হারাম করিয়া লইলে প্রকৃত পরহেজগারী হইতে পারে না। যুহদ ও পরহেজগারী হইতেছে ঈমানের একটি বিশেষ গুণ, আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্ট থাকিলেই এই গুণের বিকাশ সম্ভব। উহার বিপরীত ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করা কোন ক্রমেই সেই পরহেজগারী হইতে পারে না— যাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান।

কাজেই যে যাহা কিছু নিয়ামত লাভ করিয়াছে, তাহা লইয়াই মুগ্ধ বিমোহিত না হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আরো অনেক কিছু লাভ করার আশা পোষণ করা এবং নিজের আয়ত্তাধীন জিনিস অপেক্ষা আল্লাহ করায়ত্ত জিনিসের উপর অধিক ভরসা রাখাই হইতেছে, প্রকৃত পরহেজগারী। কেননা নিজের নিকট যাহা আছে তাহা আজ বাদে কাল শেষ হইয়া যাইবে, তাহার উপর প্রকৃতই কোন নির্ভরতা চলে না। বরং আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত অফুরন্ত গায়েবী ভাণ্ডার এবং তাহার বিশেষ অনুগ্রহের উপর অধিক ভরসা ও আস্থা রাখিতে হইবে।

ইসলামী পরহেজগারীর দ্বিতীয় মাপকাঠি এই যে, বান্দাহর উপর কোন অসুবিধা, অসুখ ও বিপদ আসিলে তাহাকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসা জিনিস মনে করিবে এবং উহাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে সহ্য করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট পরকালীন সওয়াব লাভের আশা পোষণ করিবে। এই ধারণা মনে স্থানও দিবে না যে, আহা! আমার এই বিপদ— এই অসুবিধা যদি না হইত। কেননা যাহা কিছু হইয়াছে তাহা আল্লাহ্‌র ফয়সালা মুতাবিকই হইয়াছে, তাহা হইতে নিজেকে দূরে রাখা সম্ভব নয়। এখন উহাকে তুমি আল্লাহ্‌র রহমত ও পরকালীন কল্যাণ লাভের উপায় হিসাবেও গ্রহণ করিতে পার আর এই ধারণা করিয়া মন খারাপ করিয়াও বসিতে পার যে, এই বিপদ কেন আসিল। তবে প্রথম প্রকার মনোভাব হওয়াই ঈমানদারীর ও পরহেজগারীর লক্ষণ। আর মানুষের মধ্যে এইরূপ মনোভাব হইতে পারে তখন, যখন মানুষ দুনিয়ার আয়েশ-আরামের তুলনায় পরকালের সুখ-শান্তির চিন্তা সর্বাধিক করিবে। আর ইহাই হইতেছে ইসলামী পরহেজগারীর মূল ভিত্তি।

তবে এই দুনিয়ায় সুখ-শান্তির পরিবর্তে দুঃখ-বিপদ ও অশান্তির কামনা করিতে হইবে, এমন ধারণাও যেন কাহারো মনে জাগ্রত না হয়। কেননা তাহা কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ। নবী করীম (স) সাহাবাগণকে সব সময় আল্লাহ্‌র কল্যাণ ও শান্তির জন্য দো'আ করিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন ঃ سَلُوا اللهَ العَافِيَةَ —আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণের জন্য দো'আ কর।

অতএব, হযরত আবূযর (রা) বর্ণিত অত্র হাদীসের লক্ষ্য এই নয় যে, মানুষ এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র নিকট দুঃখ-মুসীবত পাওয়ার জন্য দো'আ করিবে। বরং ইহার মূল লক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্‌র ফয়সালা অনুযায়ী বান্দা যখন কোন বিপদে পড়িয়া যায়, তখন পরহেজগারীর নীতিতে উহা বরদশাত করিয়া পরকালে সওয়াব ও কল্যাণ লাভের দিকেই অধিকতর মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এই কথাও মনে করা উচিত যে, এই বিপদ না আসিলে সে পরকালের এই সওয়াব লাভের আশা করিতে পারিত না।

এই পর্যায়ে আরও একটি হাদীস উল্লেখ্য ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিলেন ঃ হে আবদুল্লাহ, তুমি যে দিনভর রোযা থাক ও রাতভর ইবাদতে অতিবাহিত করিয়া দাও, সে খবর কি আমি পাই নাই বলিয়া মনে করিয়াছ? তখন আমি বলিলাম, হ্যাঁ, হে রাসূল! আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য। তখন তিনি বলিলেন ঃ না, তুমি এইরূপ করিবে না। তুমি রোযা রাখিবে, মাঝে-মধ্যে রাখিবেও না। রাত্রিকালে তুমি ইবাদত করিবে বটে, কিন্তু ঘুমাবেও অবশ্যই। কেননা তোমার দেহের সুনির্দিষ্ট হক রহিয়াছে তোমার উপর, তোমার চক্ষুরও হক রহিয়াছে তোমার উপর এবং তোমার জীবন-সঙ্গিনীরও হক রহিয়াছে তোমার উপর (আর এইসব হক তোমাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে)। — বুখারী

ব্যাখ্যা এই হাদীসটি হইতেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ দ্বীন হওয়ার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে। মানব সত্ত্বা মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তিনি নিজেই মানুষের জীবনে বাস্তবভাবে অনুসরণ করার জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়াছেন। মানুষের দেহ যেমন পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ, তাহার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনও অনুরূপভাবেই পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যপূর্ণ। মানুষের যেমন কর্তব্য রহিয়াছে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি, তেমনি সেই সৃষ্টিকর্তারই দেওয়া বিধান অনুযায়ী কর্তব্য রহিয়াছে তাহার নিজের প্রতি এবং পরিবেশের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোকদের প্রতিও। এই কর্তব্য পালনে ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এমন কোন পন্থা গ্রহণ করা হইলে— কেবলমাত্র একটি দিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইলে আল্লাহ্‌র দ্বীনকেই অমান্য করা হইবে। এইজন্যই মানুষকে যেমন দেহের দাবি পূরণ করিতে হইবে; দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দাবিও পূরণ করিতে হইবে; তেমনি স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিও কর্তব্য পালন করিতে হইবে। এবং কোন ক্ষেত্রেই ভারসাম্য নষ্ট করা চলিবে না। ইহাই নবীর শিক্ষা; ইহাই দ্বীন-ইসলাম। ইহা যে আল্লাহ্‌র দ্বীন, ভারসাম্য উহার অকাট্য প্রমাণ। কেননা এইরূপ ভারসাম্যপূর্ণ দ্বীন রচনা করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

ভারসাম্যপূর্ণ দ্বীনদারী

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض يَقُولُ جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّيْ اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُ وَاَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ - (بخارى، مسلم)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে; তিনি বলিতেছিলেন যে, তিনজন সাহাবী নবী করীম (স)-এর ইবাদত-বন্দেগীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য নবীর বেগমদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদেরকে যখন এই সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া হইল, তখন সম্ভবত তাঁহারা রাসূলের ইবাদত-বন্দেগী খুবই কম মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন ঃ কোথায় আমরা আর কোথায় আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ তো তাঁহার আগে- পরের সব গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের একজন বলিলেন ঃ আমি তো সারারাত ধরিয়া নামায পড়িতে থাকিব (এবং রাত্রে একটুও ঘুমাইব না— বিশ্রাম করিব না), দ্বিতীয়জন বলিলেন ঃ আমি সব সময়ই রোযা রাখিব এবং একদিনও রোযা ভাঙ্গিব না। তৃতীয়জন বলিলেন ঃ আমি স্ত্রীদের হইতে একেবারে দূরে সরিয়া থাকিব, বিবাহ করিব না। নবী করীম (স) (এই সব কথা জানিতে পারিয়া) তাঁহাদের নিকট

আসিলেন। তিনি বলিলেন ঃ তোমরাই কি এইসব কথা বলিতেছিলে ?— আল্লাহ্‌র শপথ, আমিই কি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আল্লাহ ভীরু নই, আমি কি আল্লাহ্‌র নাফরমানীকে তোমাদের অপেক্ষাও অধিক ভয় করিয়া চলি না ? কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখ, আমি রোযা রাখি, আবার ভাঙ্গিও। আমি নামাযও পড়ি, আবার ঘুমাই, বিশ্রামও করি। স্ত্রীদের (সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করার পরিবর্তে) আমি বিবাহও করি আর ইহাই হইতেছে আমার নীতি— আমার আদর্শ। কাজেই যে আমার নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিবে না, আমার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই।

ব্যাখ্যা ইবাদত-বন্দেগী ইসলামী জীবন-আদর্শের মূল কথা। উহা যথাযথভাবে পালন করা ও উহাতে মনকে ডুবাইয়া দেওয়ার ফলেই মানুষের মন পরিশুদ্ধি লাভ করে, বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। উপরন্তু যে বান্দা যত বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগী হইবে, তাহার মন আল্লাহ্‌র সহিত যতখানি সম্পর্কশীল হইবে, আল্লাহ্‌র ভয় ও ভালবাসা তাহার মনে ততখানি গভীরভাবে দৃঢ়মূল হইবে। আর যে এই ব্যাপারে যতখানি দুর্বল ও অমনোযোগী হইবে, সে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ততখানি দূরে থাকিয়া যাইবে। এই কারণে যত বেশি এইদিকে মনোযোগী হওয়া যায়, বান্দার পক্ষে ততই মঙ্গল, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও ইহার অপর দিকটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না। তাহা এই যে, ইসলাম এক স্বভাবসম্মত ও চূড়ান্তভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের কোন এক ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা এবং তাহার ফলে এই ভারসাম্য বিনষ্ট করাকে ইসলাম পছন্দ করিতে পারে না। কাজেই ইবাদত বন্দেগীতে এতদূর মশগুল হওয়া, যাহার ফলে দেহ ও মনের স্বভাবসম্মত দাবি ও তাগিদ অপূর্ণ থাকিয়া যায় কিংবা সামাজিক জীবনের গ্রন্থি চূর্ণ হয়, তাহা কখনই আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় হইতে পারে না। এইরূপ নীতি ইসলামে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। ইসলামের পরিভাষায় ইহাকে বলা হইয়াছে 'রাহবানীয়াত'— বৈরাগ্যবাদ— সন্ন্যাস ধর্ম এবং কুরআন মজীদে স্পষ্ট বলা হইয়াছে ঃ

رَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَاكَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ -

বৈরাগ্যবাদ— ইহা তাহারা নিজেরা নূতনভাবে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে, আমরা ইহা তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া দেই নাই। — সূরা আল-হাদীদ ঃ ২৭

নবী করীম (স) ইহাকে 'নিজের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَاتُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ -

তোমরা নিজেদের প্রতি কঠোরতা ও কৃচ্ছ সাধনা অবলম্বন করিও না। যদি কর, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদের উপর কঠোরতা করিবেন।

আল্লামা ইমাম রাগিব ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

اَلرُّهْبَانِيَّةُ غُلُوٌّ فِىْ تَحَمُّلِ التَّعَبُّدِ مِنْ فَرْطِ الرُّهْبَةِ -

অত্যধিক ভয়ের দরুন ইবাদত পালনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করাকেই 'রাহবানীয়াত' বলা হয়। —মুফরাদাতে রাগিব ঃ ২০৩ পৃ.

আল্লামা মাহমূদ ইবনে উমর যামাখশারী বলিয়াছেন ঃ

> দুনিয়া ত্যাগী পাদ্রী-পুরোহিতদের নীতিকেই রাহবানীয়াত বা বৈরাগ্যবাদ বলা হয়। অবিরামভাবে রোযা রাখা, চট পরিধান করা, গোশত না খাওয়া ইত্যাদিই রাহবানীয়াত।
>
> — গারীবুল হাদীস, আল ফায়িক, খণ্ড ১, পৃ. ২৬৯

এই বৈরাগ্যবাদ ইসলামে কেবল পরিত্যাজ্যই নয়, ইহা ইসলামের উৎসাদন— মূলোৎপাটন। ইসলামে ইবাদত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ইহার প্রতি অমনোযোগিতা কিংবা স্বল্প মনোযোগী হওয়াও মারাত্মক; কিন্তু তাই বলিয়া ইসলাম নিছক কোন ইবাদতের ধর্ম নয়। ইসলাম তো মানুষের সমগ্র জীবন সম্পর্কে বিধি-বিধান দেয়। ঈমান ও ইবাদতের উপর ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টি জীবন— তথা সামগ্রিক জীবনের ইমারত রচনা করে। এমতাবস্থায় যে লোক কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হইয়া থাকে, দ্বীনের অপরাপর হুকুম-আহকাম এবং ব্যক্তিক ও সামগ্রিক দাবি-দাওয়া যথাযথরূপে আদায় করিতে প্রস্তুত না হয় কিংবা আনুষ্ঠানিক ইবাদতে অধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে ঐ সবের প্রতি কম গুরুত্ব আরোপ করে, সে নবীগণের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা— জীবন সম্পর্কে গোটা স্কীমকেও অকেজো করিয়া দেয়। সে তাহার অর্থই বুঝিতে পারে না। সে তখন নবীগণের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ না করিয়া স্বকপোলকল্পিত বিধান পালন করিতে শুরু করে।

বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের সেই পরিকল্পনাই শুদ্ধ, নির্ভুল ও আল্লাহ্র মনোনীত, যাহাতে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়াও জীবনের অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকরূপে পালন করা হয়, কেবল একদিকের হক আদায় করা হয় না, সকল দিকের প্রতি পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহাই আল্লাহ্র কিতাবসম্মত, ইহাই আখিরী নবীর উপস্থাপিত ও নিজ জীবনে অনুসৃত আদর্শ। এই জন্যই তিনজন সাহাবী তাহা বুঝিতে না পারিয়া নবী করীম (স)-এর ইবাদতের তুলনায় নিজেদের ইবাদতকে কম মাত্রার মনে করিয়াছিলেন এবং নবী করীম (স) এইজন্যই তাঁহাদের ধারণাকে ভুল বলিয়া প্রত্যাহার ও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্র প্রতি অধিক ভীত-সন্ত্রস্ত হইলেই সারারাত নামায পড়িতে হইবে, আর প্রত্যেক দিন রোযা রাখিতে হইবে এমন কোন কথাই নাই এবং আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকিতে গিয়া নিজ-বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গেও সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হইবে, তাহাও কিছুমাত্র যুক্তিসঙ্গত কথা নয়।

বর্তমান সময়েও ইসলাম সম্পর্কে উক্তরূপ বৈরাগ্যবাদী ধারণা অনেক লোকের মধ্যে বিদ্যমান। তাহাদের ধারণা-ভ্রান্তি আলোচ্য হাদীস ও তৎসঙ্গের আলোচনা হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

এই হাদীসের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসটিও পাঠ করা দরকার ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَهُمْ اَمَرَهُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُوْنَ قَالُوْا اِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ فَيَغْضِبُ حَتّٰى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا - (بخارى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স) যখন সাহাবীদিগকে (ইসলামী আমলের জন্য) আদেশ করিতেন, তখন কেবল ততটুকু কাজেরই আদেশ করিতেন, যাহা তাহারা (সহজেই) সম্পন্ন করিতে পারিতেন। (ইহা দেখিয়া) সাহাবিগণ বলিতেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা তো আপনার মতোই নই, আল্লাহ আপনার পূর্ব ও পরের সকল গুনাহই মাফ করিয়া দিয়াছেন। (ইহা শুনিয়া) রাসূলে করীম (স) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাইতেন, এমনকি তাঁহার এই ক্রোধ তাঁহার মুখমণ্ডল হইতেও প্রকাশিত হইত। তাহার পর তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ ভীরু ও আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী তো আমিই। — বুখারী

অর্থাৎ রাসূলে করীম (স) অধিক আল্লাহভীরু ও আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হইয়াও আল্লাহ্‌র বিধানকে বাদ দিয়া মনগড়াভাবে কোন বৈরাগ্যবাদী নীতি রচনা করেন নাই এবং দুনিয়ার সকল দায়িত্ব ও দাবি-দাওয়া অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র ইবাদতকারী হওয়ার নীতিও গ্রহণ করেন নাই।

বস্তুত আল্লাহ সুবিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ দয়াবান ও পরম দয়াশীল। তিনি নবীগণের মাধ্যমে যে দ্বীন দুনিয়ার মানুষের জন্য নাযিল করিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত, ভারসাম্যপূর্ণ, মানবীয় স্বভাবের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এবং মানুষের শক্তির সামর্থ্যের মাত্রানুকূল। আল্লাহ মানুষের উপর এমন কাজের বোঝা কখনই চাপাইয়া দেন না, যাহা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত— এক দুর্বিসহ বোঝা। বরং আল্লাহ্‌র দ্বীন তো মানুষকে অজ্ঞ মূর্খ ধর্মনেতাদের মনগড়াভাবে চাপানো যুগান্তকালের অসংখ্য দুঃসহ বোঝা হইতে মুক্তি দান করিয়াছে। কোথাও এই বোঝা দ্বীনদারী বা ধর্ম পালনের নামে প্রচলিত ছিল, আর কোথাও ছিল আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যান-যপের মনোহর নামে। আল্লাহ্‌র নবী এই ধরনের সকল জিনিসকেই বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন। এখন যে ব্যক্তি দ্বীনদারীর নামে চরম ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার পথ অবলম্বন করিয়া জীবনকে সংকীর্ণ করিয়া তোলে, জীবনের গতিপথকে করে বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ, এইভাবে নিজেদের ও অন্য মানুষদের উপর শরীয়তের বাহিরের কতকগুলি জিনিস চাপাইয়া দেয়, তাহারা আর যাহাই করুক, রাসূলে করীম (স)-এর উপস্থাপিত দ্বীন পালন করে না। পালন করে নিজেদের বা নিজেদেরই মতো অন্য মানুষের মনগড়া ধর্ম।

ভাল আদর্শ সংস্থাপন

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَال جَاأُءَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوْفُ فَرَاى سُوْءَ حَالِهِمْ قَدْ اَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاس عَلَى الصَّدَقَة فَاَبْطَئُوْا عَنْهُ حَتّٰى رُئِى ذَالِكَ فِىْ وَجْهِهٖ قَالَ ثُمَّ اِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِّنْ وَرَقٍ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ ثُمَّ تَتَبَاعُوْا حَتّٰى عُرِفَ السُّرُوْرُ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَالُ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مَنْ سَنَّ فِىْ الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ كُتِبَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِىْ الْاِسْلَامِ سُنَّةً

سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ - (مسلم)

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ কিছু সংখ্যক আরব বেদুঈন একদা রাসূলে করীম (স)-এর খিদমতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গায়ে ছিল পশমের তৈরী মোটা কাপড়। তখন নবী করীম (স) তাহাদের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা দেখিতে পাইলেন, বুঝিতে পারিলেন, তাহারা কঠিনভাবে অভাবগ্রস্ত। তখন নবী করীম (স) লোকদেরকে তাহাদের অনুকূলে দান-খয়রাত করিবার জন্য উৎসাহ দান করিলেন। কিন্তু লোকেরা সে দিকে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল না। ফলে রাসূলে করীম (স)-এর মুখমণ্ডলের উপর অসন্তোষের চিহ্ন খুব স্পষ্টভাবে দেখা গেল। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন যে, অতঃপর একজন আনসার একটি রৌপ্যমুদ্রার থলি লইয়া আসিলেন। তাহার পর আর একজন আসিলেন। এইভাবে একের পর এক আসিতে লাগিলেন। ফলে রাসূল (স)-এর মুখমণ্ডলে আনন্দ এবং সন্তুষ্টি ফুটিয়া উঠিল। তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের কোন ভাল ও কল্যাণকর কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে— যে অনুযায়ী তাহার পরও লোকেরা কাজ করে— তাহার নাম সকল আমলকারীর মতোই পূণ্য লিখা হইবে; কিন্তু তাহাতে অন্যান্য আমলকারীর পূণ্য ফল কিছুমাত্র কম হইবে না। অনুরূপভাবে যে লোক ইসলামে কোন খারাপ কাজের প্রচলন করে— সেই ব্যক্তির নামে অন্য আমলকারীর মতোই পাপ লিখিত হইবে। কিন্তু তাহাতে অন্যদের পাপের পরিমাণ এক বিন্দু কম হইবে না। — মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসটি দীর্ঘ; ইহাতে মানব জীবনের জন্য এক সুন্দর আদর্শ ও কর্মপথ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত ইহাতে স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অভাবী লোক দেখিলেই তাহার অভাব বিদূরণের জন্য চেষ্টিত হইতেন। সম্ভব হইলে নিজেই তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিতেন, অন্যথায় সাহাবিগণকে সেই দিকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাঁহার সঙ্গী-সাথীদের প্রকৃতিও ইহা ইহাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যখনই রাসূলে করীম (স) তাহাদিগকে কোন নেক ও জনকল্যাণমূলক কাজের দিকে আহ্বান জানাইতেন, সাধারণত সাহাবায়ে কিরাম তখনই সেই কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। কখনো কখনো প্রথম দিক দিয়া ইহার ব্যতিক্রম হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহারা সেই কাজ না করিয়া পারিতেন না। এবং নবী করীম (স) প্রথম কিছুটা মনঃক্ষুন্ন হইলেও শেষ পর্যন্ত সাহাবাদের আত্মদান ও ত্যাগ দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইতেন এবং সেই সন্তুষ্টির আলো তাঁহার মুখমণ্ডলকে অধিকতর উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত করিয়া দিত।

হাদীসের শেষাংশে রাসূলে করীম (স) সমগ্র মানুষের জন্য এক স্থায়ী মূলনীতি পেশ করিয়াছেন। আর তাহা হইতেছে এই ঃ যে লোক ভাল কাজের প্রচলন করে আর লোকেরা তাহা দেখিয়া অনুরূপ কাজে লাগিয়া যায়, তাহার আমলনামায় সেই ভাল কাজ করার সওয়াব লিখিত হইবে কিন্তু অপর কাহারো সওয়াবের মাত্রা কাম করিয়া নয়। তেমনি, যে লোক মন্দ কাজের সূচনা করে, দুনিয়ায় যতদিন অনুরূপ মন্দ কাজ করা হইবে, তাহার পাপ তাহার

আমলনামায়ও লিখিত হইবে এবং তাহাতে অন্যান্য পাপকারীদের পাপের পরিমাণ কিছু কম হইবে না। অতএব কোন ভাল পরিনাম-আকাঙ্খী ব্যক্তিই দুনিয়ায় মন্দ কাজ করিয়া চিরদিনের তরে মন্দকাজের ভাগীদার হইতে রাজি হইতে পারে না। কোন নির্বোধ ব্যক্তি যদি তেমন হয়, তবে কিয়ামতের দিন সে তাহার আমলনামায় এতই পাপ দেখিতে পাইবে যে, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবে, এত পাপ আমি কখন করিলাম।

এই কারণেই নবী করীম (স) সব মুসলমানকেই ভাল কাজের উদোক্তা হইতে ও মন্দ বা পাপ কাজের উদ্যোক্তা না হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বলা হইয়াছে ঃ

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ وَالدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلِهٖ -

ভাল কাজের পথ-প্রদর্শক ভাল কাজকারীর মতোই সওয়াবের দাবিদার, আর মন্দ কাজের পথ-প্রদর্শক মন্দ কাজকারীর মতোই অপরাধী।

এই জন্য আরো নসিহত করা হইয়াছে এই বলিয়া ঃ

كُنْ مِفْتَاحٌ لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقٌ لِلشَّرِّ -

কল্যাণের উদ্যোক্তা ও অন্যায়ের প্রতিবন্ধক হও।

এই মূলনীতিই ইসলামী আদর্শবাদী সমাজকর্মীদের চিরন্তন আদর্শ।

ঈমান নষ্টকারী কাজ ও চরিত্র

عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ رض عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْاِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ - (بيهقى)

বহয ইবনে হাকীম (রা) তাঁহার পিতা হইতে তাঁহার দাদা মায়াবিয়া ইবনে হায়দা কুশাইরী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ নিশ্চয় ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে খারাপ করিয়া দেয়, যেমন 'ইলুয়া' মধুকে খারাপ করিয়া দেয়।

— বায়হাকী

ব্যাখ্যা প্রকৃত পক্ষে ক্রোধ ঈমান নষ্টকারী একটি জিনিস। মানুষ যখন ক্রোধান্ধ হয়, তখন সে দিশাহারা হইয়া যায়, আল্লাহ্র শরীয়তের আইন-কানুন সবই সে লংঘন করিয়া বসে। সে তখন এমন কাজ করিয়া বসে, যাহা দ্বারা তাহার দ্বীন ঈমান নষ্ট হইয়া যায় এবং আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তাহার কোনই সম্মান থাকে না। এই জন্য নবী করীম (স) ক্রোধ হইতে দূরে থাকার আদেশ দিয়াছেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে এই ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, একজন দায়িত্বশীল কর্মীর ক্রোধ ইসলামী আন্দোলনের অনেক ক্ষতি সাধন করিতে পারে। 'ইলুয়া' এমন এক প্রকারের দ্রব্য, যাহা মধুর মধ্যে পড়িলে মধু বিনষ্ট হইয়া যায়, উহার স্বাদ বিকৃত হয়, তেমনি ক্রোধও মানুষের ঈমান খারাপ করে। দৃষ্টান্তটি প্রণিধানযোগ্য।

জুলুমের সাহায্য করা ঈমানের পক্ষে মারাত্মক

عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ - (بيهقى، شعب الايمان)

আওস ইবনে শুরাহবিল (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জালিমের সঙ্গে তাহার সাহায্য ও সহযোগিতা এবং তাহাকে শক্তিশালী করার জন্য চলিল— এই অবস্থায় যে, সে জানে সেই ব্যক্তি জামিল, তবে সে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া গেল। — বায়াহাকী, শুআবে ঈমান

ব্যাখ্যা জুলুম করা ইসলামী আইনে পরিষ্কার হারাম, সব রকমের জুলুম বন্ধ করার জন্য কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যেখানে মুসলমান থাকিবে, সেখানে কোন প্রকার জুলুম, শোষণ ও নির্যাতন থাকিতে পারিবে না, ইহাই হইতেছে মুসলমানের পরিচয়। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি জুলুম বন্ধ করার পরিবর্তে জানিয়া-শুনিয়া জালিমের সাহায্য ও সহযোগিতা করে, জালিমের হস্ত মজবুত করে, জালিমকে আরো শক্তি যোগাইয়া দেয় যেন সে আরো বেশি করিয়া জুলুম করিতে পারে— তবে সেই ব্যক্তি কোন ক্রমেই ইসলামের সীমার মধ্যে থাকিতে পারে না। জালিমের সাহায্যকারীর এই অবস্থা হইলে জালিমের কি অবস্থা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

রাসূল (স)-এর এই সাবধান বাণীর উদ্দেশ্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। মানুষ অনেক সময় না বুঝিয়াও বেখেয়াল অবস্থায় জালিমের সাহায্যে লিপ্ত হয়, তাহাকে বুঝাইয়া দিলেও তাহার হুঁশ হয় না। ইহা তাহার পক্ষে খুবই মারাত্মক। অতএব এই ব্যাপারে সকলকেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

উপায়-উপাদানের পবিত্রতা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلَّا كَانَ زَادَهٗ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوا السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ وَلٰكِنْ يَمْحُوا السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيْثَ - (مسند احمد)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কেহ যদি হারাম মাল উপার্জন করে এবং তাহা হইতে দান-সদকা করে তবে তাহা কবুল করা হইবে এবং তাহার মাল সম্পদে বরকত দান করা হইবে— ইহা অসম্ভব। তাহার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত মাল-সম্পত্তি তাহার জন্য কেবল জাহান্নামের পাথেয়ই হইতে পারে (পরকালের সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভের বাহন হইতে পারে না)। বস্তুত আল্লাহ্র স্থায়ী নিয়ম এই যে, তিনি খারাপ জিনিস দ্বারা খারাপ জিনিস দূর করেন না;

উপরন্তু খারাবীকে ভাল জিনিস দ্বারাই দূর করিয়া থাকেন। ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, নাপাকী দ্বারা নাপাকী দূর হইতে পারে না। — মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে এই কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন কাজের কেবল উদ্দেশ্য সৎ হইলেই তাহা যথেষ্ট নয় বরং সেই সদুদ্দেশ্যে সম্পন্ন কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য যে পন্থা ও উপায় অবলম্বন করা হইবে এবং তাহাতে যে সব দ্রব্যসামগ্রী ও উপাদান লাগানো হইবে তাহাও নিঃসন্দেহে সৎ ও পবিত্র হইতে হইবে। নাপাক ও অসৎ পন্থায় এবং অপবিত্র উপাদান সামগ্রীর দ্বারা সৎ উদ্দেশ্য লাভ করার কোন আশাই করা সঙ্গত নয়। কেবল পাক উপায়েই সৎ উদ্দেশ্য হাসিল হইতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত কথাটি মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের জন্য একটি মূলনীতি বিশেষ- খারাপ জিনিস দ্বারা খারাপ জিনিস দূর করা যায় না, ভাল জিনিস দ্বারাই খারাপ জিনিস দূর করা যায় এবং নাপাকী দ্বারা নাপাকী দূর করিয়া পবিত্রতা লাভ করা যাইতে পারে না। এই মূলনীতি সমগ্র জীবন ও জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উপরন্তু ইহা একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। আপনার উদ্দেশ্য সৎ হইলে আপনাকে সেইজন্য উপায়-উপাদানও নিশ্চয়ই সৎ ও নির্মল গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা অসৎ ও নাপাক উপায়-উপাদান দ্বারা যদি সৎ উদ্দেশ্য হাসিল করিতে চান তবে আপনার গোটা উদ্দেশ্যটাই নাপাক হইয়া যাইবে।

অনুরূপভাবে আপনি যদি দান-খয়রাত করিয়া পরকালীন সওয়াব হাসিল করিতে চান, তবে আপনাকে নিশ্চয়ই সৎ পথে উপার্জিত অর্থ খরচ করিতে হইবে। হারাম পথে উপার্জিত অর্থ দান করিলে তাহাতে কোন সওয়াব হইতে পারে না। কেননা সওয়াব একটি পবিত্র জিনিস, ইহা অপবিত্র অর্থ দানে লাভ করা সম্ভব নয়, উপরন্তু হারাম মাল দান করিয়া সওয়াব লাভের আশা করা ধৃষ্টতা ও গুনাহের কাজ— সন্দেহ নাই। সমাজে সাধারণত উদ্দেশ্যের সৎ হওয়ার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়, উহার জন্য গৃহীত উপায়-উপাদানেরও যে পবিত্র হওয়া দরকার, সেই দিকে খুব কম ভ্রূক্ষেপ করা হয়। এই কারণেই আজ দুনিয়ার দুর্নীতি ও অসৎ কাজকর্মে ভরিয়া গিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (স)-এর এই ছোট আকারের বাণীটি অত্যন্ত মূল্যবান। মুসলিম জাতির পুনর্গঠনের ব্যাপারেও এই মূলনীতিরই প্রয়োগ হওয়া আবশ্যক।

ইলম অর্জনের আবশ্যকতা

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ –
(ابن ماجه)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয— অবশ্য কর্তব্য। আর অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে যে ইলম দান করে, সে যেন শুকরের গলায় স্বর্ণমুক্তা, হীরা, জহরতের মালা ঝুলায়। — ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা 'ইলম' অর্থ সমস্ত মূল বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন, অনুভূতি লাভ। 'ইলম' শব্দটি 'আলামত' হইতে নির্গত হইয়াছে। আর 'আলামত' মানে اَلدَّلَالَةُ ও اَلْإِشَارَةُ কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ বুঝানো, কোন জিনিসের দিকে ইঙ্গিত। আর 'আল-ইলম' (اَلْعِلْمُ) একটি পরিভাষা বিশেষ, ইহা হইতে ইসলাম সম্পর্কিত ইলম বুঝায় অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে সকল জরুরী জ্ঞান অর্জন। এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইলম' সন্ধান ও অর্জন করা সকল মুসলিমের জন্য কর্তব্য। কেননা ইসলাম সম্পর্কে জরুরী ইলম অর্জন না করিলে কোন লোকই ইসলাম পালন করিতে পারে না। ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না।

হাদীসের শেষাংশে ইলম দান করা সম্পর্কে একটি নীতিকথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, শুকরের গলায় যদি স্বর্ণ, হীরা ও মণিমুক্তা খচিত মালা পরাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাতে উহার অপমান ছাড়া আর কিছুই হয় না। কেননা শুকর উহার একবিন্দু মূল্য বুঝিতে পারে না। ঠিক অনুরূপ, যে লোক ইলম এর মূল্য বুঝে না, 'ইলম' শিক্ষা করিয়া উহার বিপরীত কাজ করে, সে ইলম-এর অপমান করে। এইজন্য যেখানে ইলমওয়ালা লোকদের এব্যাপারে বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে, সেখানে ইলম দান করার সময় যাহাকে ইহা দান করা হইতেছে, তাহার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কেও বিবেচনা করা কর্তব্য। এখানে কথার ধরন হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ইলম' বহু রকম ও প্রকারের রহিয়াছে এবং প্রত্যেক প্রকারের ইলম-এর জন্য বিশেষ ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন। সেই যোগ্যতা অনুপাতেই 'ইলম' বিতরণ করা উচিত— অন্যথায় জুলুম হইবে। আর নিকৃষ্টতম জন্তুকে উৎকৃষ্টতম অলংকার পরানো যেমন জুলুম, ইহাও তেমনি। এই ব্যাপারে সুষ্ঠ বিচার-বুদ্ধি জাগাইবার জন্যই হাদীসের এই কথাটি বলা হইয়াছে।

আলিমের মর্যাদা

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًى لِطَالِبِ

الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَادِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ -

(ترمذى)

হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি 'ইলম' সন্ধান করার উদ্দেশ্য পথ চলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য বেহেশতে যাইবার পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম সন্ধানীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাহাদের পাখা বিছাইয়া দেন। আলিমের জন্য আসমান-জমিনের সব অধিবাসীই আল্লাহ্র নিকট গুনাহ মাফীর জন্য দো'আ করে, এমন কি পানির ভিতরের মাছও। শুধুমাত্র ইবাদতকারী অপেক্ষা আলিম তত বেশি মর্যাদাবান, যত বেশি মর্যাদা পূর্ণিমা রাত্রের চন্দ্রের সমগ্র তারকার তুলনায়। আলিমগণ নবীদের ওয়ারিশ— উত্তরাধিকারী এবং নবীগণ কোন টাকা-পয়সা রাখিয়া যান নাই; তাহারা রাখিয়া গিয়াছেন শুধু ইলম। অতএব যে লোক এই ইলম গ্রহণ করিল, সে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করিল। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে প্রথমত, ইলম সন্ধান, অর্জন করার সম্মান ও মর্যাদার কথা বলা হইয়াছে এবং ইহা বুঝাইবার জন্যই ইলম সন্ধান – পথের পথিকের মর্যাদা বুঝানো হইয়াছে। এইজন্য তিনটি কথা বলা হইয়াছে। প্রথমত, ইলম সন্ধানের উদ্দেশ্যে যে লোক কোন পথ চলিবে, কোন দূরত্ব অতিক্রম করিবে; আল্লাহ্ তাহার জান্নাত গমনের পথ সুগম ও সহজ করিয়া দিবেন। অন্য কথায় ইলম অর্জন এমন একটি কাজ, যাহার ফলে জান্নাত গমন খুবই সহজ হইয়া যায়। কেননা জান্নাত লাভ নেক আমল করার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আর ইসলামী ইলম ব্যতীত নেক আমল সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়ত, ইলম সন্ধানকারীর জন্য ফেরেশতাগণ পাখা বিস্তার করিয়া দেন। ইহার অর্থ, আল্লাহ্র নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তাহাদের এই সন্তুষ্টির মূল কারণ হইতেছে ইলম অর্জন করিয়া নেক আমল করার উদ্দেশ্য থাকা। ফেরেশতাগণ যখন দেখিত পান যে, একটি লোক কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন ও নেক আমল করার উদ্দেশ্যে দ্বীন সম্পর্কিত ইলম হাসিল করার জন্যে শিক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াত করিতেছেন, তখন তাঁহারা সন্তুষ্ট না হইয়া পারেন না। এই সন্তুষ্টির ফলেই তাঁহারা শিক্ষার্থীর সকল প্রকার সাহায্য ও আনুকূল্য দান করিতে শুরু করেন। এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে, "ফেরেশতাগণ ইলম সন্ধানকারীর জন্য তাহাদের পক্ষ বিস্তার করিয়া দেন। পাখা বিস্তার করিয়া দেওয়ার অর্থই হইতেছে সকল প্রকার আনুকূল্য ও সাহায্য-সহযোগিতা দান।

শুধু তাহাই নয়, দ্বীন সম্পর্কিত ইলম যে লোক অর্জন করে, তাহার জন্য আসমান জমিনের সকল জীবই আল্লাহ্র নিকট গুনাহ মাফীর জন্য প্রার্থনা করে। কেননা দ্বীন শিখিয়া তদনুযায়ী যে লোক জীবন যাপন করে, সে গোটা সৃষ্টি লোকের সহিত আনুকূল্য করে। গোটা সৃষ্টিলোক

অণু-পরমাণু হইতে বিরাট বিরাট জীব-জন্তু পর্যন্ত সকলেই— আল্লাহ্র বিধান পালন করিয়া চলে। পার্থক্য এই যে, মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব ও বস্তু তাহা পালন করে অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘ বাধ্যবাধকতার বশবর্তী হইয়া। আর দ্বীন শিখিয়া মানুষ তাহা পালন করে জানিয়া-বুঝিয়া স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার ফলে। এই কারণে দ্বীন মুতাবিক জীবন যাপনকারীর সহিত গোটা সৃষ্টিলোকের আনুকূল্য ঘটে। উপরন্তু তাহার অর্জিত ইলম ও তদানুযায়ীর আমলের ফলে গোটা সৃষ্টিলোকের উপর আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হয়। ফেরেশতাদের পরে সমগ্র সৃষ্টিলোকের কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর পানির নীচে মাছেরও মাগফিরাত চাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া সমগ্র জন্তু-জানোয়ারের উল্লেখের সম্পূর্ণতা বিধান করা হইয়াছ। মাছের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাহাদেরই কারণে বৃষ্টিপাত হয় এবং সমস্ত কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে।

ইবাদত একটি নূর বিশেষ, যাহা আবেদের মূল সত্ত্বার সহিত সততসঙ্গী হইয়া থাকে, যেমন তারকাসমূহের নিজস্ব জ্যোতি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ইলমও একটি নূর; তাহা যেমন আলিমকে আলোকমণ্ডিত করে, তেমনই তাহা অপরকেও করে জ্যোতির্ময়। কিন্তু চন্দ্রের আলো যেহেতু সূর্য থেকে গৃহীত, তেমনি আলিমের ইলম রাসূলে করীম (স) হইতে গৃহীত। এইজন্য আলিমকেও চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

হাদীসটির শেষ অংশে মোট তিনটি কথা বলা হইয়াছে। প্রথম ঃ আবিদের তুলনায় আলিমের মর্যাদা বেশি। আবিদ সে, যে বেশি বেশি ইবাদত করে। আর আলিম, যে লোক দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও সমঝ পাইয়াছে। আবিদ লোক কেবল নিজের পরকালীন মুক্তির ব্যবস্থায়ই দিনরাত মশগুল থাকে। কিন্তু যে লোক দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে কেবল নিজের কল্যাণের ব্যবস্থাই করিতে পারে না, অন্য সব মানুষকেও সে কল্যাণ পথের সন্ধান দিতে পারে এবং তাহাই সে করে তাহার সাধ্যানুসারে। আলিম ও আবিদের মাঝে মর্যাদার দিক দিয়া যে পার্থক্য রহিয়াছে রাসূলের করীম (স) তাহা একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ আকাশে লক্ষ তারাকা ঝকমক করিতে থাকে; কিন্তু সে সবের মিলিত আলোকেও জগৎ অতখানি আলোকিত হইতে পারে না, যতখানি আলোকিত হয় পূর্ণিমার রাত্রিতে পূর্ণ চন্দ্রের বিশ্বপ্লাবী আলোকধারায়। কাজেই লক্ষ তারকার তুলনায় চন্দ্রের মর্যাদা অনেক বেশি। ঠিক এইরূপ লক্ষ আবিদের তুলনায় একজন আলিমের মর্যাদা অনেক বেশি।

দ্বিতীয়, আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিশ— উত্তরাধিকারী। নবীগণ দুনিয়ার প্রকৃত ইলম ও জ্ঞানের বাহক। তাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়া সে জ্ঞানের প্রকাশ ও প্রচার করেন এবং কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে উহাকে করেন প্রতিষ্ঠিত। আলিম তাঁহারাই যাহারা নবীগণের প্রচারিত এই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। নবীগণের অবর্তমানে আলিমগণই হন এই জ্ঞানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টার জন্য দায়িত্বশীল। কাজেই লক্ষ মুসলিমের তুলনায় একজন নবীর যেমন অধিক সম্মান ও মর্যাদা, অনুরূপভাবে লক্ষ আবিদের তুলনায় একজন আলিমের মর্যাদা অধিক। এই প্রসঙ্গে একথাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, নবীগণ দুনিয়ায় ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যায় না এবং আলিমগণ ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া নবীগণের উত্তরাধীকারী হন না। বরং তাঁহারা কেবলমাত্র নবীগণের প্রচারিত ইলম-এর উত্তরাধীকারী হইয়া থাকেন।

তৃতীয়, যে লোক নবীদের পরিত্যক্ত ইলম লাভ করে, সে-ই পূর্ণমাত্রার অংশ লাভ করিয়া থাকে, সে প্রকৃতই ভাগ্যবান। আর যে লোক এই ইলম লাভ করিতে পারে না, সে যদি বিপুল

ধন-সম্পত্তি লাভ করে তবুও তাহার মতো হতভাগ্য ও প্রকৃত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত আর কেহ নাই। হাদীসে উদ্ধৃত ভাষার দৃষ্টিতে এই কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, ইলম বলিতে কেবলমাত্র নবীদের নিকট হইতে গৃহীত ইলম বুঝায়। আর এই ইলমকেই ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় ইলমুশ শরীয়ত— শরীয়তের ইলম। বলা বাহুল্য, শরীয়তের মূল ইলম-এর সহিত উহার পরিপুরক এবং উহার সাহায্যকারী ইলমও শামিল রহিয়াছে এবং তাহা শিক্ষা করাও কর্তব্য, যেমন কর্তব্য মূল শরীয়তের ইলম শিক্ষা করা। আলিমদের যে উচ্চ মর্যাদার কথা আলোচ্য হাদীসে বলা হইয়াছে, তাহা যে কেবলমাত্র ইলমের কারণে— ইসলামের মর্যাদা দরুনই, তাহা নিঃসন্দেহ। কেননা ইলম এক বিশেষ গুণের নাম, যাহা কাহারো অর্জিত হইলে উহারই দরুন সেও মর্যাদাবান হয়। এই কারণে বলা হইয়াছে, আলিমদের মর্যাদা নবীদের মর্যাদা অনুরূপ, তবে পার্থক্য এই যে, নবীগণ আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে ইলম লাভ করেন আর আলিমগণ তাহা হইতে বঞ্চিত। অন্যথায় উভয়েরই ইলম তথা জ্ঞানের মূল উৎস হইতেছে ওহী।

কুরআনের আয়াত نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ —"আমি যাহাকে চাই, তাহার মর্যাদা উন্নীত করিয়া দেই"-এর তাৎপর্যই এই যে, এই মর্যাদার উন্নয়ন কেবল ইলমের সাহায্যে— ইলমের দরুনই হইয়া থাকে। অপরদিকে يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ —'তোমাদের মধ্যে ঈমানদার লোকদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা উন্নত ও উচ্চ করিয়া দেন' এই আয়াতাংশেও আলিমদের কথাই বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল ঃ

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاُوْتُوا الْعِلْمَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَقَطْ وَلَمْ يُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ فِيْ دِيْنِهِمْ اِذَا فَعَلُوْا مَاأُمِرُوْابِهٖ -

যে সব লোক কেবল ঈমানদার, ইলম কিছুই পায় নাই, তাহাদের তুলনায় দ্বীনের ক্ষেত্রে সেইসব লোকের সম্মান ও মর্যাদা অধিক, যাহারা ঈমান ও ইলম উভয় গুণেই বিভূষিত— অবশ্য যদি তাহারা আল্লাহ্র আদেশ যথাযথরূপে পালন করে।

আলিমগণকে 'নবীদের ওয়ারিশ' বলার তাৎপর্য ইহাও যে, আলিমদের নিকট দ্বীন-ইসলামের ঠিক সেই ইলমই রহিয়াছে, যাহা আছে নবীদের নিকট এবং নবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যাহা, নবীদের পরে আলিমদের কর্তব্য ও দায়িত্বও ঠিক তাহাই। সেই কর্তব্য পালনে প্রস্তুত না হইলে— যত বড় বিদ্যার জাহাজই হউক না কেন, তাহাকে কোনক্রমেই আলিম বলা যাইতে পারে না। কুরআনের আয়াত ঃ

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

যাহারা জানে আর যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান হইতে পারে ?

এখানে সেই সব দিয়ানতদার আলিমের কথাই বলা হইয়াছে, যাহারা ইলম অনুযায়ী আমল করে। জানে না তাহারাও, যাহারা জানিয়াও তদনুযায়ী আমল করে না। অন্য কথায়, ইলম ও মুর্খতা যেমন সমান হইতে পারে না, তেমনি আলিম ও জাহিল সমান মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে না। তাহা হইলে যে জানিয়াও আমল করে না, সে তো মূর্খের চাইতেও নিকৃষ্ট।

ইলম গোপন করা পাপ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (مسند احمد، ابوداود، ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে লোক কোন জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে, সে যদি উহা গোপন রাখে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহার মুখের উপর আগুনের লাগাম পরাইয়া দিবেন। — মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা এই হাদীসে ইলম-এর প্রকাশ ও প্রচার করার গুরুত্ব এবং উহার প্রকাশ না করার ক্ষতি ও মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে আলিমগণকে হুঁশিয়ার করা হইয়াছে। হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য এই যে, ইলম গোপন করা কঠিন গুনাহের কাজ। কেহ যদি কোন বিষয়ের ইলম লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহার স্বতঃই কর্তব্য হয় উহার প্রচার ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা, সেই জন্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করা। যদি তাহা না করে, তবে সে যেমন ইলম-এর সঠিক মর্যাদা বুঝিল না, তেমনি ইলম লাভ হইলে যে স্বাভাবিক দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাহাও সে পালন করিল না। বস্তুত ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যই হয় উহাকে প্রচার ও প্রকাশ করা এবং লোকদিগকে প্রকৃত সত্যের দিকে আহ্বান জানানো। কিন্তু ইলম গোপনকারী তাহা আদৌ বুঝিতে পারে না।

আলিম ব্যক্তিকে যদি কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, কেহ তাহার নিকট কোন বিষয় জানিতে চাহে আর সে যদি সে বিষয়ে জ্ঞানী ও ইলমসম্পন্ন হইয়াও তাহাকে সে বিষয়ে অবহিত না করে, তাহা হইলে সে ইলম গোপন করার অপরাধে অপরাধী হয়। আর ইলম গোপন করার অপরাধের শাস্তি এই যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহার মুখের উপর আগুনের লাগাম পরাইয়া দিবেন। কেননা, এই মুখ দিয়া দুনিয়ায় ইলম প্রচার করাই ছিল তাহার কর্তব্য। কিন্তু সে এই কর্তব্য পালন করে নাই। এই জন্যই তাহাকে এই কঠোর শাস্তি দান করা হইবে। লাগাম পরানোর কথাটি দৃষ্টান্তমূলক। কেননা লাগাম লাগানো হয় জানোয়ারের মুখে। যে লোক ইলম গোপন করিল, সে যেন ঠিক নিজেকে জন্তু-জানোয়ারের পর্যায়ে নামাইয়া দিল। আর জন্তুর মুখে লাগাম পরাইলে উহার মুখ যেমন কোন কাজ করিতে পারে না, ইলম গোপনকারী ব্যক্তিও নিজের মুখকে সত্য প্রচারের কাজ হইতে তেমনি বন্ধ করিয়া রাখে। আগুনের লাগাম উহার অনিবার্য শাস্তি। ইলম প্রচার আলিমদের নিকট হইতে আল্লাহ্র গৃহীত এক প্রতিশ্রুতি। ইলম গোপন করিলে এই প্রতিশ্রুতিই ভঙ্গ হইয়া যায়, ইহার বরখেলাফ কাজ করা হয়।

সকল কল্যাণের মূল ইলম

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ -

(مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যাহাকে কল্যাণ দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনি দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সমঝ দান করেন। — মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা বুখারী শরীফে এই হাদীসটি হযরত মুআবিয়া (রা)-এর বর্ণনা হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে উপরিউক্ত কথাটুকুর পরে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নলিখিত উক্তি রহিয়াছে ঃ

وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ - (بخارى)

এবং আমি বন্টন ও বিতরণকারী মাত্র, আসল দাতা তো আল্লাহ তা'আলা। আর এই উম্মত যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে বিরত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধবাদিগণ তাহাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফয়সালা আসিয়া পৌঁছায়।

'ফিকাহ' অর্থ اَلتَّوَصُّلُ اِلٰى عِلْمٍ غَائِبٍ بِعِلْمٍ شَاهِدٍ প্রত্যক্ষ ও অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত ইলম লাভ করা। আর পরিভাষায় শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত ইলমকে বলা হয় 'ফিকাহ'। ইহার শাব্দিক অর্থ সমঝ, হৃদয়ঙ্গম করা, মূলতত্ত্ব ও সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারা।

দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। যে লোক দ্বীন সম্বন্ধে সঠিক সমঝ লাভ করিয়াছে, তাহার মতো সৌভাগ্যবান আর কেহ নাই। এই সৌভাগ্য যদিও মানুষের চেষ্টা ও সাধনা সাপেক্ষ; কিন্তু মূলত ইহা আল্লাহ্র দান। আর আল্লাহ তা'আলা এই দান তাহার প্রতিই করিয়া থাকে, যাহাকে বিশেষ কল্যাণ দান করা তাঁহার ইচ্ছা হয়। দ্বীন সম্বন্ধে এই সমঝই হইতেছে সকল প্রকার জ্ঞান ও বিদ্যার মূল কথা এবং ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে অফুরন্ত কল্যাণ ও জীবনের সার্থকতা।

বুখারী বর্ণিত অতিরিক্ত অংশে দ্বীন সম্পর্কিত ইলম-এর ক্ষেত্রে রাসূলে করীমের প্রকৃত মর্যাদার কথাই বলা হইয়াছ। বলা হইয়াছে, তিনি উহার বন্টনকারী মাত্র, প্রকৃত দাতা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। রাসূলের কাজ হইতেছে আল্লাহ্র নিকট হইতে পাওয়া ইলমকে যথাযথভাবে ও নির্বিশেষে সকলের মধ্যে বিতরণ করা। তিনি তাহা বিতরণ করিয়াছেন, প্রচার করিয়াছেন সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে। যাহার পক্ষে যে ইলম ও যতটুকু ইলম শোভনীয় এবং বাঞ্ছনীয়, তাহাকে তিনি তাহার পুরামাত্রায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এখন উহাকে গ্রহণ করা না করা প্রথমত প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যাপার এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহ যাহাকে যতটুকু তওফীক দান করিয়াছেন, তিনি ততটুকুরই ধারক হইতে পারিয়াছেন। অন্য কথায়, ইলম বন্টন ও বিস্তার করার ব্যাপারে রাসূলে করীম (স) কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা পার্থক্য করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও রাসূলের নিকট শিক্ষার্থী সাহাবীদের মধ্যে ইলম ধারণের ক্ষমতার দিক দিয়া যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা সমঝ ও গ্রহণ-ক্ষমতার পার্থক্য এবং আল্লাহ্র তওফীকের স্বাভাবিক তারতম্যের কারণে। সেই পার্থক্য এইভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, একই নবীর নিকট শিক্ষার্থী সাহাবীদের কেহ কেহ কুরআনের আয়াত ও রাসূলের বাণীর কেবল বাহ্যিক অর্থই বুঝিতে পারিতেন। আবার অনেক সাহাবী বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থের অন্তর্নিহিত ভাবধারা, নিগূঢ়তত্ত্ব ও প্রাণ বস্তুও পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। শুধু তাহাই নহে, কুরআন ও হাদীসের

মর্ম উপলব্ধি করিয়া তাহা হইতে ব্যবহারিক জীবনের জন্য জরুরী মাসলা-মাসায়েলও বাহির করিতে পারিয়াছেন।

সর্বশেষাংশের অর্থ এই যে, রাসূলের উম্মতের প্রকৃত মর্যাদা হইতেছে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন হইয়া থাকা। কিন্তু সেই জন্য শর্ত এই যে, তাহাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান ও জীবন ব্যবস্থার উপর অচল অটল হইয়া থাকিতে হইবে। তাহারা যদি কখনো পর-পদানত হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা মূল আদর্শ হইতেই বিচ্যুত হইয়াছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দ্বীন প্রচারের গুরুত্ব

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا - (بخارى، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ দুইজন লোক সম্পর্কে হিংসা করা সঙ্গত; একজন হইতেছে সেই ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছেন এবং উহাকে আল্লাহ্র পথে খরচ করার ক্ষমতা ও তওফীক দিয়াছেন। আর দ্বিতীয় হইতেছে সেই ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কীয় বুদ্ধিজ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি দান করিয়াছেন এবং সে তদনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে ও (লোকদেরকে) তাহা শিক্ষা দান করে। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা 'হাদাস' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'হিংসা' হইলেও ব্যবহারভেদে ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি অর্থ ঃ تَمَنِّىْ زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنِ الْمَحْسُوْدِ — "হিংসিত ব্যক্তির সুখ-সম্পদ বিনষ্ট ও বিলীন হইয়া যাওয়ার কামনা করা।" আমাদের ভাষায় ইহাকেই বলা হয় পরশ্রীকাতরতা।

আর দ্বিতীয় অর্থ ঃ تَمَنِّىْ مِثْلَ مَالِهٖ — "অপরের ন্যায় নিজের জন্য সুখ-সম্পদ লাভের কামনা করা।" আরবী ভাষায় ইহাকেই বরা হয় اَلْغِبْطَةُ কিংবা وَالْاِغْتِبَاطُ, ইহার অর্থ ঃ تَمَنِّىْ الرَّجُلِ مَالَيْسَ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّتَمَنّٰى زَوَالَهُ عَنِ الْغَيْرِ —অপরের ন্যায় সুখ-সম্পদ যাহার নাই, তাহার পক্ষে তাহা কামনা করা অপরের সুখ-সম্পদের অবসান কামনা ব্যতীতই।" অন্য কথায়, সুখ-সম্পদ লাভের জন্য প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। প্রথম প্রকারের 'হাসাদ' সম্পূর্ণ হারাম আর দ্বিতীয় প্রকারের 'হাসাদ'-এ কোন দোষ নাই। এখানে উল্লেখিত 'হাসাদ' শব্দটি পরশ্রীকাতরতা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; বরং এখানে ইহার অর্থ হইতেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা করার মনোভাব। বস্তুত পরশ্রীকাতরতা তথা পরকে বিদ্বেষ করা— অন্য লোককে আল্লাহ্ যে গুণ বা ধন-দৌলত দিয়াছেন তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ার কামনা করা ইসলামে একেবারেই জায়েয নহে। শুধু তাহাই নয়, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহা অপেক্ষা হীনতা, সংকীর্ণতা ও অমানুষিকতা আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব— অপরকে আল্লাহ্ যে গুণ ও ধন-দৌলত দান করিয়াছেন তাহাই লাভ করার কামনা এবং সেজন্য চেষ্টা করা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় শুধু পছন্দনীয়ই নহে, সে জন্য যথারীতি

উৎসাহও দান করা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীসে এই কথাই বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, দুই ব্যক্তিকে হিংসা করা অর্থাৎ উল্লিখিত দুই ব্যক্তিকে আল্লাহ যে গুণ দিয়াছেন তাহাই পাইবার জন্য কামনা করা সম্পূর্ণ সঙ্গত; বরং তাহা কর্তব্য। একজন হইতেছে সেই ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার সুযোগ ও তওফীকও তাহার রহিয়াছে। কেননা ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়া মোটেই বড় কথা নয়, বড় কথা হইতেছে সেই ধন-সম্পত্তিকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিতে পারা। বস্তুত অনেক লোকেরই হয়ত টাকা পয়সা রহিয়াছে; কিন্তু সেই টাকা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার তওফীক খুব কম লোকেরই হয়। যাহার এইরূপ তওফীক আছে, তাহাকেই ইসলামী শরীয়তে আদর্শ ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তোমরাও তাহারই ন্যায় গুণ লাভ করিতে চেষ্টা করিবে।

আর দ্বিতীয় হইতেছে সেই ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কীয় বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়াছেন এবং সেই ব্যক্তি তদনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে ও অন্য লোকদের মধ্যে উহার প্রচার করে। কেননা দুনিয়ায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী লোকের অভাব হয়তো কখনো হয় নাই; কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করা এবং উহাকে অন্য লোকদের পর্যন্ত পৌঁছাইবার দায়িত্ব পালন করিতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। এই সৌভাগ্য যাহার হইয়াছে, সে বাস্তবিকই আদর্শ ও অনুসরণীয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا - ترمذى

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত কথা ঈমানদার ব্যক্তির হারানো সম্পদ। সে সম্পদ যে যেখানেই পাইবে, সে-ই হইবে উহার সবচেয়ে বেশি অধিকারী। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা 'হিকমতের কথা' অর্থ ঃ বুদ্ধিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত কথা, যাহাতে দুর্বলতা ও অযৌক্তিক কিছু নাই। প্রকৃত যুক্তি ও বিজ্ঞানের যত কথাই হউক না কেন, তাহা সবই ঈমানের কথা। কেননা এই জগতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঈমানই হইতেছে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত বিষয়। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, একত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং রাসূলের রিসালতের অনুকূলের যত কথাই হইবে, তাহা সবই নিশ্চিতরূপে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত হইবে। উহার বিপরীত যাহা, তাহা সব মূলতই ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য। কাজেই বিজ্ঞান ও যুক্তির যত কথাই হউক না কেন, তাহা বলার, গ্রহণ করার ও নিজস্ব করিয়া লওয়ার অধিকার দুনিয়ার বেঈমান লোকদের অপেক্ষা এই ঈমানদার ব্যক্তিদেরই সর্বাধিক।

বস্তুত এই হাদীস জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ইসলামের জন্য এক বিশাল ও অসীম ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهَا مِنْ سَامِعٍ -

(ابوداؤد، ترمذى)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ সেই বান্দাকে সবুজ-সতেজ করিয়া রাখিবে, যে আমার কথা শুনিল, উহার পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করিল, উহাকে স্মরণে রাখিল এবং উহাকে যেরূপ শুনিয়াছে ঠিক সেইভাবেই— হুবহু তাহাই— অন্য লোক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। অনেক সময় এইরূপ হয় যে, (পরোক্ষভাবে) যাহার নিকট একটি কথা পৌঁছিয়াছে, সে উহার (প্রত্যক্ষ) শ্রবণকারী অপেক্ষা অনেক বেশি ও ভাল করিয়া উহাকে স্মরণ রাখিয়াছে। — আবূ দাঊদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহর কথা শোনা, উহাকে পুরাপুরি হিফাযত করা— স্মরণ করিয়া রাখা এবং হুবহু সেই কথাকেই অপরিবর্তণীয়ভাবে অন্য লোকদের পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়ার উপর উক্ত হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই কাজ যে সঠিকভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে; রাসূল (স) তাহার জন্য দো'আ করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ যেন এই লোককে সবুজ ও সতেজ রাখেন। রাসূলের নিকট হইতে আমরা দুইটি জিনিস পাইয়াছি। একটি হইতেছে আল্লাহ্র কালাম কুরআন মজীদ আর অপরটি হইতেছে তাহার নিজের বাণী। কুরআন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কুরআন মজিদে বলিয়াছেন ঃ "আমিই 'বিধান' নাযিল করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষণকারী।" এই জন্যই আল্লাহ উহার হিফাযতের এক অস্বাভাবিক ও সুদৃঢ় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানিবার জন্য কেবলমাত্র কুরআন মজীদই যথেষ্ট নহে, সেই সেঙ্গ উহার বাহক নবী করীম (স)-এর বাণীসমূহ ও কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্য প্রসঙ্গে তিনি তখন যাহা বলিয়াছেন, তাহার সুরক্ষিত থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল। সেই জন্যই রাসূল করীম (স) এই তাগিদ করিয়াছেন এবং উহার মর্যাদা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুত ইহারই ফলে আজ আমরা হাদীস শাস্ত্রের এক বিরাট সম্পদ পাইতেছি, যাহা নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত ও অবিকৃতভাবেই আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা রাসূলের এই মহান বাণীর সত্যতাই পুরাপুরি উপলব্ধি করিতে পারি।

ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِمُوْا وَيَسِّرُوْا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ كَرَّتَيْنِ - (الاداب المفرد)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ দ্বীন-ইসলাম শিক্ষা দাও এবং লোকদের পক্ষে তাহা সহজসাধ্য করিয়া দাও। (এই কথা তিনবার বলিলেন) আর যখন তোমার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হইবে, তখন (পূর্ণভাবে) চুপচাপ হইয়া থাক। (ইহা দুইবার বলিলেন) — আল-আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যা ইসলামী জীবনাদর্শ যেমন সর্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি ইহার প্রচার পদ্ধতিও একান্ত বৈজ্ঞানিক। আলোচ্য হাদীসে এই জন্য তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হইয়াছে। প্রথমত, দ্বীন-ইসলাম প্রচার করার আদেশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, লোকদিগকে ইসলামের শিক্ষা দাও, ইসলামের জ্ঞান ও তথ্য তাহাদের মধ্যে প্রচার কর। ইসলামী আদর্শ যে প্রচারমূলক, প্রচার সাপেক্ষ এবং উহার প্রতি বিশ্বাসী প্রত্যেকটি মানুষেরই কর্তব্য হইতেছে উহার নীতি ও আদর্শের কথা অন্য মানুষের নিকট পৌছানো, তাহা এই কথা হইতে বুঝা

যাইতেছে। দ্বিতীয়ত, বলা হইয়াছে যে, লোকদের পক্ষে তাহা সহজসাধ্য করিয়া দাও। অর্থাৎ ইসলামী আদর্শকে এমন ভয়ানক ও দুঃসাধ্য বিধানরূপে লোকদের নিকট পেশ করিও না, যাহা শুনিলে লোকেরা মনে করিতে বাধ্য হয় যে, উহা কোন বাস্তব ও কার্যকরী কর্মের উপযোগী বিধান নহে; উহাকে কাজে পরিণত করা, জীবনকে তদনুযায়ী গঠন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কেননা, কোন জীবন বিধান যদি কঠিন ও দুঃসাধ্য মনে হয়, তবে উহাকে গ্রহণ করার জন্য লোকদের মনে কোন আগ্রহ ও উৎসাহ জাগ্রত হয় না; বরং লোকদের মন উহা হইতে বিপরীতমুখী হইয়া দাঁড়ায়। আর বাস্তবিকই যে আদর্শকে লোকেরা একবার কঠিন ও দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিবে, তাহা কোনদিনই বাস্তবায়িত হইতে পারিবে না। তাই উহাকে সহজবোধ্য ও সুসাধ্য করিয়া পেশ করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, যখন ক্রোধান্বিত হইবে, তখন চুপ করিয়া থাকিবে। কেননা ইসলামী আদর্শ প্রচারের— আদর্শ প্রচারের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বহু মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এই সময় ইসলামের বিপরীত কোন কাজ সম্পন্ন হইতে দেখিয়া এবং লোকদের মধ্য হইতে কাহারও আক্রমণ মূলক সমালোচনা বা কটু কথা শুনিয়া অথবা অবজ্ঞা-অবহেলা দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া যাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। কিন্তু রাগান্বিত হওয়ার ফলে যদি অবাঞ্ছিত কিছু ঘটিয়া যায়, যদি অধিকতর তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তবে তাহার ফলে ইসলামী আদর্শ প্রচার ও আদর্শ প্রচারের আন্দোলনের অনেক ক্ষতি হইতে পারে। এইজন্য নবী করীম (স) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, রাগান্বিত হইয়া যেন তিক্ততার সৃষ্টি করিয়া না বসে। এই কারণে রাগ হইলে চুপ করিয়া থাকাই বাঞ্ছনীয়, বস্তুত রাগ প্রকশিত করার জন্য চুপ করিয়া থাকাই অন্যতম ও প্রধান পন্থা।

হাদীসের বর্ণনার মধ্যে এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ 'এই কথা তিনবার বলিলেন' এবং আর এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ "ইহা দুইবার বলিলেন।" এই কথা নবী করীমের নহে, বরং ইহা হাদীসের বর্ণনাকারীর কথা। নবী করীম (স) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য এক-একটি কথা দুই-দুইবার তিন-তিনবার করিয়া বলিতেন, যেন শ্রবণকারী সেই কথার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারে। এখানে বর্ণনাকারী সেই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

عَنْ شَقِيْقٍ رض قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رض يُذَكِّرُ النَّاسَ فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدَدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اَنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذَالِكَ اَنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا -

শাকীক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) লোকদিগকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন ওয়ায ও নসীহত করিতেন। একজন লোক তাঁহাকে বলিল, হে আবূ আবদুর রহমান, আমার মনে ঐকান্তিক বাসনা এই যে, আপনি প্রত্যেক দিনই এইরূপ নসীহত করুন। তিনি বলিলেন যে, উহা হইতে আমাকে কেবল এই জিনিসই বিরত রাখে যে, তোমরা ওয়ায নসীহত শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া যাও এই আশংকায় আমি

তোমাদের প্রতি সেইরূপ দৃষ্টি রাখি যেমন নবী করীম (স) আমাদের বিরক্ত হওয়ার ভয়ে আমাদের প্রতি খেয়াল রাখিতেন। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে ইসলাম প্রচারের বাস্তব নিয়ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ লাভ করা যায়। ইসলামকে একটি বাস্তব জীবনাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্বপ্রথম কিছু সংখ্যক লোকদের মন-মগজে উহাকে দৃঢ়মূল করিয়া দিতে হইবে এবং ক্রমিক প্রচারের স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিছু কিছু করিয়া পেশ করিতে হইবে এবং তাহা লোকদের মন-মগজে যাহাতে দৃঢ়মূল হইতে পারে সেইজন্য অবসর দিতে হইবে। এইজন্যই নবী করীম (স)-এর ইসলাম শিক্ষাদানের নিয়ম এই ছিল যে, তিনি একদিন ইসলাম সম্পর্কে বলিতেন ও এক সপ্তাহের জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন, আবার এক সপ্তাহ পর লোকদের একত্রিত করিতেন এবং তখন ইসলাম সম্পর্কে যাহা বলিবার বলিতেন। ঠিক এইরূপ কর্মপদ্ধতি ও প্রচার পন্থার ফলে সেই বিপ্লবী দল তৈয়ার হইতে পারিয়াছিল, যাহার দ্বারা অত্যল্প সময়ের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবীর উপর ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ইসলামে এই শিক্ষাদান পদ্ধতি স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষাদানের নিয়মের সহিত তুলনীয়। পেশাদারী ওয়ায়েযগণ যেভাবে মৌসুমী তবলীগ করিয়া থাকেন কিংবা একবার শ্রোতা পাইলে ওয়ায শোনাইয়া রাত পোহাইয়া দেন, তাহা দ্বারা আর যাহাই হউক, কোন আদর্শবাদী বিপ্লবী দল তৈয়ার হইতে পারে না।

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ قَلَّ مَا يُوَا جِهُ الرَّجُلَ بِشَىْءٍ يَكْرَهُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ لَوْغَيَّرَ اَوْنَزَعَ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ - (الادب المفرد)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স) কাহারো কোন কথা পছন্দ না হইলে তিনি সামনা-সামনিই তাহার দোষ ধরিতেন— এরূপ খুব কমই দেখা গিয়াছে। একদিন একটি লোক তাঁহার নিকট আসিল, তাহার পোশাকে হলুদ বর্ণের চিহ্ন ছিল। যখন সে (মজলিস হইতে) উঠিয়া যাইতে লাগিল, তখন তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই লোকটি যদি এই হলুদ বর্ণের চিহ্নকে বদলাইয়া ফেলিত অথবা উহাকে পরিচ্ছন্ন করিয়া দূর করিয়া দিত, তবে কতই না ভাল হইত।

— আল-আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জানিতে পরা যায়। প্রথম এই যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতার দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক, যেন তিনি সহকর্মীদের প্রতি সকল সময় ও ব্যাপারে লক্ষ রাখিতে ও উহার সংশোধনের জন্য উপদেশ দান করিতে পারেন। দ্বিতীয় এই যে, নেতার এবং তদনুরূপ সমাজেরও প্রভাবশালী লোকদের পক্ষে তাহাদের অধীনস্থ লোকদের কথায় কথায় দোষত্রুটি ধরিয়া লজ্জা দেওয়া সঠিক পন্থা নয়। কেননা তাহা করিলে লোকদের মধ্যে বিদ্রোহ ও হঠকারিতার মনোভাব জাগিতে পারে; বরং সংশোধনের জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যেন কাহারো মন বিরক্ত কিংবা বিদ্রোহী হইয়া না উঠে এবং দোষও যেন সংশোধিত হয়। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব-সম্পন্ন লোকদের এই দিক দিয়া বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

সন্তান-সন্ততির চরিত্র গঠন ও আদর্শ শিক্ষাদান

عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ - (ترمذى)

আবূ আইয়ুব ইবনে মূসা তাঁহার পিতার নিকট হইতে, তিনি তাঁহার দাদার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন পিতামাতা তাহাদের সন্তানদিগকে উত্তম চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক ভাল কোন জিনিসই দিতে পারে না।
— তিরমিযী

ব্যাখ্যা পিতামাতা সন্তানদের জন্য অনেক কিছুই করিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় পিতামাতা যত কাতর হইয়া থাকে তত আর কেহ নয়। এ জন্যই তাহারা চেষ্টা করিয়া থাকে তাহাদের সন্তানের জন্য অধিকতর ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে। এই জন্য জায়েয-নাজায়েয নির্বিচারে টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াইতে চেষ্টা করে, অধিক পরিমাণে ধন-সম্পত্তি ও বাড়ি-ঘর সংগ্রহ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। বরং মনে করে যে, ইহাই হইতেছে সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব পালনের সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু নবী করীম (স)-এর আলোচ্য হাদীসে ইহার বিপরীত কথাই প্রমাণ করিতেছে। তাঁহার দৃষ্টিতে সন্তানদের জন্য ব্যাংক-ব্যালেন্স সংগ্রহ করা ও অধিক ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যাওয়াই পিতামাতার দায়িত্ব পালনের পক্ষে কিছু মাত্র যথেষ্ট নয় এবং এই সব জিনিস রাখিয়া যাওয়ার বিশেষ কোন মূল্যও নাই। আসলে সন্তানদের নৈতিক চরিত্র ও আদব-কায়দা যদি সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, তবে লক্ষলক্ষ টাকা ও বিপুল বিত্ত সম্পত্তি অপেক্ষা ইহাই উত্তম দানরূপে পরিগণিত হইবে। বহু পিতামাতা সন্তানের জন্য বিপুল টাকা-পয়সা ও বিত্ত-সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে; কিন্তু সন্তানের নৈতিক চরিত্র উত্তম করিয়া গড়িয়া তোলে নাই বলিয়া তাহা সবই বরবাদ হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে বহু পিতামাতা সন্তানকে হয়ত উল্লেখযোগ্য কিছুই দিয়া যাইতে পারে নাই; কিন্তু তাহাদের শুধু উত্তম চরিত্র ও আদর্শ আদব-কায়দায় গড়িয়া দিয়াছিল বলিয়াই তাহারা উত্তরকালে বিপুল সচ্ছলতা লাভ করিত সমর্থ হইয়াছে। সমাজ ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নহে। এই বাস্তব সত্যকেই নবী করীম (স) এই ছোট্ট হাদীসের মারফতে এত সুন্দর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ - (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার যাবতীয় কাজকর্মের সময় এবং সুযোগও শেষ হইয়া যায়। অবশ্য তখনো তিন প্রকারের কাজের ফল সে পাইতে পারে ঃ (১) সাদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম ও বিদ্যা, যাহার ফল সুদূর প্রসারী হইতে পারে ও (৩) এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যাহারা তাহার জন্য দো'আ করিতে থাকে। — মুসলিম

ব্যাখ্যা মানুষের এই পার্থিব জীবনই হইতেছে প্রকৃত কর্মের ক্ষেত্র। মৃত্যু এই জীবনের উপর চিরদিনের তরে যবনিকা টানিয়া দেয়। ইহার পর আর সে কোন কাজই করিতে পারে না। কিন্তু তিনটি কাজ এমন রহিয়াছে, যাহা জীবদ্দশায় করিয়া লইলে মৃত্যুর পরও তাহা হইতে অফুরন্ত সুফল লাভ করা যায়, এমনভাবে যেমন জীবদ্দশায় কাজের ফল পাইতে থাকে। ইহার মধ্যে প্রথম হইতেছে সেই সব কাজ, যাহাকে বলা যায়, 'সাদকায়ে জারিয়া' অর্থাৎ সাধারণ পর্যায়ে সাদকা ও দান খয়রাতের এমন কাজ যাহা হইতে জনগণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত উপকৃত হইতে পারে। দ্বিতীয় হইতেছে সঠিক জ্ঞান— ইসলামী ইলম, যাহা অন্য লোককে শিক্ষা দিলে কিংবা সাধারণ লোক পর্যন্ত তাহা পৌঁছাইবার এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিলেই তাহা অনন্তকাল পর্যন্ত ছড়াইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে উহার সওয়াবও সেই ব্যক্তি লাভ করিতে পারে, যে শুরুতে উহা ছড়াইবার এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে। আর তৃতীয় হইতেছে সচ্চরিত্রবান সন্তান রাখিয়া যাওয়া, সন্তানদের আদব ও চরিত্র শিক্ষা দিয়া সৎ বানাইয়া যাওয়া, যাহার ফলে পিতামাতার মৃত্যুর পর সেই আদর্শ চরিত্রবান সন্তান পিতামাতার জন্য, পিতামাতার শান্তি, মুক্তি ও মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিতে থাকিবে।

এই হাদীসের শেষ কথা হইতে পূর্ববর্তী হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়েরই সমর্থন পাওয়া যায় এবং সন্তানদের ইসলামী চরিত্র শিক্ষা দিয়া সৎ বানাইয়া যাওয়া পিতামাতার কর্তব্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

সৎ সন্তান রাখিয়া যাওয়াকে ব্যক্তির 'আমল' বলার কারণ এই যে, সন্তান পিতার কারণেই দুনিয়ায় আগমন করিতে পারে এবং সযত্নে শিক্ষাদীক্ষার ফলেই সে মহৎ চরিত্রবান হইতে পারে। কুরআন মজীদে হযরত নূহ (আ)-এর কাফির সন্তানকে বলা হইয়াছে انه عمل غير صالح সে এক অসৎ কাজ।' আর বিশেষভাবে সন্তানের উল্লেখ করার কারণ পিতামাতার জন্য দো'আ করার ব্যাপারে সন্তানকে উৎসাহ দান করা। অন্য কথায় প্রত্যেক সৎ সন্তানের কর্তব্য হইতেছে তাহার পিতামাতার জন্য সবসময় আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করা।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ - (ابوداؤد)

আমর ইবনে শোয়াইব, তাঁহার পিতা হইতে, তাঁহার দাদা হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের সন্তান যখন সাত বৎসর পর্যন্ত পৌঁছায় তখন তাহাদিগকে নামায পড়িবার জন্য আদেশ কর এবং দশ বৎসর বয়সে (নামায না পড়িলে) শারীরিক শাস্তি দাও এবং তাহাদের জন্য আলাদা আলাদা বিছানার ব্যবস্থা কর। — আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা হাদীসের কথাগুলি সুস্পষ্ট। সন্তানদের ছোট বয়স হইতে যেমন ইসলামী শিক্ষাদান ও সচ্চরিত্রবান করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য, তেমনি শৈশবেই নামায পড়ায় অভ্যস্ত করাও আবশ্যক। এমনকি দশ বৎসর বয়সেও যদি নামায না পড়ে, তবে প্রয়োজনবোধে

তাহাকে শারীরিক শাস্তিও দিতে হইবে। হাদীস হইতে এই কথা বুঝায় না যে, ছেলেমেয়েদের মারিয়া মারিয়া নামায পড়াইতে হইবে। হাদীসের আসল লক্ষ্য হইতেছে এই কথা বলা যে, ছেলেমেয়েদের ইসলামী চরিত্র, ইসলামী জ্ঞান ও ভাবধারায় গড়িয়া তোলার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া পিতামাতা ও মুরব্বীদের কর্তব্য। আর নামায যেহেতু ইসলামের অন্যতম প্রধান বুনিয়াদ এবং ইসলামী চরিত্র ও আদব-কায়দা শিক্ষা করার শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা, এইজন্য নামায সম্পর্কে আলোচ্য হাদীসে বিশেষ তাগিদ করা হইয়াছে। অবশ্য পিতামাতা ও মুরব্বীদের এইদিকেও তীক্ষ্ণ খেয়াল রাখিতে হইবে যে, সন্তানগণ যেন আল্লাহ্‌র ভয়ের পরিবর্তে মা'র ও পিতার শাসনের ভয়ে নামায পড়িতে শুরু না করে। কেননা নামায ও অন্যান্য যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়েই হওয়া উচিত— অন্য কাহারো ভয়ে নয়।

—৯/২৯

ইসলামে নৈতিক চরিত্র

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا - (بخاری، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক হইতেছে তাহারা, যাহাদের চরিত্র তোমাদের সকলের অপেক্ষা উত্তম। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা উপরিউদ্ধৃত হাদীস হইতে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, নবী করীম (স) যে আদর্শ শিক্ষা উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর এবং ইহাকেই মানুষের সঠিক কল্যাণের উৎস বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মানুষ অসৎ চরিত্রের কাজ হইতে নিজেকে দূরে রাখিবে, উত্তম ও উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী গ্রহণ করিবে, ইহাই হইল মানুষের বৈশিষ্ট্য। রাসূলে করীম (স)-এর আগমন উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান কাজ হইতেছে জনগণের 'তাযকিয়া' করা অর্থাৎ মানুষের মন-মগজ, চরিত্র ও কার্যাবলীকে নির্মল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ এবং সর্বপ্রকার ক্লেদ কালিমা মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া তোলা। কেননা মানুষের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইতে পারে উত্তম নৈতিক চরিত্রের বদৌলতে। অত্র হাদীসের বক্তব্য হইতেছে এই যে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া যে যে লোক সর্বোত্তম, ইসলামের দৃষ্টিতে সে-ই হইতেছে উত্তম ব্যক্তি। এখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও উত্তম নৈতিক চরিত্র একই জিনিসের দুই নাম। যাহার উন্নত মনুষ্যত্ব রহিয়াছে সে-ই উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী, পক্ষান্তরে যাহার উৎকৃষ্ট চরিত্র রহিয়াছে, সে-ই প্রকৃত মানুষ। উত্তম চরিত্র ছাড়া কোন মানুষ ঠিক মানুষ হইবার দাবি করিতে পারে না।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدِكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارِيْنَ وَالْمُتَشَدِّقِيْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ - (ترمذی)

হযরত জারিব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক

দিয়া অধিক নিকটবর্তী সেই সব লোক যাহারা তোমাদের মধ্যে আখলাক ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া উত্তম। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিকতর ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকট হইতে অধিক দূরে থাকিবে সেই সব লোক, যাহারা দ্রুত কথা বলে, লম্বা লম্বা কথা বলিয়া লোকদের অস্থির করিয়া তোলে এবং অহংকার পোষণ করে। সাহাবিগণ বলিলেন ঃ তিন ধরনের লোকদের মধ্যে প্রথম দুই ধরনের লোকদের তো আমরা জানি, কিন্তু শেষোক্ত লোক কাহারা ? নবী করীম (স) বলিলেন ঃ তাহারা হইতেছে অহংকারী লোক। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে রাসূলের নিকটবর্তী ও প্রিয় লোক কে এবং কে প্রিয় নয়, তাহার একটি বাহ্যিক মাপকাঠি পেশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, উত্তম চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগণই কিয়ামতের দিন রাসূলে করীমের নিকট অধিকতর প্রিয় লোক হইবে। তাহারা সেদিন রাসূলের সাহায্য লাভ করিবে, রাসূলের শাফাআতেরও অধিকারী হইবে। কিন্তু যাহাদের মধ্যে তিন ধরনের দোষের একটি থাকিবে, তাহারা যেমন রাসূলের প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে না, তেমনি রাসূলের নৈকট্য ও সাহায্য পাইতে পারিবে না। তাহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক তাহারা, যাহারা খুব বেশি কথা বলে, কথা বলায় কৃত্রিমতা ও কপটতার প্রশ্রয় নেয়, এত দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি কথা বলে যে, অনেক সময় তাহা সঠিকভাবে বুঝাও যায় না। দ্বিতীয় তাহারা, যাহারা দীর্ঘ ও লম্বা লম্বা কথা বলে, কথার বাহাদুরীতে এত উচ্চমার্গে পৌঁছিয়া যায় যে, তাহাদের যেন নাগালই পাওয়া যায় না। নিজেদের কথার উচ্চ প্রশংসা নিজেরাই করিতে থাকে। তাহাদের কথা হইতে এই ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তাহারা দুনিয়ায় কাহাকেও পরোয়া করে না, কাহারও মান-সম্মান মর্যাদার কোন মূল্য যেন তাহাদের কাছে নাই। আর তৃতীয় তাহারা, যাহারা মুখ ভরিয়া কথা বলে, কথা বলার সময় এমনভাব করে যে, সমস্ত কথা যেন মুখের ভিতরই বন্দী হইয়া পড়িয়াছে এবং বিকট ধরনের শব্দই শুধু শ্রুতিগোচর হয়। তাহাদের কথার মধ্যে এমন একটা প্রচ্ছন্ন অথচ প্রকট ভাব লক্ষ্য করা যায় যে, তাহারা যেন সকলের নাগালের বাহিরে। অন্য সব লোক যেন তাহাদের হইতে অনেক ছোট, অনেক হীন এবং অনেক দূরে অবস্থিত। অহংকার আত্মাভিমান ও আত্মশ্রেয়বোধ তাহাদের কথাবার্তার মধ্য দিয়া নগ্নভাবে প্রকাশ লাভ করে। আলোচ্য হাদীসের দৃষ্টিতে তাহারা শুধু রাসূলে করীম (স)-এর নিকটই অপ্রিয় নয়, গোটা মানব সমাজেও তাহারা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক বলিয়া বিবেচিত। তাহারা আর যাহাই করুক বা না করুক, মানুষের অন্তর জয় করিতে ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হয় না, সত্যিকার মানুষের পরিচয় তাহাদের কাছ হইতে পাওয়া যায় না।

عَنِ اَبِىْ الدَّرْدَارض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَامِنْ شَىْءٍ اَثْقَلَ فِىْ مِيْزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنَّ اللّٰهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ -
(ترمذى)

হযরত অবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণিতহইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দার দাড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছুই হইবে না; আর যে লোক বেহুদা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট ধরনের কথাবার্তা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মোটেই পছন্দ করেন না। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তির আমল ওজন করাকালে তাহার উত্তম চরিত্রই অত্যন্ত ভারী জিনিস রূপে প্রমাণিত হইবে। তাহার অর্থ, ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই দুনিয়ায় অত্যন্ত উত্তম চরিত্রবান হইবে। কেননা ঈমান ও উত্তম নৈতিক চরিত্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে ঈমান আছে, সেখানে অনিবার্যরূপে উন্নত নৈতিক চরিত্র থাকিবে। ঈমান না হইলে যেমন উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্ভব নয়, তেমনি সঠিক ঈমানের অনিবার্য ফল হইতেছে উন্নত নৈতিক চরিত্র।

এই প্রসঙ্গে খারাপ চরিত্রের একটি বিশেষ গুরুতর দিক দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতেছে অশ্লীল কথা বলা এবং বেহুদা, বাজে ও নীচ হীন কথাবার্তা বলা। কথা মানুষের মনোভাব ও চিন্তাধারার বাহন। মানুষের অন্তরের ভাবধারা ও ভিতরকার প্রকৃত রূপের প্রকাশ ঘটে মানুষের মুখের কথায়। কাজেই অশ্লীল কথা যেমন পরিত্যাজ্য, অপ্রয়োজনীয় ও হীন ধরনের কথাবার্তা বলাও একান্তই অবাঞ্ছনীয়। কথাবার্তা যাহার খারাপ, অশ্লীলতা ও হীনতা প্রকট হইয়া উঠে যাহার কথাবার্তার মধ্য দিয়া, সে লোকের মন যে নিতান্তই কুলুষতাময় ক্লেদাক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই রাসূলে করীম (স) এই ধরনের কথাবার্তা পরিত্যাগ করার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই ধরনের কথা যাহারা বলিতে অভ্যস্ত, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে একবিন্দু ভালবাসেন না, শুধু ভালবাসেন না তাহাই নয়, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র অপরিসীম ক্রোধ ও অসন্তোষ ক্ষরিত হয়। আর মহান আল্লাহই যাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তাহাদের ভবিষ্যৎ কিছুতেই কল্যাণময় হইতে পারে না। আনুষ্ঠানিক নেক আমলের বোঝা বিচারের পাল্লাকে ভারী করিতে পারিবে না, যদি না উহার সহিত উত্তম চরিত্র যোগ হয়, এইকথা হাদীস হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব

عَنْ مَالِكَ ر   اَنَّهٗ قَدْ بَلَغَهٗ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ بُعِثْتُ لِاُتِمَّ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ -
(موطاامام مالك)

ইমাম মালিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট এই খবর পৌছিয়াছে যে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমাকে নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে। — মুয়াত্তা ইমাম মালিক

ব্যাখ্যা হাদীসটি মূলত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মালিকের নিকট ইহা নির্ভরযোগ্য ও ধারাবাহিক সূত্রে পৌছিয়াছে, যদিও তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেন নাই।

হাদীসে উল্লেখিত নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম্য বলিতে সেই সব উত্তম নৈতিক ধারণা ও গুণকে বুঝানো হইয়াছে, যাহার ভিত্তিতে একটি পবিত্র মানবীয় সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে।

নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম্যের পূর্ণতা বিধানের অর্থ এই যে, নবী করীম (স)-এর পূর্ববর্তী নবী ও তাঁহাদের অনুসারিগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ও বিভিন্ন দেশে নৈতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিকের শিক্ষাকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং নিজেদের বাস্তব কর্মজীবন দিয়া তাহার উন্নততর দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। কিন্তু হযরতের পূর্ব পর্যন্ত এমন কোন সর্বাত্মক ব্যক্তিত্ব ভূ-পৃষ্ঠে পরিদৃষ্ট হয় নাই, যাহার দ্বারা ইসলামী নৈতিকতার সর্বাত্মক রূপ উপস্থাপিত ও

বিবৃত হইতে পারে এবং একদিকে নিজের জীবনে তাহা পালন করিয়া দেখাইতে ও অপরদিকে তদনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাও গড়িয়া তুলিত পারে। বস্তুত এমন ব্যক্তিত্ব মানুষের গোটা ইতিহাসে একবার মাত্র পরিদৃষ্ট হয় এবং তাহা হইতেছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদের ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁহার তেইশ বৎসরের নবুয়্যতী জীবনে মানব জীবনের সমগ্র দিক ও ক্ষেত্রের জন্য নৈতিক চরিত্রের অপূর্ব ও উজ্জ্বল নিদর্শন সংস্থাপন করিয়াছেন। এই ব্যাপারে কোন একটি দিকেও একবিন্দু অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যাইতে পারে না। আর বস্তুত এই উদ্দেশ্যেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) দুনিয়ায় তশরীফ আনিয়াছিলেন এবং এই কাজকে পূর্ণতার চরম উন্নত স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াই তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন।

নবী করীম (স) নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম্যের পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যেই তিনি দুনিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইহা তাহার জীবনের কোন আনুসঙ্গিক কাজ নহে বরং ইহাই হইতেছে তাঁহার নবুয়্যতের মূল লক্ষ্য। বস্তুত দ্বীন-ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যত কাজই করিয়াছেন, যত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারই করিয়াছেন, তাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল লোকদের সম্মুখে চূড়ান্তভাবে ও নৈতিক চরিত্র-মাহাত্ম্য উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করিয়া তোলা। ব্যক্তি মানুষকে উহার ভিত্তিতে গঠন করা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা উহার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা। আর ইহার জন্য একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই যে চূড়ান্ত বিধান তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (ابوداؤد، دارمی)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, ঈমানদার লোকদের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়া পূর্ণ ব্যক্তি সে-ই হইতে পারে, যে তাহাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া সকলের অপেক্ষা উত্তম। — আবূ দাঊদ, দারেমী

ব্যাখ্যা মুমিনের ঈমানের পূর্ণতা তখনই হইতে পারে যখন তাহারা নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। এখানে পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণমাত্রায় নৈতিক চরিত্র সমপর্যায়ভুক্ত। কাজেই যেখানে ঈমান পূর্ণ সেখানে নৈতিক চরিত্রও অবশ্যই পূর্ণ পরিণত হইবে। পক্ষান্তরে যেখানে নৈতিক চরিত্রের পতন সেখানে ঈমানের পরিপক্কতার নিদারুন অভাব।

ইসলামের মূল ধারণা (Conception) অনুযায়ী নৈতিক চরিত্র ও ঈমানের মধ্যবর্তী এই সম্পর্ক একেবারে মৌলিক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম জীবনে ইহার বাস্তব রূপ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ইসলামী সমাজে চিরদিন তাহাকেই প্রকৃত ও পূর্ণ ঈমানদার মনে করা হইয়াছে, যাহার নৈতিক চরিত্র সর্বাধিক উন্নত ও নিষ্কলুষ। নৈতিক চরিত্র ব্যতীত ঈমানদার হওয়ার দাবি করা মূলতই ভুল। এই ভুলে বর্তমান দুনিয়ার মুসলমান লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে ঈমানদারের বাস্তব লক্ষণ হিসাবে নৈতিক চরিত্রকে গ্রহণ না করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে কতক বাহ্যিক বেশভূষা ও অনুষ্ঠানকে। ইহার ফলে বর্তমানে মুসলিম সমাজ একেবারে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এখানে তাহাদের নিকট বাহ্যিক খোলসটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, উহার প্রাণ শক্তি আজ শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْاَنْصَارِىْ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ -

নাওয়াস ইবনে সাময়ান আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ হযরত রাসূলে করীম (স)-কে আমি একদা 'বির্' ও 'ইসম' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, 'বির্' হইতেছে উত্তম চরিত্র আর 'ইসম' তাহা যাহা তোমার মনে কুণ্ঠা জাগায় এবং লোকেরা তাহা জানিতে পারুক ইহা তুমি পছন্দ কর না। — মুসলিম

ব্যাখ্যা 'বির্' আর 'ইর্সম' বলিতে কি বুঝায়, এই সম্পর্কে এক প্রশ্নের জওয়াবই হইতেছে এই হাদীসের মূল কথা। শব্দ দুইটি যেমন কুরআন মজীদে ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনি ইসলামী বিধান মুতাবিক জীবনে এই বিরর ও ইসম-এর প্রশ্ন মুমিন ব্যক্তির পদে পদেই দেখা দেয়। এই উভয়বিধ কারণে শব্দ দুইটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং ঈমানদার লোকদের মনেও এই সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এই প্রেক্ষিতেই হাদীসের উক্ত প্রশ্ন-উত্তর আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূলে করীম (স) সুস্পষ্ট বলিলেন যে, উত্তম চরিত্রই হইতেছে বিরর। আর 'বির্' বলিতে বুঝায় লোকদের ভাল করা, লোকদের সহিত ভাল সম্পর্ক স্থাপন এবং আত্মীয়-স্বাজনের হক আদায় করা। ইহার আর একটি অর্থ হইতেছে اَللُّطْفُ নম্রতা, অনুগ্রহ, সৎ-সংসর্গ ও আনুগত্য। এইসব বিষয়েরই ব্যাপক নাম হইতেছে حُسْنُ الْخُلُقِ উত্তম চরিত্র।

দ্বিতীয় শব্দের ব্যাখ্যায় রাসূলে করীম (স) বিশেষ কোন গুণের বা চরিত্রহীনতার বিশেষ কোন দিকের উল্লেখ না করিয়া একটা সুস্পষ্ট মানদন্ড পেশ করিয়াছেন, যাহার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি মানুষ বিচার করিতে পারে কোন্‌টি অন্যায় ও চরিত্রহীনতার কাজ। 'ইসম' শব্দের আসল অর্থ গুনাহ , পাপের কাজ, অন্যায় ও নাজায়েয কাজ। আর এখানে এমন সব কাজকেই 'ইসম' বলা হইয়াছে, যাহা ব্যক্তিমনে কুণ্ঠা জাগায়, যে কাজ সম্মুখে আসিলে ব্যক্তির অন্তর ইতস্তত করিতে শুরু করে, তাহা করিবে কি করিবে না ঠিক করা কঠিন হইয়া পড়ে। অন্তত যে কাজ মানুষ অকুণ্ঠিত চিত্তে করিতে পারে না, মনে সন্দেহ থাকিয়াই যায়— যে কাজের ব্যাপারে মানুষের মনের অবস্থা এইরূপ, মনে করিতে হইবে সে কাজ ঠিক নহে এবং সে কাজ করা অনুচিত।

'ইসম' যাচাই করার জন্য প্রদত্ত মানদণ্ডের ইহা প্রথম অংশ। ইহার দ্বিতীয় অংশ হইতেছে কোন কাজ সম্পর্কে মনে চোর চোর ভাব জাগা। অর্থাৎ একটি কাজ ভাল নয় বলিয়াই কেহ তাহা অতি সংগোপনে করিতেছে, সে কাজ সম্পর্কে অপর লোকেরা যেন কিছু জানিত না পারে এমন একটি চোরা সতর্কতামূলক তৎপরতা সে সব সময়ই রক্ষা করিয়া চলে। যে কাজ অপরে জানিলে লজ্জার কারণ হয়, তাহা অপরের নিকট হইতে গোপন রাখিতে চেষ্টা করাই এই তৎপরতার উদ্দেশ্য এবং এ ধরনের কাজই গুনাহ্ বলিয়া নবী করীম (স) উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত ইহা পাপ-পূর্ণ নির্ধারণের জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপ দণ্ড। ইহার সাহায্যে প্রত্যেকটি মানুষই সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হইতে বিরত থাকিতে এবং সকল প্রকার ন্যায় ও ভাল কাজে লিপ্ত হইতে পারে। এখানে মন ও অন্তরকে একটি স্বচ্ছ দর্পনের ন্যায় মনে করা হইয়াছে। দর্পণে যেমন ভালমন্দ সবকিছুই প্রতিফলিত হয় এবং দর্পণের সাহায্যে যেমন নিজের মুখমণ্ডলকে ময়লামুক্ত করা সম্ভব, ঠিক তেমনি মনের পটে প্রতিফলনের সাহায্যে ভাল-মন্দ

ন্যায়-অন্যায় যাচাই করা একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। কিন্তু ইহার অর্থ নিরংকুশভাবে ইহা নহে যে, মন যাহা ভাল বলিবে তাহাকেই ভাল আর মন যাহাকে মন্দ বলিবে তাহাকেই চূড়ান্তভাবে মন্দ বলিয়া মনে করিতে হইবে। রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি বিশেষভাবে প্রকৃত ঈমানদার লোকদের সম্বন্ধে এবং সে সম্বন্ধে কথাটি বাস্তবিকই অকাট্য। 'দর্পণে সবকিছুই প্রতিফলিত হয়, কথাটি যেমন সাধারণ সত্য তেমনি সাধারণ সত্য ইহাও যে, মলিন মরিচা ধরা দর্পণে হয় আদৌ কিছুই প্রতিফলিত হয় না আর হইলেও তাহা বিকৃত রূপ পেশ করে। মনের অন্তর সম্পর্কেও এ কথাটি একান্তই সত্য। কোন কাজকে লোকদের হইতে গোপন করা হইলে ব্যক্তির মন-মগজের উপর উহার এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে মন সব সময়ই অপরাধী ও অপরাধবোধে ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। ফলে তাহার মনের অপমৃত্যু ঘটিতে বাধ্য। অপরাধবোধের এই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হইতে মন-মগজকে রক্ষা করিতে হইলে উক্ত ধরনের কাজ আদৌ কাহারো করা উচিত নহে।

ইসলামী নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سمعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ - (ابوداؤد)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) কে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি তাহার উত্তম চরিত্রের সাহায্যে সেই সব লোকদের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিতে পারে, যাহারা সারা রাত্রি ধরিয়া নফল নামায পড়ে এবং দিনের বেলা সব সময়ই রোযা থাকে। — আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যে লোক ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাস এবং আমল ও বাস্তব জীবন যাপনের দিক দিয়া খাঁটি মুমিন হইবে আর সেই সঙ্গে তাহার চরিত্রও হইবে উন্নত পবিত্র ও মধুর, সে যদি সারারাত্র জাগ্রত থাকিয়া নফল নামায না-ও পড়ে আর সে যদি প্রত্যেক দিন রোযা না-ও রাখে তুবও তাহার মর্যাদা কিছুমাত্র কম হইবে না। বরং তাহার পবিত্র চরিত্রের বলেই সে সেইসব নফল ইবাদতকারীদের সমান সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্‌র নিকট পাইতে পারিবে। অন্য কথায় ঈমানের পর একজন বান্দার প্রথমকাজ হইতেছে ইসলামের বুনিয়াদী হুকুম-আহকাম পালন করা এবং উহার সাহায্যে নিজের চরিত্রকে পবিত্র ও উন্নত করিতে চেষ্টা করা। উহা করিতে পারিলেই সে আল্লাহ্‌র প্রিয় ও সম্মানীয় বান্দা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সে যদি নফলের পর নফল ইবাদতে রাতদিন অতিবাহিত নাও করে তবুও তাহার কোন ক্ষতি-লোকসান হওয়ার আশংকা নাই। অর্থাৎ ইসলামে নফল ইবাদত অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশি সওয়াবের কাজ হইতেছে চরিত্রকে পবিত্র এবং উন্নত করা। যাহার চরিত্র পবিত্র এবং উত্তম নয়, তাহার হাজার হাজার পরিমাণ নফল ইবাদত তাহার জীবনে— ইহকালে কিংবা পরকালে— কোথাও বিশেষ কোন কল্যাণ বহন করিয়া আনিতে পারিবে না। ধার্মিক লোকদের মধ্যে বর্তমানে খুব বেশি পরিমাণে নফল ইবাদত করার প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু তাহার পূর্বে বা সেই সঙ্গে চরিত্রকে উন্নত করার দিকে আদৌ কোন লক্ষ্য দেওয়া হয় না। ইহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তি

عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْس بِهٖ حَذَرًالِمَا بِهٖ بَأْسٌ - (ترمذى)

আতিয়া সা'দী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ বান্দা মুত্তাকী লোকদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত সামিল হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন দোষের কাজে লিপ্ত হইয়া পড়ার আশংকায় সেই সব জিনিসও ত্যাগ না করিবে, যাহাতে বাহ্যত কোনই দোষ নাই। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা তাকওয়ার প্রাথমিক স্তর হইতেছে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ জিনিস হইতে বিরত থাকা। ইহা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকেই রক্ষা করিতে হয়, অন্যথায় তাহার ঈমান আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় স্তরে এমন অনেক জিনিসই ত্যাগ করিতে হয়, যাহা সুস্পষ্টরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ না হইলেও মুত্তাকী লোকদের পক্ষে সেই জিনিস শোভা পায় না। কেননা ঐ জিনিস অনেক জায়েয কাজও হারাম কাজের কারণ ও উদ্ভাবক হইয়া থাকে। সেই জন্য প্রথম কাজ জায়েয হইলেও উহার পরবর্তী কাজ যেহেতু হারাম, সেই জন্য ঐ জায়েয কাজ হইতেও দূরে থাকাই মুত্তাকী লোকদের কর্তব্য। আলোচ্য হাদীসে তাহাই বলা হইয়াছে এবং ইসলামী নৈতিকতার ইহাই হইতেছে বুনিয়াদ।

তাকওয়ামূলক জীবনধারা

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَاعَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا - (ابن ماجه)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হে আয়েশা! ছোট ছোট ও নগণ্য গুনাহ হইতেও দূরে সরিয়া থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, সেই সব সম্পর্কেও আল্লাহ্‌র দরবারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। — ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ছোট ছোট ও নগণ্য গুনাহসমূহ অবজ্ঞা করার— উহার বিন্দুমাত্র পরোয়া না করার একটা ভাবধারা মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়, "ইহা তো সামান্য ব্যাপার— ইহাতে আর কি হইবে" ভাবখানা যেন এইরূপ। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ মনোভাব কোনক্রমেই ভাল নয়। এই বেপরোয়া ভাব ঈমানদার লোকের পক্ষে বড়ই মারাত্মক! কেননা কবীরা গুনাহ যেমন মুসলমানকে জাহান্নামের বিপদে নিক্ষেপ করে, ছোট ছোট গুনাহের ব্যাপারটি তদপেক্ষা কিছুমাত্র সামান্য নহে। ছোট গুনাহ ছোটই বটে; কিন্তু তাহাই যদি বারবার করা হয়, তবে তাহা স্তূপীকৃত হইয়া পড়ে। তখন তাহা কবীরা গুনাহ অপেক্ষা অধিক মারাত্মক হইয়া পড়িতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ছোট ছোট গুনাহ করিতে করিতে মানুষ গুনাহের কাজে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। আর গুনাহের কাজে অভ্যস্ত হইলে গুনাহের প্রতি কোন ঘৃণাই থাকে না। গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার কোন প্রবণতাই আর অবশিষ্ট থাকে না। আর এই অবস্থা যাহার হয় সে যতবড়

ঈমানদারই হউক না কেন, তাহার পক্ষে বড় বড় (কবীরা) গুনাহতে লিপ্ত হওয়া খুব সহজ হইয়া পড়ে।

প্রসিদ্ধ মনীষী হাফেয ইবনে কায়্যিম লিখিয়াছেন ঃ গুনাহ কত ছোট সেদিকে খেয়াল দিও না বরং উহার মাধ্যমে যে আল্লাহ্র নাফরমানী করার দুঃসাহস করিতেছ, সেই আল্লাহ্র বিরাটত্ব ও মহানত্বকেই সম্মুখে রাখিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাক। তাহা হইলে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহও বরদাস্ত করার যোগ্য হইবে না। বস্তুত বিচার দিনের কঠিন কঠোর সাংঘাতিক রূপ যদি কোন ঈমানদারের মনে জাগ্রত থাকে তবে সে কোন ক্ষুদ্র গুনাহও ইচ্ছা করিয়া করিতে উদ্যত হইতে পারে না।

কুরআন মজীদের এক জায়গায় যদিও আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا - (النساء ٣١)

বড় বড় গুনাহ হইতে তোমরা বিরত থাকিলে ছোট ছোট গুনাহ আল্লাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের দাখিল করিবেন।

কিন্তু ইহার সহিত আলোচ্য হাদীসের কোন বিরোধ নাই। কেননা আয়াতটিতে প্রধানত আল্লাহর মাফ করিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আর আল্লাহ মাফ করিলে তো বড় বড় গুনাহও মাফ করিতে পারেন। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, ছোট ছোট গুনাহ দুঃসাহসিকতা, নির্ভীকতা ও বেপরোয়াভাবে করিলে তাহা আর ছোট গুনাহ থাকে না। তখন তাহা বড় গুনাহে পরিণত হয়। আকার-আকৃতিতে আর বাহ্য দৃষ্টিতে তাহা ছোট গুনাহ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা বারবার ও দুঃসাহসিকতা সহকারে করার কারণে বড় গুনাহ বলিয়াই গণ্য হইবে। আর আলোচ্য আয়াতে এই ছোট ছোট গুনাহ বারবার করিতে ও তাহাতে অভ্যস্ত হইতেই নিষেধ করা হইয়াছে। একজন মুমিনের ঈমানদার হিসাবে টিকিয়া থাকা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অটল অনুসারী হইয়া থাকার জন্য ছোট ছোট গুনাহ পরিহার করিয়া চলাও একান্তই আবশ্যক।

সাধারণ লোকদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ - (بخارى، مسلم)

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ যে লোক সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ বোধ করে না, তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলাও একবিন্দু রহম করেন না। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসের শব্দ اَلنَّاس সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং নির্বিশেষে সাধারণ মানুষই বুঝান হইয়াছে। ঈমানদার, কাফির, পরহেযগার ও ফাসিক— সব মানুষই ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি দয়া অনুগ্রহপূর্ব ব্যবহার করার তাগিদ করা হইয়াছে এই হাদীসে। সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ পোষণ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত এবং

কোন মানুষের প্রতি অকারণ ঘৃণা পোষণ না করাই ইসলামের নির্দেশ। শুধু তাহাই নয়, আল্লাহ্‌র রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়াও ইহারই উপর নির্ভরশীল। বস্তুত যে লোক আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশী সাধারণভাবে ও নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ করা তাহার কর্তব্য।

মানুষের নিকট দয়া-অনুগ্রহ লাভ করার অধিকার সকল শ্রেণীর সকল মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ক্ষেত্র বিশেষ দয়া-অনুগ্রহের রূপ স্বতন্ত্র ও অন্য নিরপেক্ষ হইতে বাধ্য। কাফির, ফাসিক ব্যক্তির প্রতিও দয়া-অনুগ্রহ পোষণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহার রূপ হইবে এই যে, এই দয়া-অনুগ্রহের দ্বারাই তাহাদিগকে কুফর ও ফিসক ফুজুরী হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহারা যে কঠিন পাপের মধ্যে নিমজ্জিত এবং তাহার পরিণতি যে অত্যন্ত মারাত্মক, এই কথা অন্তর দিয়া বুঝিতে ও তাহাদিগকে সে সম্পর্কে সাবধান করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বৈষয়িকতার দিক দিয়া কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলেও তাহাদিগকে যথাসম্ভব তাহা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ইহা যেমন মানবীয় চরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, তেমনি ইসলামী চরিত্রের দিক দিয়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تَحْسِنُوْا وَ اِنْ اَسَاؤُوْا فَلَا تَظْلِمُوْا - (ترمذی)

হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ তোমরা অপরকে দেখিয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত হইও না— এভাবে যে, তোমরা বলিবে ঃ অপর লোক ভাল কাজ ও ভাল ব্যবহার করিলে আমরাও ভাল কাজ, ভাল ব্যবহার করিব, অপর লোক যদি জুলুমের নীতি গ্রহণ করে, তবে আমরাও জুলুম করিতে শুরু করিব। বরং তোমরা নিজেদের মনকে এই দিক দিয়া দৃঢ় ও শক্ত করিয়া লও যে, অপর লোকেরা যদি অনুগ্রহ ও ভাল ব্যবহার করে তবে তোমরাও তাহা করিবে, আর অপর লোকেরা খারাপ ব্যবহার বা জুলুম করিলে তোমরা জুলুম ও খারাপ কাজ কখনো করিবে না। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা সাধারণ লোকদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা মানুষ হিসেবেই কর্তব্য। এই ব্যাপারে সাধারণভাবে কোন শর্ত আরোপ করা যায় না। দুনিয়ার লোকেরা পারস্পরিক দয়া-অনুগ্রহ ও ভাল ব্যবহার করুক আর নাই করুক— ইনসাফ করুক কিংবা জুলুম, উভয় অবস্থায় ইহসান করা, ভাল ব্যবহার করা, লোকদের হক আদায় করা, সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ করা ঈমানদার লোকদের একমাত্র কর্তব্য। শুধু তাহাই নয়, এইরূপ ব্যবহার তাহাদের প্রতিও করিতে হইবে, যাহারা ইহসানমূলক ব্যবহার করে না, ইনসাফ করে না, বরং জুলুম করে। মুমিনদের পক্ষে এইরূপ শর্ত আরোপ করাও ঠিক নয় যে, তোমরা আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিলে আমরাও তোমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিব। পরিবেশের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, সর্বাবস্থায় লোকদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন, ভাল ব্যবহার ও ইনসাফ করাই ইসলামের নির্দেশ। এই নির্দেশ পালন করা যে মুমিন মাত্রেরই কর্তব্য, তেমনি ইহা দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের পরিচায়ক।

নৈতিক চরিত্র গঠনের উপায়

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهٖ اِلٰى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يُزَيِّنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهٗ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِىْ- قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحْكِ فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِىْ - قَالَ لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَاتَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ - (بيهق، شعب الايمان)

হযরত আবূযর গিফারী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি একদিন রাসূলে করীমের খেদমতে হাজির হইলাম। অতঃপর (হযরত আবূযর, নতুবা তাহার নিকট হইতে হাদীসের শেষের দিকের কোন বর্ণনাকারী) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন (এই হাদীস এখানে বর্ণনা করা হয় নাই)। এই প্রসঙ্গে হযরত আবূযর বলিলেন, আমি বলিলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাকে নসীহত করুন। নবী করীম (স) বলিলেন, আমি তোমাকে নসীহত করিতেছি ঃ তুমি আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা ইহা তোমার সমস্ত কাজকে সুন্দর-সুষ্ঠু ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া দিবে। আবূযর বলেন ঃ আমি আরো নসীহত করিতে বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ তুমি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিও এবং আল্লাহকে সব সময়েই স্মরণে রাখিবে। কেননা এই তিলাওয়াত ও আল্লাহ্র স্মরণের ফলেই আকাশ রাজ্যে তোমাদের উল্লেখ করা হইবে এবং এই জমিনেও তাহা তোমার 'নূর' স্বরূপ হইবে।

আবূযর আবার বলিলেন ঃ হে রাসূল! আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বলিলেন ঃ বেশির ভাগ চুপচাপ থাকা ও যথাসম্ভব কম কথা বলার অভ্যাস কর। কেননা, এই অভ্যাস শয়তান বিতাড়নের কারণ হইবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে ইহা তোমার সাহায্যকারী হইবে। আবূযার বলেন, আমি বলিলাম ঃ আমাকে আরো কিছু নসীহত করুন। বলিলেন, বেশি হাসিও না, কেননা ইহা অন্তরকে হত্যা করে এবং মুখমণ্ডলের জ্যোতি ইহার কারণে বিলীন হইয়া যায়। আমি বলিলাম ঃ হযরত, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ সব সময়ই সত্য কথা ও হক কথা বলিও— লোকদের পক্ষে তাহা যতই দুঃসহ ও তিক্ত হউক না কেন। বলিলাম, আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে আদৌ ভয় করিও না। আমি বলিলাম ঃ আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বলিলেন ঃ তোমার নিজের সম্পর্কে তুমি যাহা জান, তাহা যেন তোমাকে অপর লোকদের দোষত্রুটি সন্ধানের কাজ হইতে বিরত রাখে।

— বায়হাকী, শুআবিল ঈমান

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসের প্রথম লক্ষ্যণীয় কথা এই যে, একজন সাহাবী রাসূলে করীমের নিকট নসীহত ও উপদেশ লাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং নসীহত করিত বলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত নসীহত করিলেন কিন্তু সংক্ষিপ্ত নসীহতে নসীহতপ্রার্থী সাহাবী মোটেই পরিতৃপ্ত হইতে ও ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। বরং বারবার নসীহত প্রার্থনা করিলেন, বারবার বেশি বেশি করিয়া নসীহত করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। এই ঘটনা আমাদিগকে এই পথ-নির্দেশই দেয় যে, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই কর্তব্য তাহার অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ, অধিক জ্ঞানী ও মুত্তাকী ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন সময় নসীহত শ্রবণ করা, তাহা কবুল ও পালন করা। বস্তুত কেবল আবূযার গিফারী একাই নহেন, প্রায় সমস্ত সাহাবীই রাসূলের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। সাধারণভাবেও শ্রবণ ও কবুল করিতেন এবং বিশেষভাবেও করিতেন। সমষ্টিগতভাবেও করিতেন এবং ব্যক্তিগতভাবেও তাহা করিতেন। ভাল চরিত্রবান হওয়ার অভিলাষী যাহারা, ইহা তাহাদের এক স্থায়ী স্বভাব।

আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) প্রথমত তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন। কেননা তাকওয়া মুমিন লোকদের সকল প্রকার কাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করিবার সুযোগ করিয়া দেয়। কাজেই যে লোক তাকওয়া অবলম্বন করিবে তাহার সমগ্র জীবন আনুগত্যশীল ও আল্লাহ্‌র বিধান পালনকারী হইয়া উঠিবে। তাহার ভিতর ও বাহির এবং অন্তর ও বাহিরের জীবন সুসংগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হইবে। তাহার জীবন হইবে সুদৃঢ় আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এক স্থায়ী নীতির অনুসারী।

তাহার পর কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র করার উপদেশ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা করিলে তাহার ফলে উর্ধ্বতম জগতেও তাহার কথা আলোচিত হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ —'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে আমিও তোমাদের স্মরণ করিব'। অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ "কোন বান্দা যখন এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র স্মরণ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মধ্যে তাহার স্মরণ ও আলোচনা করেন।" কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র স্মরণ করার আর একটা বরকত হইতেছে উহার ফলে এই দুনিয়ায় একটি নূর লাভ। যিকর ও তিলাওয়াতের নূর মূলত ব্যক্তির অন্তর্লোকেই প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু উহার স্ফূরণ ঘটে ব্যক্তির সমগ্র ব্যবহারিক জীবন পরিব্যাপ্ত করিয়া।

অতঃপর অধিক সময় চুপ করিয়া থাকিবার ও কথা কম বলিবার উপদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, ইহা এমন একটি হাতিয়ার, যাহার দ্বারা শয়তানকে বিতাড়িত করা যায়, শয়তানের ওয়াসওয়াসা হইতে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভবপর এবং দ্বীন পালনের ব্যাপারে ইহা হইতে বড়ই সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায়। বস্তুত যে লোক অধিক মাত্রায় কথা বলিতে অভ্যস্ত, চুপ থাকা যাহার স্বভাব বিরোধী, তাহার পক্ষে কোন মুহূর্তে শয়তানের ফেরেবে পড়া এবং দ্বীন পালনের দায়িত্ব ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব বা কঠিন কিছুই নয়। শাণিত তরবারির মতো অধিক চালু রসনার মারফতে শয়তান মানুষকে যত বিভ্রান্তিকর ও অনিষ্ঠকর কাজের মধ্যে ফেলিতে পারে তত আর কোন সূত্রে পারে না। মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, পরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা, গালাগাল করা, পরস্পরের নিকট পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লাগাইয়া শত্রুতার সৃষ্টি করা প্রভৃতি বড় বড় গুনাহ এই চুপ না থাকার কারণেই হইয়া থাকে। আর যে লোক অধিক চুপচাপ থাকিতে অভ্যস্ত, তাহার দ্বারা এই ধরনের অপরাধ কম হওয়াই সম্ভব।

তবে অধিক চুপচাপ থাকার অর্থ কখনো ইহা নয় যে, প্রয়োজনীয় কথাও বলিবে না। বরং উহার অর্থ হইতেছে প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত না বলা। আর ভাল ভাল কথা— দ্বীন-ইসলামের, কুরআন-হাদীসের কথা না বলাও উহার অর্থ নয়, এইকথা মনে রাখা আবশ্যক।

অতঃপর অধিক না হাসিবার উপদেশ দিয়াছেন। কারণ স্বরূপ বলিয়াছেন, অধিক হাসিবার ফলে অন্তর মুর্দা হইয়া যায়, চেহারা বা মুখমণ্ডল জ্যোতিহীন ও ম্লান মসিলিপ্ত হইয়া পড়ে। অন্তর মুর্দা হওয়ার অর্থ অধিকতর গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতা দেখা দেওয়া এবং অনুভূতির বিলুপ্তি ঘটে। মনুষ্যত্বের পক্ষে ইহা এক প্রকারের মৃত্যুও বটে। আর এই গাফিলতির অন্ধকারই— মনকে মারে, ব্যক্তির মুখমণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অথচ ঈমানদার লোকদের মুখমণ্ডল সব সময়ই উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হইয়া থাকে।

ইহার পর রাসূলে করীম (স) একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দান করিয়াছেন। তাহা হইতেছে, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে ভয় না করা। ভয় মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপারে; তবে ইসলামের নির্দেশ এই যে, ভয় কেবলমাত্র আল্লাহকেই করিবে, তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিবে না। বস্তুত যে লোক আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না, সে হয় নির্ভীক, বীর, সাহসী। কিন্তু যে লোক আল্লাহ ছাড়া আরো অন্য শক্তি বা ব্যক্তিকে ভয় করে তাহার মত ভীতু লোক কেহ হইতে পারে না। সকল ক্ষেত্রে তাহার মস্তক নতই থাকিবে, উন্নত কোথাও হইতে পারিবে না। এই ধরনের ব্যক্তির চরিত্র বলিতে কিছুই থাকিতে পারে না। ফলে সে দুনিয়ার সামান্য ও নগণ্য জিনিসের সম্মুখে মস্তক ধূলায় লুটাইয়া চরমভাবে লাঞ্ছিত হইবে। এই ধরনের ব্যক্তির চরিত্র বলিতে কিছুই থাকিতে পারে না। লাঞ্ছনা আর অবমাননাই তাহার ললাট লিখন হইয়া পড়ে।

আল্লাহ্‌র দ্বীন পালনের পথে যদি কেহ কোনরূপ বাধা দেয়, অত্যাচার নির্যাতন চালায়, তখন তাহা ভয় করিয়া দ্বীন পরিত্যাগ করিলে চরমভাবে এই লাঞ্ছনাই তাহার ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু কোন উৎড়ীন আর কোন উৎপীড়ককে বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া যদি আল্লাহ্‌র দ্বীন পালন করে, তাহা হইলে সাহস হিম্মতের উজ্জ্বল জ্যোতি তাহার ললাট দেশকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তোলে। পরিবেশের অবস্থায়ও মৌলিক পরিবর্তন আসে।

এই প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স) সর্বশেষ যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা এই যে, তোমার নিজের দোষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তুমি নিজে যাহা জান, তাহা সংশোধন ও বিদূরণে তোমাকে এতদূর আত্মনিয়োগ করিতে হইবে যে, তুমি সেই চিন্তা ও ব্যস্ততারই কারণে অপর লোকের দোষ-ত্রুটি খুঁজিবার বা দেখিলেও তাহা লক্ষ্য করার মাত্রই অবসর পাইবে না। যখনই শয়তান তোমাকে অপর লোকের দোষ প্রচারে প্ররোচিত করিবে, তখনই তুমি নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। ফলে তোমার নিজের সংশোধনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে আর অপরের দোষ প্রচারের গুনাহ হইতেও বাঁচিতে পারিবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَدَا الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ দ্বীন-ইসলাম অপরিচিত পরিবেশ ও অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছে, সেই প্রাথমিক অবস্থা পুনরায় অবশ্যই এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে; তখনকার অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।

— মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইহা যখন প্রথমে প্রচার হইতে শুরু করে, তখন সমস্ত পরিবেশ ইহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হইয়াছে। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট সমাজের নিকট ইহা অতি পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নূতন ও একেবারে অপরিচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যে সমাজে প্রথমত ইসলাম প্রচার হইতে শুরু করে, সে সমাজ সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে উহার কোনদিক দিয়াই মিল বা সামঞ্জস্য থাকে না। আর যে মুষ্টিমেয় লোক উহা প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা থাকে সমাজের নিকট অপরিচিত। পরবর্তী পর্যায়ে তাহারা ধীরে ধীরে পরিচিত হয় এবং গোটা সমাজের উপর ইসলাম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অবশ্য উত্তরকালে এমন একটি অবস্থা আসিতে পারে যখন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে না, উহার কোন একটি দিকও বাস্তবরূপে চালু হইতে দেখা যায় না। তখন একদল লোক নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হইয়া ইসলামকে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বভাবতই চেষ্টা করিতে শুরু করে। তাহারাও তখন সমাজের নিকট অপরিচিত ও অপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় কাজ আরম্ভ করে। এখানে নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন যে, গায়ের-ইসলামী সমাজে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সময় যাহারা চেষ্টা করিতে শুরু করে ও সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ও লাঞ্ছনা-অবমাননা বরদাশত করিয়া অনমনীয়ভাবে কাজ করিয়া যায় তাহাদের জন্য সুসংবাদ। এই সুসংবাদ ইহকাল পরকাল উভয় ক্ষেত্রের জন্যই নিশ্চিত। ইহকালের জন্য সুসংবাদ এই যে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ও প্রয়োজনীয় উপায়-উপাদান ও প্রস্তুতি সহকারে কাজ করিলে একদিন না একদিন আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে ও ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর পরকালীন সুসংবাদ এই যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া কিয়ামতের দিন তাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে।

এই হাদীসের উল্লেখিত 'আল গোরাবাউ' শব্দের অর্থ বুঝাইতে গিয়া নবী করীম (স) অপর একটি হাদীসে বলিয়াছেন ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ يَصْلِحُوْنَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ -

তাহারা সেই লোক, যাহারা আমার অন্তর্ধানের পর আমার প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে যাহা কিছু বিপর্যস্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহা বিদূরিত করিয়া উহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে।

অর্থাৎ নবী করীম (স) প্রতিষ্ঠিত ইসলমী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করা অতীব পূণ্যের কাজ। যাহারা সেই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবে, তাহাদের জন্য ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে বিশেষ সুসংবাদ রহিয়াছে।

عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ - (ترمذى)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ লোকদের এমন একটি সময়ও আসিবে, যখন দ্বীন-ইসলামের উপর যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তখন তাহার অবস্থা হস্তে জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণকারী ব্যক্তির মতোই হইবে। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা এখানে 'দ্বীন' অর্থ পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। এই দ্বীন কায়েম করার চেষ্টা হইলেই এবং কায়েম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই সমাজের প্রতিটি ফাসিকী ও কাফিরী শক্তি আতঙ্কিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। অনৈসলামী সমাজে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যাহারা চেষ্টা করিবে, তাহাদের উপর কঠোর বিপদ-মুসীবত আবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

আলোচ্য হাদীসে তাহাদিগকে হস্তে জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণকারী ব্যক্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। হাদীসের লক্ষ্য হইতেছে এই কথা বলা যে, এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করিয়া সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ও লাঞ্ছণা-যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করিয়াও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা ঈমানদার লোকদের কর্তব্য।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِيْ بِلَادِ اللّٰهِ - (ابن ماجه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র কোন অনুশাসন কার্যকরী করা আল্লাহর লোকালয়ে চল্লিশ রাত্র পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অপেক্ষাও উত্তম। — ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা আল্লাহ্র আইন ও শাসনের 'বরকত' বুঝাইবার জন্য হাদীসে বৃষ্টিপাতের দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে বৃষ্টিপাত— বিশেষ করিয়া মরু এলাকায়— আল্লাহ্র অতি বড় রহমত। তাহাতে সমস্ত এলাকার শস্য-শ্যামল সবুজ ও সতেজ হইয়া উঠে, জমি অত্যন্ত উর্বর হইয়া উঠে, মরা জমি জীবন্ত হয় ও বিপুল পরিমাণে ফসল দান করে। প্রাকৃতিক জগতে ইহা এক স্থায়ী নিয়ম। আলোচ্য হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র আইন জারী করার বাস্তব ফল মানুষের সমাজ জীবনে ঠিক অনুরূপই দেখা দেয়। আল্লাহ্র আইন জারী হইলে লোক-চরিত্র নির্মল ও দোষমুক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি সামাজিক কাজই যথাযথরূপে কার্যকর হয় বলিয়া সঠিক ফল দিতে শুরু করে। কোথাও দুর্নীতি, জুয়াচুরি, ধোঁকা-প্রতারণা ও চুরি-ডাকাতি থাকিতে পারে না। তখন সামান্য সম্পদ দ্বারাও লক্ষগুণ বেশি কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। আল্লাহ্র একটি আইন সঠিকভাবে জারী হইলেই এই বিরাট ফল পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে আল্লাহ্র সমস্ত আইন-কানুন— গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই— যদি পূর্ণ রূপে ও সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে মানুষের গোটা সমাজ জীবনে যে কি উন্নতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি দেখা দিতে পারে, তাহা মানুষের ধারণাতীত।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - (ترمذى، ابوداؤد مسند احمد، نسائ)

আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ জালিম ও নিষ্পেষণ-নির্যাতনকারী রাষ্ট্রক্ষমতার সম্মুখে স্পষ্ট সত্য কথা বলা অতি উত্তম জিহাদ।
— তিরমিযী, আবূ দাউদ, আহমদ, নাসায়ী

'সুলতান' অর্থ রাষ্ট্রশক্তি। রাষ্ট্র মানব সমাজের প্রতি আল্লাহ্‌র এক বিরাট দান, বিশেষ রহমত, সন্দেহ নাই। কেননা পার্থিব জীবন কোন সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র ভিন্ন শান্তিপূর্ণভাবে চলিতেই পারে না। এমন কি সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করাই যে মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাহাও বন্দেগী ভিত্তিক রাষ্ট্রশক্তি কায়েম না হইলে— কোনক্রমেই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব এই রাষ্ট্রশক্তিকে অবশ্যই সুবিচারক, সুষ্ঠু দায়িত্বশীল ও জনদরদী ও জনকল্যাণকামী হইতে হইবে। কিন্তু অবস্থা যদি ইহার বিপরীত হয়— যদি রাষ্ট্রশক্তি ভ্রান্ত লোকদের কুক্ষিগত হয় এবং তাহা জনগণের উপর অত্যাচার জুলুম ও নির্যাতন নিষ্পেষণ চালাইতে শুরু করে, তখন উহা মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র রহমত না হইয়া অভিশাপের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ অবস্থায় দুইটি মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। একদিকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও রহমতের চরম অবমাননা করা হয়, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ এই রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব ও সৃষ্টি করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইতেই পারে না। আর অপরদিকে আল্লাহ্‌র মখলুক— নিরীহ জনগণের জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়ে। মানুষের আর্তনাদে তখন আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়া উঠে।

এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য চেষ্টা করা সেই সমাজের জনগণের কর্তব্য। ইহার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল। আলোচ্য হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ এইরূপ রাষ্ট্রশক্তি ও সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা— বিপর্যস্ত অবস্থার পরিবর্তন করিয়া সুষ্ঠু আল্লাহ প্রদত্ত বিধান কায়েমের জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য। আর এই জিহাদের প্রথম পর্যায়ে কর্তব্য হইতেছে ঃ এইরূপ সরকারের স্পষ্ট ভাষায় তীব্র সমালোচনা করা, উহার যাবতীয় দোষক্রটি সাধারণ মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরা, তাহা মৌখিক কথা বা বক্তৃতা দ্বারাও হইতে পারে এবং লেখনীর সাহায্যে পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদির মারফতেও হইতে পারে। কেননা এইরূপ করার ফলে সরকারের পক্ষে দোষ-ক্রটি সম্পর্কে অবিহিত হওয়া এবং তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া সম্ভব। অন্তত উহার বিরুদ্ধে জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে যে কোন নিয়মতান্ত্রিক সুযোগের মাধ্যমে সমাজের আমূল পরিবর্তনও হইতে পারে।

অত্যাচারী শাসক রাষ্ট্রকর্তার সম্মুখে স্পষ্ট সত্য কথা কিংবা সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার কথা বলা উত্তম জিহাদ হইল কিরূপে ঃ আল্লামা খাত্তাবী ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকাশ্য শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ করিলে জয় হইবে কি পরাজয়, তাহা অনিশ্চিত থাকে। কিন্তু অত্যাচারী ও না-ইনসাফগার শাসক কিংবা রাষ্ট্রকর্তা তো জনগণের মধ্যেরই একজন। সে তো জনমনের সম্মান ও মূল্য রক্ষা করিয়া কাজ করিতে বাধ্য। জনগণের সম্মুখে তাহাকে আসিতেই হইবে। কাজেই জনগণই যদি তাহার অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে, তবে সে সহজেই অন্যায় কাজ ত্যাগ করিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সংশোধিত হইবে। অন্যথায় ক্ষমতার আসন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে। ফলে দেশবাসী এই অত্যাচারী শাসকের নিপীড়ন ও নির্যাতনের নির্মম নিষ্পেষণ হইতে চিরদিনের তরে মুক্তি লাভ করিবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ - (مسلم)

হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেহ কোন প্রকার অন্যায় ও পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলে যেন সে তাহার হাত দ্বারা তাহা অবশ্যই পরিবর্তন করিয়া দেয়। এইরূপ করিবার শক্তি না হইলে মুখ দ্বারা উহার পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করিবে, আর তাহাও সাহস না হইলে অন্তত মন দ্বারা উহার পরিবর্তন কামনা করিবে। আর ইহা হইতেছে ঈমানের দুর্বলতার পর্যায়। — মুসলিম

ব্যাখ্যা 'মুনকার' শব্দ অন্যায়, পাপ ও অল্লাহ্‌র নাফরমানীর যাবতীয় কাজকেই বুঝায় এবং এই ধরনের যে কোন কাজ বা অনুষ্ঠান দেখিলে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হইতেছে উহার পরিবর্তনের জন্য তৎপর হওয়া। বস্তুত এইরূপ অবস্থায় কোন ঈমানদার ব্যক্তিই নিষ্ক্রিয় নিস্তব্ধ ও নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। আলোচ্য হাদীসে অন্যায় ও পাপকে পরিবর্তন করার জন্য ক্রমিক পর্যায় ও অবস্থার তারতম্যের দৃষ্টিতে তিনটি উপায় পেশ করা হইয়াছে। প্রথম, হাত দ্বারা উহার পরিবর্তন করা। দ্বিতীয় মুখের ভাষা ও মুখপত্রের সাহায্যে উহার পরিবর্তনের চেষ্টা করা আর তৃতীয় হইতেছে মন দ্বারা উহার পরিবর্তনের কামনা করা। অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার জন্য লোকদের সামর্থের পার্থক্য ও অবস্থার বিভিন্নতার দৃষ্টিতে উল্লেখিত তিনটি উপায় প্রণিধানযোগ্য। কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির যদি ক্ষমতা থাকে, তবে নিজেদের হস্ত দ্বারা কিংবা ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াই উহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব না হইলে মুখে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে হইবে এবং সেইজন্য জনমত গড়িয়া তুলিতে হইবে। আর অবস্থা যদি এতদূর খারাপ হইয়া গিয়া থাকে যে, মুখেও প্রতিবাদ করা সম্ভব থাকে না, তখন অন্তত মন দ্বারা উহাকে খারাপ জানিতে হইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক পাপ, অন্যায় ও নাফরমানী পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র ইসলামী জীবন ধারার বাস্তবায়নের জন্য নীরবে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা না করিলে ঈমানের দাবি পূর্ণ হইতে পারে না; ঈমান যে আছে তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না।

মুসলিম শরীফেরই অপর এক বর্ণনায় হাদীসের শেষ কথাটি বলা হইয়াছে এই ভাষায় ঃ

وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ اِيْمَانٌ حَبَّةِ خَرْدَلٍ -

অন্যায় ও পাপ কাজকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা না করিলে ও তাহার পরিবর্তন কামনা না করিলে একবিন্দু পরিমাণে ঈমান আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

অপর দৃষ্টিতে এই সমগ্র হাদীসই আমাদের সম্মুখে একটি সুষ্ঠু কর্মনীতি উপস্থাপিত করিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে ঈমানদার লোকদের দায়িত্ব হইতেছে অন্যায় কি, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা। কেননা কোনটি অন্যায় এবং তাহা কতখানি অন্যায় তাহা জানা না থাকিলে

ও বুঝিতে না পারিলে উহার সম্পর্কে কোন নীতিই গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। সেই সঙ্গে প্রয়োজন জনগণের মধ্যে অন্যায়ের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করা, সাধারণভাবে সমাজে অন্যায় বিরোধী একটি মনোভাব সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মুখে, ভাষা-সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার মারফতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলা, জোরদার প্রতিবাদ উত্থাপন করা। ইহার ফলে জনমতের এক প্রবল শক্তির উদ্ভব হইবে। এই শক্তির সুষ্ঠু লালন ও সংহতি বিধানের মাধ্যমে অন্যায় প্রতিরোধক ও সত্য প্রতিষ্ঠাকামী এক দুঃসাহসী বীর মুজাহিদ দল গড়িয়া তোলা এবং শেষ পর্যায়ে এই শক্তির সাহায্যে কার্যত অন্যায়ের মূলোৎপাটন করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অপরিহার্যতা

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلًى لَنَا اَنَّهُ سَمِعَ جَدِّيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَا نِيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّنْكِرُوْا فَلَا يُنْكِرُوْا فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ - (شرح السنة)

আদী ইবনে আলী আলকুন্দী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের এক মুক্ত ক্রীতদাস আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে আমার দাদাকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছে যে, আমি নবী করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছিন ঃ আল্লাহ্‌ কখনো বিশেষ লোকদের (অপরাধমূলক) কাজের কারণে সাধারণ লোকদের উপর আযাব নাযিল করেন না। কিন্তু তাহারা (সাধারণ লোক) যদি তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পায় এবং তাহারা উহার প্রতিবাদ করিতে ও উহা বন্ধ করিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাহা বন্ধ না করে কিংবা প্রতিবাদ না করে, তাহা হইলে ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা সাধারণ লোক ও বিশেষ লোক— সকলকে একই আযাবে নিক্ষেপ করেন।

— শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা দুনিয়ার মানুষের উপর আযাব নাযিল হওয়ার একটি স্থায়ী নিয়ম রহিয়াছে। আলোচ্য হাদীসে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শুধু শুধুই আযাবে নিমজ্জিত করেন না; বরং তিনি আযাব দেন মানুষের নিজেদের অপরাধের কারণে। তাহাতেও এই নীতি পালিত হয় যে, বিশেষ লোকের অপরাধে সাধারণ মানুষকে আযাবে নিক্ষেপ করেন না। তখন আযাব আসিলে তাহা সেই বিশেষ বিশেষ লোকদিগকেই গ্রাস করে, সাধারণ মানুষ সেই আযাব হইতে রক্ষা পাইয়া যায়।

ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, রাসূলে করীম (স) সাধারণভাবে মানব সমাজকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। একভাগ হইতেছে সমাজের বিশেষ বিশেষ লোক; আর দ্বিতীয় ভাগ হইতেছে জনসাধারণ। মনে রাখা আবশ্যক যে, ইহা বংশ, অর্থ, পেশা ইত্যাদির দৃষ্টিতে কোন শ্রেণী বিভাগ নয়— ইসলাম তাহা সমর্থন করে না। বরং জ্ঞান-বুদ্ধি, বিদ্যা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদির দিক দিয়া প্রত্যেক সমাজেই যে দুই শ্রেণীর লোক স্বভাবতই বর্তমান থাকে, এখানে সেই কথাই বলা হইয়াছে। এবং বলা হইয়াছে যে, বিশেষ লোকদের অপকর্মের দরুণ আল্লাহ্‌ তা'আলা সাধারণ মানুষকে কখনো আযাব দেন না— আযাব দেওয়া আল্লাহ্‌র নিয়ম নহে। কিন্তু যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, বিশেষ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে নাফরমানী ও পাপানুষ্ঠান হইতে সাধারণ লোকেরা দেখিতে পায়, কিন্তু তাহা বন্ধ

করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহা বন্ধ না করে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার চিরন্তন ও স্থায়ী নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে এবং বিশেষ শ্রেণীর লোকদের অপকর্মের দরুন সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকে আযাব দিতে কুণ্ঠিত হন না।

আলোচ্য হাদীস হইতে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, ভাল কাজ হউক আর মন্দ কাজ হউক— সমস্ত কিছুরই মূল চাবিকাঠি কার্যত সমাজের বিশেষ লোকদেরই মুষ্টিবদ্ধ থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমাজের সেই বিশেষ লোকদের নিয়ন্ত্রণ করা ও তাহাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে থাকে দেশেরoজনগণেরই হাতে। জনগণ ইচ্ছা করিলে সমবেত ও সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে এই বিশেষ লোকদের পাপানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে ও তাহাদের যাবতীয় পাপানুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহারা যদি নিজেদের সম্মুখে সুস্পষ্ট নাফরমানী অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও চুপচাপ বসিয়া থাকে, উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ না করে, যদি উহার প্রতি বিন্দুমাত্র নমনীয়তা প্রদর্শন করে, এমনকি এই পাপাচারী, দ্বীন ও ঈমানের দুশমন শক্তিসম্পন্ন শাসক বা নেতৃবৃন্দকে পরিবর্তন করিয়া আল্লাহ্র অনুগত দ্বীন পালনকারী ও আল্লহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া চেষ্টা না চালায়, তাহারা প্রকাশ্যভাবে নাফরমানী করিয়া ও জনগণকে চুপ থাকিতে বাধ্য করিয়া আল্লাহ্র সর্বাত্মক আযাব আসার পথ সুগম করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই বিশেষ ও সাধারণ সকল মানুষই আল্লাহ্র আযাবে নিষ্পেষিত ও ধ্বংস হইয়া যাইতে বাধ্য হইবে। যাহার ফলে বিশেষ ও সাধারণ লোক নির্বিশেষে সমাজের সমস্ত মানুষের উপরই আল্লাহ্র সর্বধ্বংসী আযাব ও গযব নাযিল হয়। আর তখনকার সেই আযাব হইতে কেহই রক্ষা পাইতে পারে না। জনগণের মধ্যে এক-একজন লোক ব্যক্তিগভাবে যতই আল্লাহ-ওয়ালা হউক না কেন, এই পাপাচারী শাসকদের ব্যভিচার ও জুলুম হইতে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করার সামগ্রিক দায়িত্ব পালন না করিলে তাহারা নিজেরাও আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচিতে পারে না।

নিম্নলিখিত হাদীসেও এই কথারই জোর তাগিদ এবং তীব্রতা সহকারে উল্লেখ হইয়াছে ঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ - (ترمذى)

হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, সেই মহান আল্লাহ্র শপথ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, নিশ্চয়ই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অবশ্য অবশ্যই তোমরা অন্যায় ও পাপ কাজ হইতে নিষেধ করিবে। অন্যথায় আল্লাহ তাহার নিজের তরফ হইতে তোমাদের উপর কঠিন আযাব পাঠাইবেন। অতঃপর তোমাদিগকে একেবারেই পরিত্যাগ করা হইবে এবং তখন তোমাদের কোন দো'আও কবুল করা হইবে না। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার'— অর্থাৎ ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দান এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হইতে লোকদের বিরত রাখার কাজ করা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি

মুসলমানের এবং সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম জাতির অপরিহার্য কর্তব্য'। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ না করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই এককভাবে আল্লাহ্‌র নিকট গুনাহগার সাব্যস্ত হইবে এবং সমাজগত ও সামগ্রিক পর্যায়ে মুসলিম জাতি যদি এই কাজ না করে, তাহা হইলে গোটা জাতিই আল্লাহ্‌র দরগাহে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই কাজ করিতে হইবে প্রথম, ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, আকীদা, বিশ্বাস ও আদর্শবাদিতার সাহায্যে এবং দ্বিতীয়ত, নিজস্ব বাস্তব জীবন, চরিত্র, লেনদেন ও ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের মারফতে। এই উভয় দিক দিয়াই একজন ব্যক্তি যখন প্রমাণ করে যে, সে নিজে আল্লাহ্‌র দেওয়া আদর্শকে একমাত্র সত্য আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার মন-মগজে একমাত্র সত্যেরই প্রভাব রহিয়াছে, তাহার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী সৎ এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তব কাজের মধ্যে সে যদি একমাত্র সত্যের আদর্শকেই অনুসরণ করিয়া চলে ও সত্য বিরোধী কোন কাজকেই সে জীবনে প্রশ্রয় না দেয়, বরং সকল প্রকার অন্যায়, পাপ ও জুলুম হইতে সে কার্যত বিরত থাকে, তাহা হইলে 'আমর বিন মা'রূফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' করার প্রথম দায়িত্ব সে পালন করিল। অতঃপর দ্বিতীয় দায়িত্ব হইল অন্যান্য লোকদিগকেও সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো ও অন্যায়-পাপ হইতে বিরত থাকার জন্য জনগণকে অনুপ্রাণিত করা। ইহা করিতে পারিলে আলোচ্য দায়িত্ব ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পূর্ণরূপেই আদায় হইতে পারে।

কিন্তু 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার'-এর কাজ এত ব্যাপক যে, ব্যক্তিগণের শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারাই উহার যাবতীয় দায়িত্ব পালন হইতে পারে না, সেই জন্য সমষ্টিগত পর্যায়েও এককভাবে চেষ্টানুবর্তী লোকদের সমন্বয়ে সামগ্রিক প্রচেষ্টারও একান্ত আবশ্যক এবং এই পর্যায়ের প্রচেষ্টা সঠিকরূপে সম্পন্ন হইতে পারে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মারফতে। সেই কারণে একই সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরাসরি আন্দোলন করা মুসলমানদের কর্তব্য।

এই উভয় প্রকার প্রচেষ্টা না চালাইলে আল্লাহ্‌র ব্যাপক ও সর্বাত্মক আযাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُمْ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتُوْا - (ابوداؤد)

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী করীম (স) কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, যে জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি পাপকার্য করিত থাকে, সেই জাতির লোকেরা তাহার পাপকার্য করার পথ বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াও যদি তাহারা তাহা না করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতরূপে তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের উপর এক কঠিন বিপদ ও আযাব চাপাইয়া দিবেন — আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা এখানে একদিকে ব্যক্তিগত পাপ এবং অপরদিকে উহার প্রতিরোধের জন্য সামর্থ্য উল্লেখ করিয়া নবী করীম (স) ইরশাদ করিতেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে সমাজের মধ্যে কেহ পাপ কাজে লিপ্ত হইলে সমাজ সমষ্টির কর্তব্য হইতেছে সেই ব্যক্তির জীবন-পথ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া,

নাফরমানীর পথ হইতে তাহাকে আল্লাহ্‌র ফরমাবরদারীর পথে চালাইয়া দেওয়া। বস্তুত ইহা ব্যক্তির মুকাবিলায় সমষ্টির দায়িত্ব। সমাজ বা সমষ্টি যদি এই দায়িত্ব পালন না করে এবং ব্যক্তিকে পাপাচার, ব্যভিচার ও আল্লাদ্রোহিতার পথে চলিতে অবাধ সুযোগ দান করা হয়, তাহা হইলে তখন গোটা জাতিই কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হইতে বাধ্য হয়। হাদীসে বলা হইয়াছে যে, এই আযাব সবই গোটা জাতিকে দেওয়া হইবে সমষ্টিগতভাবে, উহার মৃত্যুর পূর্বে এই দুনিয়ার জীবনেই। যতদিন পর্যন্ত সেই জাতি দুনিয়ার বুকে বর্তমান থাকিবে, ততদিন তাহারা এই আযাব ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

"মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে কোন না কোন আযাবে নিক্ষেপ করিবে" বলা হইয়াছে; কিন্তু সে আযাব কি ধরনের হইতে পারে ? তাহা শারীরিক না মানসিক, রাজনৈতিক কি সাংস্কৃতিক, আর্থিক কি প্রশাসনিক, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিংবা সমষ্টিগত পর্যায়ে হইবে, হাদীসে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। এই কারণেই বুঝা যায় যে, এই সব রকমের আযাবই হইতে পারে, হইতে পারে এইগুলির মধ্য হইতে বিশেষ কোন এক প্রকারের আযাব। তবে মৃত্যুর পূর্বে এই দুনিয়ায়ই যে এই আযাব ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মানুষ হয়ত আযাব ভোগ করিয়াও বুঝিতে পারিবে না যে, তাহার উপর আযাব হইতেছে কিংবা এই আযাবকেই মনে করিতে শুরু করিবে উন্নতি, সমৃদ্ধি, শান্তি ও সুখ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ فِىْ الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْا هُمْ فِى مَجَالِسِهِمْ وَاَكَلُوْا هُمْ وَشَارَبُوْا هُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسٰى ابْنَ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَجَلَس رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ لَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ حَتّٰى تَاطِرُوْهُمْ اِطْرًا - (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈল বংশের লোকরা যখন আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাহাদের আলিমগণ প্রথম দিক দিয়াই তাহাদিগকে নিষেধ করিতে থাকেন। কিন্তু লোকেরা তাঁহাদের কথানুযায়ী পাপকাজ হইতে বিরত হয় না। অতঃপর সেই আলিমগণই বনী ইসলাঈল বংশের পাপী লোকদের সঙ্গে একত্রে উঠাবসা ও পানাহার করিতে শুরু করেন। ফলে আল্লাহ তাহাদের পরস্পরের মনকে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত করেন। ইহার পর হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাহাদের দ্বারা তাহাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করা হয়। (এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হইয়াছে যে,) এই অভিশাপের একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তাহারা নিজেরা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়াছে ও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘনেই লিপ্ত রহিয়াছে। হাদীস বর্ণনাকারী বলিতেছেন ঃ এই কথা বলার সময় পর্যন্ত নবী করীম (স) পিছনদিকে হেলান দেওয়া অবস্থা বসিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন ঃ নয়, কখনও নয়, যে

মহান আল্লাহ্র হস্তে আমার প্রাণ নিহিত, তাঁহার শপথ; এইরূপ নাফরমানীর ফলে আযাব আসিবেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্র নাফরমান লোকদিগকে সত্য ও ফরমাবরদারীর দিকে ফিরাইয়া না আনিবে। — তিরমিযী

আবূ দাঊদ শরীফে হাদীসের শেষাংশের কথাটি নিম্নরূপ

قَالَ كَلَّا وَاللّٰهُ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَاْطِرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اِطْرَءً وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا اَوْلَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ - (ابوداؤد)

নবী করীম (স) বলিয়াছেন, ইহার ব্যতিক্রম কখনও হইতে পারে না, আল্লাহ্র শপথ, হয় তোমরা অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে ন্যায় কার্যের প্রতিষ্ঠা করিবে ও অন্যায় পাপ কাজ হইতে লোকদের বিরত রাখিবে এবং জালিমের হস্ত ধারণ করিয়া তাহার জুলুম বন্ধ করিয়া দিবে ও তাহাকে অন্যায় পথ হইতে ফিরাইয়া সত্যের পথে পরিচালিত করিবে, তাহাকে একমাত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মনকে পরস্পরের সংঘাতে পাপজর্জরিত করিয়া দিবেন এবং শেষ পর্যন্ত পূর্বকালের পাপীদের ন্যায় তোমাদের উপর অভিশাপ নাযিল করিবেন। — আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা অতীত ইতিহাসের ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতি বনী ইসরাঈলের অধঃপতনের মূল কারণ এই হাদীসদ্বয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, প্রথম যখন তাহারা পাপকার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের মধ্যে অবস্থিত আলিম ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে এই পাপ কাজ করিতে নিষেধ করেন ও তাহা হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদের এই চেষ্টা অব্যাহতভাবে চালু থাকিতে পারে নাই; কিছু দিন পর যখন তাহারা দেখিলেন যে, পাপলিপ্ত জনগণ তাহাদের নিষেধবাণীর দিকে কর্ণপাত করিতেছে না, তখন তাঁহারা তাঁহাদের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন। শুধু তাহাই নয়, পাপীদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করিয়া ও তাহাদের পাপকার্যের প্রতিবাদ করার পরিবর্তে তাহারা পাপীদের সঙ্গে সর্বদিক দিয়া মিলিয়া মিশিয়া গেলেন, তাহাদের সঙ্গেই উঠা-বসা, খানাপিনা অনুষ্ঠিত হইতে শুরু হইল। পাপীদের প্রতি কিংবা পাপীদের পাপকার্যের প্রতি তাহাদের মনে যে একবিন্দু ঘৃণা রহিয়াছে, উহারও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। ফলে পাপীদের প্রভাব ও তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের কারণে ইসরাঈল বংশের আলিমদের মন ও ঈমান খারাপ হইয়া গেল। অতঃপর তাহাদের উপর আল্লাহ্র তরফ হইতে সর্বাত্মক আযাব ও অভিশাপ নাযিল হয়।

আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসের এই অংশ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র মৌখিক ইসলাম প্রচার, সত্যের দিকে আহ্বান ও পাপ কাজ হইতে মৌখিক নিষেধ এই আযাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নহে। বরং স্পষ্ট বলা হইয়াছে, জালিমের হস্ত ধরিয়া জুলুম হইতে তাহাদের সত্যের পথে পরিচালিত ও সত্যের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে হইবে। এইজন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা বর্তমান যুগে একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমেই লাভ করা যাইতে পারে। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে এইরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা এবং এই রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা মুসলমানদের জন্য দ্বীনি ফরয।

প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন হাদীসের অসংখ্য জায়গায় 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' করিবার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, 'আমর' শব্দের অর্থ কেবল মৌলিক হুকুম দেওয়া হইতে পারে না; বরং উহার সঠিক অর্থ হইতেছে শক্তি প্রয়োগে কোন কার্য সম্পাদন করানো। অনুরূপ 'নাহী' অর্থ মৌখিক 'নাহী' বা নিষেধ করা নয়, বরং উহার সঠিক অর্থ হইতেছে কোন কাজ হইতে লোকদিগকে শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে বিরত রাখা। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করিয়া শুধু মৌখিক প্রচারের সাহায্যে যাহারা এই বিরাট মহান দায়িত্ব পালনের প্রহসন করেন, তাঁহারা কুরআন ও হাদীসের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নিজেদের নফসের দ্বারা পরিচালিত হন মাত্র। আর এইজন্যই আমরা সর্বত্র দ্বিতীয় অবস্থা— পরস্পরের মনকে পারস্পরিক সংঘাতে পাপ-প্রভাবান্বিত করিয়া দেওয়ার বাস্তব নির্দশন— দেখিতে পাইতেছি এবং এই জাতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ হইতে আজিও মুক্তি পাইতে পারিতেছে না।

বুদ্ধিজীবী সমাজের কর্তব্য

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَا قِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا السَّفِيْنَةَ فَصَارَبَعْضُهُمْ فِىْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَعْلَا هَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ اَعْلَا هَا فَتَاَذَّوْابِهٖ فَاَخَذَ فَاْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتُوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلَابُدَّلِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ -

নু'মান ইবনে বশীর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত আইন-সীমা সম্পর্কে উদারনীতি পোষণকারী এবং উহার লংঘনকারী লোকদের দৃষ্টান্ত হইতেছে সেই লোকসমষ্টির ন্যায়, যাহারা একখানি নৌকায় সওয়ার হইবার জন্য 'কোরয়া' ধরিয়াছে এবং উহার ফল অনুযায়ী কিছু লোক উহার উপরিভাগে আরোহণ করেন, আর কিছু লোক বসে উহার নীচের তলায়। নীচের দিকে যাহারা ছিল তাহারা পানি লইয়া উপরিভাগে উপবিষ্ট লোকদের কাছ থেকে যাতায়াত করিত। ইহাতে উপরিভাগের লোকদের বড়ই কষ্ট অনুভব হইত। ইহা দেখিয়া নীচের ভাগের লোকদের মধ্য হইতে একজন কুঠার লইয়া নৌকার তলা ছিদ্র করিতে উদ্যত হইল। এই সময় উপর তলার লোকেরা তাহার নিকট আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল ঃ তুমি ইহা কি করিতেছ ? সে উত্তর দিল ঃ তোমরা আমার যাতায়াতের দরুন কষ্ট অনুভব কর, অথচ পানি আমার না হইলেই চলে না। এইরূপ অবস্থায় উপর ভাগের লোকেরা যদি উহার হস্ত ধারণ করিয়া থামাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকেও ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে

এবং নিজেরাও বাঁচিতে পারে। আর তাহাকে যদি ঐরূপ অবস্থায়ই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা নিজেরাও ধ্বংস হইবে এবং অন্যান্য লোকদেরও ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে।

— বুখারী শরীফ

ব্যাখ্যা আল্লাহর তা'আলা মানুষের জন্য যে বিধান নাযিল করিয়াছেন, তাহাই চূড়ান্ত বিধান। সেই বিধানে শরীয়তের যে সীমা নির্ধারিত হইয়াছে মানুষের তাহা পুরাপুরি রক্ষা ও পালন করিয়া চলা আবশ্যক। আল্লাহ্র এই বিধান এবং শরীয়তের নির্ধারিত এই সীমাসমূহ সম্পর্কে তিন প্রকারের আচরণ হইতে পারে। প্রথমত আল্লাহ্র সৃষ্ট মানুষ হিসাবে আল্লাহ্র বিধান অকুণ্ঠিত চিত্তে মানিয়া লওয়া হইবে এবং শরীয়তের সীমাসমূহকে যথোপযুক্ত মর্যাদাসহকারে রক্ষা করা হইবে। অন্তত প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির প্রতি ইহারই আশা করা হয়। দ্বিতীয়, এই সম্পর্কে উদার নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে যে, কেহ যদি তাহা পালন না করে, কিংবা শরীয়তের সীমা লংঘন করিতে দেখিয়া তাহা নীরবে সহ্য করা— বিশেষ করিয়া বড় লোকদিগকে শরীয়তের সীমা লংঘন করিতে দেখিয়া কিছুই না বলা। আর তৃতীয়ত, নিজেরাই সক্রিয়ভাবে শরীয়তের সীমা লংঘন করা। এই শেষোক্ত দুইটি আচরণ যথাক্রমে মুনাফিক ও কাফিরদের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। আর আল্লাহ্র শরীয়ত সম্পর্কে এই শেষোক্ত দুই প্রকারের আচরণ দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, এই ধরনের আচরণের ফলে এক একটি জাতি চিরতরে ধ্বংস ও বিলুপ্তও হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই কথাটি নবী করীম (স) একটি রূপক দৃষ্টান্ত দ্বারা খুব চমৎকারভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি এজন্য একটি নৌকার দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন, যাহাতে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের মধ্যে 'কোরয়ার' সাহায্যে আসন বন্টন করিয়া কেহ উপর তলায় বসিয়াছে আর কেহ নীচের তলায় আসন গ্রহণ করিয়াছেন। নীচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক, আর পানির নল যেহেতু উপর তলায় অবস্থিত, সেই কারণে পানির জন্য উপর তলায় তাহারা খুব বেশি যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাতে উপর তলায় অধিবাসীদের সামান্য কষ্ট হওয়ায় তাহারা নীচের তলার লোকদের উপর তলায় আসিতে একেবারে নিষেধ করিয়া দেয়। কিন্তু নিচের তলার লোকদের পানি না লইয়া কোনই উপায় নাই। উপর তলার কল হইতে পানি না পাইলে তাহারা স্বাভাবিকভাবেই নৌকার তলা ছিদ্র করিয়া পানি লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু তাহা করিতে যদি কেহ উদ্যত হয় তখন সমগ্র নৌকারোহীদের সম্মুখে দুইটি পরিণাম উপস্থিত। প্রথমত নৌকার তলা ছিদ্র করিতে দিলে এবং তাহাকে এই মারাত্মক কাজ হইতে বিরত না করিলে গোটা নৌকাই সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত হইবে। আর তাহার ফলে উপর তলার লোকেরাও ডুবিয়া মরিবে এবং নীচের তলার লোকেরাও। দ্বিতীয়ত তখন যদি সকলে মিলিয়া এই আত্মঘাতি কাজ হইতে তাহাকে বিরত রাখে ও তাহার স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ করার সঠিক পন্থা তাহার নিকট অবাধ করিয়া তোলে, তবে তাহারা সকলেই অনিবার্য ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা নবী করীম (স) এই কথাই বুঝাইয়াছেন, সমাজের লোকদের জীবন বিধান সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য সুষ্ঠু নিয়মতন্ত্র সম্মত ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সমাজের দায়িত্বশীল লোকদের এই জন্য শুধু প্রস্তুত হইয়া থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং অগ্রসর হইয়া দেখা আবশ্যক যে, কাহার কি প্রয়োজন এবং তাহা পূরণ করার কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অন্যথায় সমাজের নিয়মতন্ত্র বিরোধী ও শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপ শুরু হইয়া যাওয়া অবধারিত।

দ্বিতীয়ত, সমাজের কোন লোক যদি ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ও সেই জন্য উদ্যত হয়, যাহার পরিণামে গোটা সমাজেরই ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাহা এক মুহূর্তের তরেও বরদাশত করা উচিত নয়; বরং উহার প্রতিরোধ করা ও উহাকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। সমাজ জীবনের জটিল সমস্যা এবং উহার সঠিক সমাধান-পন্থা কি হতে পারে, তাহা অনুধাবন করার জন্য এই হাদীসটি জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে একটি অফুরন্ত অমিয় উৎসের মর্যাদা রাখে।

ইসলামী আন্দোলনে যোগদানের সুফল

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيْهِ شَيْئٌ مِّنْ مَّاءٍ وَّبَقْلٍ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِاَنْ يُّقِيْمَ فِيْهِ وَيَتَخَلّٰى مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اُبْعَثْ بِالْيَهُوْدِيَّةِ وَلَابِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلٰكِنِّىْ بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَغَدْوَةٌ اَوْرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا وَلَمَقَامُ اَحَدِكُمْ فِىْ الصَّفِّ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِهٖ سِتِّيْنَ سَنَةً - (مسند احمد)

আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমরা একদা কোন এক যুদ্ধে যাত্রাকালে নবী করীম (স)-এর সঙ্গে (মদীনা হইতে) বাহির হইলাম। তখন আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি এমন এক পর্বত গুহায় যাইয়া পড়ে, সেখানে কিছু পরিমাণ পানি ও শাক-সব্জি বর্তমান ছিল। তাহা দেখিয়া সেই ব্যক্তির মনে সেখানেই থাকিয়া যাওয়ার ও দুনিয়ার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া গুহাবাসী হওয়ার ইচ্ছা জাগে। পরে এই সম্পর্কে সে নবী করীম (স)-এর নিকট অনুমতি চাহিলে তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ জানিয়া রাখ, আমি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানী মতাবাদসহ দুনিয়ায় প্রেরিত হই নাই; বরং আমি আল্লাহ্‌মুখী সত্য, সহজ ও সঠিক জীবনাদর্শ সহ প্রেরিত হইয়াছি। যে মহান আল্লাহ্‌র মুষ্টিতে মুহাম্মাদের প্রাণ নিবদ্ধ তাঁহার শপথ করিয়া বলি, সকালবেলা কিংবা সন্ধ্যাবেলা আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় বাহির হওয়া সমগ্র দুনিয়া এবং তন্মধ্যস্থ যাবতীয় জিনিস হইতে অতি উত্তম কাজ। উপরন্তু (দ্বীন-ইসলাম কায়েমের জন্য গঠিত জামা'আত কিংবা) বাস্তব জিহাদের কাতারে তোমাদের কাহারো দণ্ডায়মান হওয়া তাহার ষাট বৎসরের নফল নামায অপেক্ষা কল্যাণকর।
— মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। প্রথম কথা এই যে, দুনিয়ার বৈষয়িক ও সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া গুহাবাসী হওয়া— তাহা যতই আরামদায়ক হউক না কেন— ইসলামের দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র সমর্থনযোগ্য নহে। দ্বিতীয়ত বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (স) যে দ্বীন-ইসলাম লইয়া দুনিয়ায় তশরীফ আনিয়াছিলেন, তাহা ইয়াহূদী ধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের ন্যায় দুই-চারিটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন বৈরাগ্যবাদী বিধান নহে। বরং তাহা এমন এক জীবন বিধান যাহা একদিকে যেমন আল্লাহমুখী সত্যাদর্শ তেমনি তাহা অত্যন্ত

সুষ্ঠু সহজ ও পবিত্রতাসম্পন্ন বাস্তব কর্মব্যবস্থা। খ্রিস্টধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম নবী করীম (স)-এর যুগেও মানুষের জীবন সম্পর্কে কোন কর্মের আদর্শ ও সুস্পষ্ট বিধান দিতে পারে নাই। বরং তাহা মানুষকে বাস্তব জীবনের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিবারই নির্দেশ দেয়। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, এই উভয় ধর্মেই এক শ্রেণীর লোক পৌরহিত্যের পেশা অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে বৈষয়িক জীবন সংক্রান্ত কোন কাজ করা এমনকি বিবাহ-শাদী করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলাম তাহা আদৌ সমর্থন করে না। আর তৃতীয় কথা এই যে, এহেন দ্বীন-ইসলামকে কায়েম করার জন্য চেষ্টা করা, সেই জন্য সকাল সন্ধ্যা প্রচারকার্য চালানো, জনমত গঠনের জন্য আন্দোলন করা সমগ্র দুনিয়া ও উহার যাবতীয় জিনিস অপেক্ষা উত্তম। এমনকি ইসলামকে কায়েম করিবার জন্য গঠিত জামা'আতের সারিতে দণ্ডায়মান হওয়া এবং সেই জন্য অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শরীক হওয়া ষাট বৎসর পর্যন্ত নফল নামায পড়া অপেক্ষাও অনেক বেশি সওয়াবের কাজ। যেহেতু নফল নামাযের মূল্য ঠিক তখনই হইতে পারে, যখন ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আর ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করার জন্য জামা'আতবদ্ধ হইয়া আন্দোলন ও প্রচেষ্টা চালানো এবং ইসলামের দুশমনদের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া গত্যন্তর নাই। কাজেই নফল নামায ও অন্যান্য নফল ইবাদত অপেক্ষা আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম করার জন্য সাধনা ও সংগ্রাম যে আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সওয়াবের কাজ তাহা বুঝিতে কাহারো কষ্ট হওয়ার কথা নহে।

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ اَنْ قَدْ حَفَرَهُ شَىْءٌ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ - يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَدْعُوْنِىْ فَلَا اُجِيْبَكُمْ وَتَسْاَلُوْنِىْ فَلَا اُعْطِيْكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِىْ فَلَا اَنْصُرُكُمْ - (مسند احمد، ابن ماجه)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একদা রাসূলে করীম (স) আমার ঘরে আসিলেন। তখন তাহার মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার মনে হইল যে, কোন জিনিস যেন তাহাকে আঘাত করিয়াছে। অতঃপর তিনি অজু করিলেন এবং বাহির হইয়া গেলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না। আমি হুজরার ভিতর হইতেই তাঁহার নৈকট্যে উপস্থিত হইলাম। তখন আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন, "হে জনসমাজ, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই বলিয়াছেন যে, তোমরা অবশ্য অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হইতে লোকদের বিরত রাখিবে সেই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে, যখন তোমরা আমাকে ডাকিবে; কিন্তু আমি সাড়া দিব না। তোমরা আমার নিকট চাহিবে; কিন্তু আমি তোমাদিগকে দিব না। তোমরা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে, কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করিব না। — মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় প্রথমে যে পরিপ্রেক্ষিত স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহা যে অতিশয় ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং অনুভূতি ও মানসিক অবস্থার দিকে দিয়া তীব্র ও গুরুতরতায় ভরপুর ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাসূলে করীম (স) যখন ঘরে আগমন করিলেন, তখন তাহার মুখমন্ডল দেখিয়াই হযরত আয়েশা (রা) এইকথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উপরন্তু রাসূলে করীম (স) যে অজু করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু কাহারো সাথে তিনি একটি কথাও বলিলেন না, ইহাত পরিবেশের ঘনত্ব ও নিবিড়তা আরো প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে নবী করীম (স) যে কথাটি বলিলেন, তাহা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা তাহার নিজের কোন কথা ছিল না, কথাটি ছিল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার। ইহা হইতে দুইটি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে। এটি এই যে, এই সময় তাঁহার প্রতি আল্লাহ্র নিকট হইতে ওহী নাযিল হইয়াছে। সেই কারণেই নবী করীমের মুখমণ্ডলের অবস্থা ছিল সেইরূপ যাহা হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা হইতে জানা গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, রাসূলের প্রতি এমন অনেক ওহীই নাযিল হইয়াছে, যাহা ঠিক কুরআনের আয়াত নয়, কুরআনের মধ্যে তাহা সন্নিবেশিতও হয় নাই— তাহাই হাদীস।

মূল কথাটি হইল এই যে, তোমরা 'আমর বিল মা'রূফ' কর এবং 'নিহী আনিল মুনকার' কর। ইহা করার প্রয়োজন এত তীব্র যে, ইহা না করা হইলে অনিবার্যরূপে এমন এক অবস্থা দেখা দিবে যখন আল্লাহ্র নিকট হাজার দো'আ প্রার্থনা ও সাহায্য কামনা করিলেও তাঁহার নিকট কিছুই পাওয়া যাইবে না। আর দুনিয়ার মানুষের পক্ষে— ঈমানদার মুসলমানদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা। এইরূপ দুরবস্থা দেখা দেওয়ার পূর্বেই 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' করিতে বলা হইয়াছে ? বুঝা যায় যে, ইহা এমনই এক সুফলদায়ক কাজ, যাহা সঠিকরূপে করা হইলে অনুরূপ মর্মান্তিক ও দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা দেখা দেওয়ার কারণ ঘটিবে না। ইহা হইতে এই কাজটির গুরুত্ব সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' বলিতে কি কাজ বুঝায় এবং এই কাজের এতদূর গুরুত্বই বা কি কারণে, এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এই কাজের আদেশ করা হইয়াছে, এই কাজের জন্য নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং নবী-উত্তর যুগের মুসলমানদের সামাজিক সামগ্রিক দায়িত্বও হইতেছে এই কাজ করা, তাহাও কুরআন হইতেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত।

'আল আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' (اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ) একটি কুরআনী পরিভাষা। ইহার শাব্দিক অর্থঃ 'ন্যায় কাজের নির্দেশ দান ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ— অন্যায় কাজ হইতে লোকদের বিরত রাখা।' কিন্তু 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' বলিতে সংকীর্ণ ও চারিত্রিক কোন জিনিস বুঝায় না, বুঝায় না কেবল নৈতিক ও চারিত্রিক সংক্রান্ত কাজ। বরং ইহা মারাত্মক— সর্বব্যাপক। সংক্ষিপ্ত সারকথা এইঃ মা'রূফ হইল দ্বীন, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা এবং উহার আমর বা নির্দেশ করার অর্থ হইলঃ উহার পূর্ণ বাস্তবায়ন, বাস্তবে রূপায়ণ, বাস্তবভাবে চালু, জারী ও কার্যকরীকরণ। আর উহার দ্বিতীয় দিক হইলঃ 'নিহী আনিল

মুনকার' (نَهِيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ) 'মুনকার' বলিতে বুঝায় ইসলামের বিপরীত ও পরিপন্থী যাহা কিছু তাহা সব। আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-মতবাদ অনুসরণীয় আদর্শ, কার্যপ্রণালী ও পদ্ধতি, রীতিনীতি এবং পথ ও পন্থা, ধরণ, রকম-প্রকার, আচার-অনুষ্ঠান যাহা কিছুই দ্বীন-ইসলামের সহিত সাংঘর্ষিক, উহার বিপরীত ও পরিপন্থী তাহাই 'মুনকার'। আর এই 'মুনকার' হইতে 'নিহী' বা নিষেধ করার অর্থ কেবল মৌখিক নিষেধ করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া নহে, বাস্তব ক্ষেত্রে লোকদিগকে ইহা হইতে বিরত রাখা, বিরত থাকিতে রাজি না হইলে সকলে বাধা দান। ইমাম রাযীর মতে কুরআনের নির্দেশ ঃ

امر بالمعروف এর অর্থ اَىْ بِاظْهَارِ الدِّيْنِ الْحَقِّ بِتَقْرِيْرِ دَلَائِلِهِ ন্যায়-এর আদশ করা এমনভাবে যে, সত্য-দ্বীন সুস্পষ্ট সুপ্রকটিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং উহার স্বপক্ষের যুক্তি প্রমাণ হয় বলিষ্ঠ, অকাট্য ও সর্বজনমান্য। تفسير الكبير ج ٥، ص ٣٤٧ বস্তুত কুরআনে যে মুসলিম জাতিকে 'খায়রা উম্মত' (خَيْرَ اُمَّةٍ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সেই মুসলিম উম্মতেরই এই দায়িত্ব ঘোষিত হইয়াছে এবং এই দায়িত্ব পালন করিলেই তাহারা উত্তম জাতি বলিয়া গণ্য ও বিবেচিত হইতে পারে।

'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজের প্রথম পর্যায় হইতেছে দ্বীন-ইসলামের প্রচার। এই কাজ করিতে হইবে মুসলমানদের মধ্যে এবং উহার বাহিরে অমুসলিমদের মধ্যে। এই প্রচারের চূড়ান্ত পর্যায় হইতেছে 'জিহাদ ফী-সাবিলিল্লাহ'— আল্লাহ্র পথে জিহাদ এবং জিহাদের শেষ স্তর হইতেছে ইসলামের দুশমনদের সাথে প্রত্যক্ষ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ইসলামের জন্য এই শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছা মুসলমানদের জন্য নির্দেশিত মিশন। ইহা যেমন প্রচারমূলক কাজ তেমনি প্রতিষ্ঠামূলক রাজনৈতিক কাজও। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন দ্বারাই এ দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন করা সম্ভব।

আর হাদীসের বক্তব্য হইতেছে এই যে, এইরূপ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ না করিলে এমন পরিস্থিতি অবশ্যই দেখা দিবে, যখন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে, আল্লাহ্র নিকট কোন দো'আও কবুল হইবে না। আযাবের পর আযাব আসিয়া মুসলমানদের ধ্বংস করিবে; কিন্তু তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যত কান্নাকাটিই করা হইবে, কোন কিছুতেই একবিন্দু ফল পাওয়া যাইবে না। অতএব এইরূপ অবস্থা আসার পূর্বেই যেন মুসলিম জনতা 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজ পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে শুরু করিয়া দেয়।

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْلَيُسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْلَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ -

হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ তোমরা অবশ্যই মা'রূফ-এর আদেশ করিবে, মুনকার হইতে নিষেধ করিবে, লোকদের বিরত রাখিবে এবং তাহাদিগকে কল্যাণময় ইসলামী কাজ করার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা যে কোন আযাবে তোমাদের সকলকেই ধ্বংস করিয়া

দিবেন কিংবা তোমাদের মধ্য হইতে সর্বাধিক পাপাচারী, অন্যায়কারী ও জালিম লোকদিগকে তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিবেন। এই সময় তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকেরা মুক্তিলাভের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ প্রার্থনা ও কান্নাকাটি করিবে; কিন্তু তাহার কিছুই আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল করা হইবে না। — মুসনাদে আহ্‌মদ

এই হাদীস হইতে 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' না করার দুইটি মারাত্মক পরিণতির কথা জানা যায়। একটি হইতেছে সামগ্রিক ধ্বংস। এই ধ্বংস-কার্য যে-কোনরূপ আযাবের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। আর দ্বিতীয়টি হইল নিকৃষ্টতম দুষ্ট প্রকৃতির লোকদিগকে শাসক বানাইয়া দেওয়া। বস্তুত আযাব দানের ইহাও একটি রূপ।

ব্যাখ্যা সে আযাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং নৈতিক বিপর্যয় ও পতন— যে কোন রকমের হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে যে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে, সেই সমাজকে আল্লাহ কখনো ধ্বংস করেন না। কুরআনের আয়াতে এই কথাই ঘোষণা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ - (هود - ١١٧)

যে জনপদের অধিবাসীগণ সংশোধনমূলক কাজে ব্যাপৃত থাকে তোমার আল্লাহ্ তাহাদিগকে জুলুম বা গুনাহের দরুন ধ্বংস করেন না। (অথবা এই অবস্থায় তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া জুলুম করেন না)।

অন্য কথায়, যে জাতির লোকেরা নিজেদের সামগ্রিক কাজ-কর্মকে তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মকে ক্রমশ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে থাকে ও ইসলাম বিরোধী ভাবধারাকে বিদূরণ ও সংশোধনের জন্য নিয়ত চেষ্টায় লাগিয়া থাকে, আল্লাহ তাহাদিগকে কোন বড় ও গুরুতর গুনাহের দরুনও ধ্বংস করেন না, তাদের উপর আযাব পাঠান না। কিন্তু এই কাজ যদি আদৌ করা না হয়, তাহা হইলে সেই জাতির ধ্বংস অনিবার্য হইয়া উঠে এবং সেই ধ্বংস হইতে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।

আর দ্বিতীয় পরিণাম হইতেছে মুসলিম জনগণের উপর দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্রহীন ও অনাচারী লোকদের কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মুসলমানদের উপর সমাজে নিকৃষ্টতম ফাসিক-ফাজির লোকদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কায়েম হওয়াও যে আল্লাহ্‌র একটি প্রচণ্ড আযাব এবং সেই আযাব যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা না চালানোর ফলেই আসিয়া থাকে, তাহা এই হাদীস হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। আর উভয় ধরনের আযাব যে সমাজে নাজিল হয় তাহাদের পক্ষে সর্বাধিক মারাত্মক পরিস্থিতি এই হয় যে, তখনকার সমাজে নেক লোকদের দো'আ-প্রার্থনাও আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না এবং এই আযাব হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায়ই অবশিষ্ট থাকে না।

বর্তমান দুনিয়ার মুসলিম জাতি কি বর্তমানে এই দ্বিবিধ আযাবের মধ্যে নিমজ্জিত নয়?

ইসলাম ও জিহাদ

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رض قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اَدُلُّكُمْ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعُمُوْدِهٖ وَذَرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ اَلْاِسْلَامُ وَعُمُوْدُهٗ الصَّلٰوةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهٖ اَلْجِهَادُ - (احمد، ترمذيو، ابن ماجه)

হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ 'আমি কি তোমাদিগকে প্রকৃত ব্যাপারের মূল, উহার স্তম্ভ এবং উহার সর্বোচ্চ চূড়া কি তাহা বলিব ? আমি বলিলাম ঃ হ্যাঁ, হুজুর আপনি অবশ্যই তাহা আমাদিগকে বলিবেন। তখন রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিলেন, প্রকৃত ব্যাপারে মূল হইতেছে ইসলাম। মূল সূত্র হইতেছে নামায এবং সর্বোচ্চ চূড়া হইতেছে জিহাদ। — আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা উপরের হাদীসে নবী করীম (স)-এর সহিত হযরত মু'আজের কথাবার্তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট-দেখা যায় যে, দ্বীন-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার তিনটি পর্যায় রহিয়াছে ঃ ইসলাম, নামায ও জিহাদ। এই তিনটি শব্দ মূলত তিনটি পৃথক পৃথক জিনিসের নাম, যাহা এই ঈমান গ্রহণের পর এক ব্যক্তির জীবনে ব্যক্তিগতভাবে এবং ঈমানদার জনগোষ্ঠীর জীবনে সমষ্টিগতভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইসলাম হইতেছে উহার প্রথম কাজ— প্রথম বুনিয়াদ, নামায স্তম্ভ বিশেষ, যাহার উপর এই দ্বীন-ইসলামের বিরাট প্রাসাদ মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়ায় এবং জিহাদ হইতেছে উহার সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা উপরের স্তর।

ইসলাম হইতেছে আল্লাহ্‌র বন্দেগীমূলক জীবনের সূচনা। একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌র অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া আদর্শবাদী জীবন যাপন করিতে শুরু করে, তখন সে দ্বীন-ইসলামের মূল সূত্রই লাভ করিতে পারে মাত্র। নামায হইতেছে এই ঈমানদারী জীবনের বাস্তব পরিচয়, উহার মৌলিক কেন্দ্রবিন্দু। মুমিন ব্যক্তির পূর্ণ জীবনেরই সঠিক প্রকাশ ঘটে এই নামাযের মাধ্যমে। এই স্তরের ভিতর দিয়া যাহাদের জীবন গঠিত হইয়াছে, তাহারা উহার পরবর্তী স্তর— জিহাদ— গ্রহণ করিতে পারে। জিহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে ঃ যে ধরনের বান্দাসুলভ জীবন একজন লোক গ্রহণ করিয়াছে, সেই জীবন যাপন পদ্ধতির দিকে অপর লোকদিগকে আহ্বান জানানো, এই দিকে তাহাদিগকেও আনিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করা।

এই হাদীস অনুযায়ী ইসলামের এই তিনটি দিক একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ। ইহার কোন একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বস্তুত জিহাদ ইসলামের একটি অনিবার্য স্তর। ঈমান ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার যেখানে সূচনা, জিহাদ সেখানে সর্বশেষ করণীয় আমল।

যেখানে আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি ঈমান হইবে, সেইখানেই উহার বিপরীত জিনিসের প্রতি হইবে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি ও বিদ্রোহ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহা কেবল মন-মগজের বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে না, ক্রমশ ইসলামের বিপরীত বিশ্বাস ও বিধানকে নির্মূল করিবার প্রচেষ্টা শুরু হইয়া যাইবে, ফলে বিপরীত শক্তির সহিত সূচিত হইবে বাস্তব সংঘর্ষ।

জিহাদ ইসলামের ফল। ফলকে অস্বীকার করার অর্থ মূল গাছেরই অস্বীকৃতি। অনুরূপভাবে জিহাদের আবশ্যকতা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে এবং তাহা স্বযত্নে এড়াইয়া চলিতে চাহিলে মূল ইসলামকেই করা হয় অস্বীকার, এড়াইয়া চলা হয় ঈমানের দায়িত্ব ও উহার মৌলিক দাবিকে। জিহাদ ইসলামের ফল বিধায় উহা কোনক্রমেই ইসলামের নিয়ম-বিধান ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহা করা হইলে ইসলামের মূল শিকড় কাটিয়া দেওয়ার শামিল হইবে।

যাহারা দ্বীন-ইসলাম মানিয়া চলিতে প্রস্তুত, কিন্তু নামায পড়িতে রাযি নয়, তাহারা যেমন ইসলাম পালন করে না, অনুরূপভাবে যাহারা দ্বীন-ইসলামকে মানিয়া লইয়া কেবল নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি সীমাবদ্ধ ও সহজে পালনীয় দায়িত্ব পালন করে, কিন্তু জিহাদ করিতে প্রস্তুত হয় না, তাহারাও মূল ইসলামকেই উৎপাটিত করে।

জিহাদকে ইসলামের 'সর্বোচ্চ চূড়া' বলায় প্রথমত প্রমাণিত হইল যে, ইহা ইসলামেরই একটি অনিবার্য মৌলিক দিক। দ্বিতীয় ইহার পূর্বে প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ— ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় দিক দিয়াই— আবশ্যক। এবং তৃতীয়ত, জিহাদ না করা হইলে ইসলামের পূর্ণ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় ইসলামের বাস্তব রূপকে অবলোকন করার সুযোগ পাওয়া।

জিহাদের ধারা ও প্রকৃতি

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاهِدُوْا النَّاسَ فِىْ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَلَا تَبَالُوْا فِىْ اللّٰه لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰه فِىْ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَجَاهِدُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه فَانَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّة عَظِيْمٌ يُّنْجِىْ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهٖ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ - (مسند احمد، واورده البيهقى)

হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা সকলে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিকটবর্তী ও দূরের লোকদের সহিত জিহাদ কর এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তোমরা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নের বিন্দুমাত্র ভয় করিও না। পরন্তু তোমরা দেশ-বিদেশে যখন যেখানেই থাক, আল্লাহ্‌র আইন ও দণ্ড বিধানকে কার্যকর করিয়া তোল। তোমরা অবশ্য আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। কেননা জিহাদ হইতেছে জান্নাতের অসংখ্য দুয়ারের মধ্যে একটি অতি বড় দুয়ার। এই দ্বার-পথের সাহায্যেই আল্লাহ তা'আলা (জিহাদকারী লোকদিগকে) সকল প্রকার চিন্তাভাবনা ও ভয়ভীতি হইতে নাজাত দান করিবেন। — মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী কর্তৃক উদ্ধৃত

ব্যাখ্যা ইহা এক দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশ। ইহাতে জিহাদ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। এই জিহাদের প্রথম কথা হইল, উহাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ ব্যাপদেশে যে লোকই উহার প্রতিবন্ধক হইবে, সে নিকটের লোক হউক কি দূরবর্তী, নিকটাত্মীয়ই হউক, কি দূরের আত্মীয়, কাহাকেও খাতির করা চলিবে না। প্রতিবন্ধক মাত্রেরই মুকাবিলায় ইস্পাত কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই জিহাদ কখনও নিষ্কন্টক ও কুসমাস্তীর্ণ হয় না— ইহার পথে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা দেখা দেওয়া অনিবার্য। এই পথে আসিবে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, আসিবে জেল, সামাজিক বয়কট এবং ফাসির কাষ্ঠ। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ এই সবের মধ্য দিয়াই— এই সবকে অতিক্রম করিয়াই— অগ্রসর হয়। কাজেই এই সব উৎপীড়কের উৎপীড়ন— তাহার রকম এবং রূপ যাহাই হউক না কেন— অকুণ্ঠিত চিত্তে বরদাশত করিতে হইবে। ইহার ভয়ে একবিন্দু ভীত-সন্ত্রস্ত হইলে এবং নির্যাতন দেখিয়া পশ্চাদপদ হইলে এই কাজ করা সম্ভব হইবে না, চলিতে পারিবে না জিহাদের এই অগ্রাভিযান। মুজাহিদদের পরিচয়দান প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ - (المائدة -٥٤)

তাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এমনভাবে যে, তাহারা এই পথে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে একবিন্দু ভয় করে না।

দেশে কি বিদেশে, সফরে কি নিজ স্থানে— মানুষ যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন— সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র আইন ও শাসন মানিয়া চলা ঈমানদার লোকদের কর্তব্য। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنْ نَقُوْلَ الْحَقَّ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - (بخارى)

রাসূলের হাতে আমরা বায়'আত করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমরা যেখানেই এবং যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সত্য কথা, ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলিব এবং এই ব্যাপারে আমরা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকেই বিন্দুমাত্র ভয় করিব না। — বুখারী

মূল হাদীসের শেষাংশে জিহাদের ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। জিহাদকে বলা হইয়াছে জান্নাতের একটি বিরাট দরজা, যা দিয়া জিহাদকারীরা বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি হইতে লাভ করিবে চিরমুক্তি। এক কথায় এই ভয়-ভীতিমুক্ত জান্নাতে প্রবেশ করিত হইলে এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ করা অপরিহার্য। অন্যথায় জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব হইবে না।

ইসলামী জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض اِنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ وَيُقَاتِلُ لِيُغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْاَعْلٰى فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - (ابوداؤد)

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একজন বেদুঈন রাসূলে করীমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, এক ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে আর এক ব্যক্তি প্রশংসা লাভের আশায় যুদ্ধ করে আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে এই জন্য যে, লোকেরা তাহার মান-মর্যাদা দেখিতে পাক, (ইহাদের মধ্যে কাহার যুদ্ধ ঠিক?) উত্তরে রাসূলে করীম (স) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্র কালেমা সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত হউক, তাহার যুদ্ধই মহান আল্লাহ্র (প্রদর্শিত) পথে সম্পন্ন হয়। — আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা হাদীসটি আবূ দাউদের বর্ণনা হইতে গৃহীত হইয়াছে। তিরমিযী শরীফে ইহার প্রথম অংশ নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَاَىُّ ذَالِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে বীরত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্য আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে আত্ম-অহংকার কিংবা জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে লোকদের দেখাইবার জন্য— ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির যুদ্ধ আল্লাহ্র পথে?

ইহার জওয়াবে রাসূলে করীম (স) যাহা বলিয়াছেন তাহা একই কথা ও ভাষায় আবূ দাউদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হাদীসটি হইতে ইসলামী জিহাদ ও গায়র-ইসলামী জিহাদের পারস্পরিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে দেখানো হইয়াছে যে, দুনিয়ায় মানুষ কেবল একই উদ্দেশ্য যুদ্ধ-সংগ্রাম করে না, যুদ্ধ-সংগ্রামের মূলে বিভিন্ন উদ্দেশ্য হইতে পারে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষ যুদ্ধ করিয়া থাকে। এখানে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা হইয়াছ। এক মানুষ যুদ্ধ করে দুনিয়ায় সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে। মানুষ তাহার সুনাম গাহিবে, বলিবে ঃ অমুক লোকটি মস্ত বড় বীর মুজাহিদ। ঘরে ঘরে তাহার বিজয় গাথা গাওয়া হইবে, ইহাই থাকে তাহার প্রধানতম লক্ষ্য। কেহ কেহ যুদ্ধ করে প্রশংসা পাওয়ার জন্য। লোকেরা বলিবে ঃ সাবাস! তুমি তো একটি অক্লান্ত সৈনিক, তোমার এই সাধনা ও সংগ্রামের ফলে লোকদের কতটা কল্যাণ সাধিত হইয়াছে! কেহ যুদ্ধ করে শুধুমাত্র গনীমতের মাল-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে। সে চাহে যুদ্ধ করিয়া বিপুল ধন-সম্পত্তি লাভ করিবে, মস্তবড় ধনী হইবে। কেহ যুদ্ধ করে নিজের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাহা লোকদের দেখাইয়া নিজকে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি প্রমাণ করার উদ্দেশ্য। এই সবকয়টি উদ্দেশই— বলা চলে নিছক বৈষয়িক, বস্তুতান্ত্রিক। সব কয়টির মূল লক্ষ্য উপস্থিত লাভ। এই উপস্থিত লাভের লোক কোন দিনই দুনিয়ার মানুষের একবিন্দু কল্যাণ সাধন করিতে পারে নাই। এই ধরনের সব কয়টি যুদ্ধ-বিগ্রহই মানুষের জীবনে শুধু ধ্বংসই টানিয়া আনে, অনুষ্ঠিত হয় ব্যাপক নরহত্যা, লুঠতরাজ, নারীধর্ষণ ও নারীহরণ আর অত্যাচার-নির্যাতনের অমানুষিক কার্যক্রম। সেই জন্য এই ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে সাহাবীদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল। নবী করীম (স)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি

সুস্পষ্ট বলিলেন ঃ এই সব যুদ্ধের কোনটিই 'আল্লাহ্‌র পথের' যুদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ্‌র পথের যুদ্ধ কেবল তাহাই, যাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে করা হইবে, যাহাতে দিনরাত আত্মনিয়োগ করিয়া থাকা হইবে। যাহার চরমতর লক্ষ্য হইবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কালেমাকে উচ্চে স্থাপন, উন্নত এবং বিজয়ীকরণ এবং এক মুহূর্তের তরেও তাহা ত্যাগ করা হইবে না।

'আল্লাহ্‌র কালেমা' অর্থ আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করার দাওয়াত দান। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব একটি সমাজ ও জাতির সামগ্রিক জীবনে পূর্ণ-মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে গণ-আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া। যাহার অনিবার্য ফলে কুফরি শক্তির প্রবল বিরোধিতার সৃষ্টি হইবে, উহার সহিত সংঘর্ষ হইবে প্রতি পদে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে। এইরূপ সংঘর্ষের নাম জিহাদ বা কিতাল; 'জিহাদ' ও 'কিতাল' শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক খুবই সামান্যই। তবে 'কিতাল' বলিতে যেখানে কেবলমাত্র অস্ত্র প্রয়োগের সাহায্যে কুফরি শক্তিকে চূর্ণ করা— যাহাতে প্রয়োজনবশত নরহত্যাও করা হয় বুঝায়, বুঝায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও যুদ্ধ— সেইখানে জিহাদ বলিতে উহার পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি এবং গোটা ইসলামী আন্দোলনও বুঝায়। 'কিতাল' বিশেষ অর্থবোধক আর জিহাদ সাধারণ। আল্লাহ্‌র পথে এই কিতাল বা জিহাদ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য, আল্লাহ্‌রই মর্জি ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যকে চিরকাল সম্মুখে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত রাখিতে হইবে। ইহাতে যেমন কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকিতে পারিবে না, তেমনি ইহাতে কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। কেননা, ইহার একটি দিক দিয়াও যদি একবিন্দু ত্রুটি ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে তখন সে যুদ্ধ কেবল আল্লাহ্‌র পথের যুদ্ধ থাকিবে না। বস্তুত মানুষের মধ্যে একসঙ্গে কতগুলি শক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছে। মানুষের যেমন আছে বুদ্ধিশক্তি, তেমন আছে ক্রোধ ও পাশবিক লালসার শক্তি। আল্লাহ্‌র পথের 'কিতাল' কেবলমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি প্রসূত আর অপরগুলি হয় ক্রোধজাত কিংবা লালসাবহ্নির ক্ষুব্ধ প্রকাশ। শেষোক্ত দুইটির পরিণাম বিশ্বমানবতার পক্ষে বড়ই মারাত্মক।

রাসূলে করীম (স)-এর এই জওয়াব হইতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহা এই যে, ইসলাম যে যুদ্ধ-সংগ্রামের সূচনা করে, উহার মূলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের বাস্তব প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনই লক্ষ্য থাকিতে পারে না। আর এই উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ-সংগ্রাম হইবে, তাহাতে বাহ্যত মানুষের যত কষ্টই হউক না কেন, নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের জন্য চিরন্তন কল্যাণ কেবলমাত্র তাহাতেই হইতে পারে।

ইসলামী জিহাদের স্তর

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ اُمَّةٍ قَبْلِيْ اِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِ هِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَ هُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَمُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ هُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْس وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ - (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ আমার পূর্বে যে-কোন উম্মতের প্রতি যে নবীই আল্লাহ্ তা'আলা পাঠাইয়াছেন, তাঁহারই কিছু সহকর্মী ও যোগ্য সাথী রহিয়াছে। তাঁহারা তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিত, তাঁহার হুকুম পালন করিত। ইহারপর তাহাদে অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারীগণ তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল আর তাহাদের অবস্থা হইল এই যে, তাহারা এমন কথা বলিত, যাহা তাহারা নিজেরা করিত না। (অর্থাৎ লোকদের তো ভাল কাজ করিতে বলিত, কিন্তু তাহারা নিজেরা করিত না)। ইহার অপর অর্থ এই যে, যে কাজ বাস্তবিকই করণীয় তাহা তাহারা নিজেরা করিত না, কিন্তু মানুষের কাছে বলিত যে, আমরা ইহা করিতেছি। নিজেদের উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া গদি রক্ষার জন্য এই সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইত না আর যে কাজ করার তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, তাহাই তাহারা করিত (অর্থাৎ নিজেদের পয়গম্বরের সুন্নাত এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী তাহারা নিজেরা তো চলিত না, কিন্তু যে সব পাপ ও বিদয়াতী কাজের কোন নির্দেশই তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই তাহা তাহারা খুব বেশি করিয়াই করিত।) এইরূপ অবস্থায় যাহারা ইহাদের বিরুদ্ধে নিজেদের দুই হস্তের শক্তির দ্বারা জিহাদ করে সে ঈমানদার। আর যে ব্যক্তি (ইহা করিতে অসমর্থ হইয়া) অন্তত শুধু মুখের দ্বারা উহার বিরুদ্ধে জিহাদ করে সেও মুমিন। আর যে (মুখের জিহাদ করিতে অসমর্থ হইয়া) কেবলমাত্র মন দ্বারাই উহার বিরুদ্ধে জিহাদ করে (অর্থাৎ মন দ্বারা উহাকে ঘৃণা করে ও উহার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও অসন্তোষ পোষণ করে) সেও মুমিন। কিন্তু এতটুকুও যে না করিবে, তাহার মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও ঈমান বর্তমান নাই। — মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে ইসলামী জাতি গঠন, উহার আদর্শবাদিতা, উহার পতন ও পতনকালে আদর্শবাদীদের কর্তব্য-দায়িত্ব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রথমত, প্রত্যেক নবীর মারফতে নূতন জাতি গঠনের কথা বলা হইয়াছে। যখনই নবী আসিয়া ইসলামের আন্দোলন শুরু করিয়াছেন, এক আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও বন্দেগী কবুল করার দাওয়াত দিয়াছেন, তখনই সমাজের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোক তাহা মানিয়া লইয়াছে এবং তাহারা নবীর উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিতে এক নূতন জাতি গঠন করিয়াছেন। এই জাতির আদর্শবাদিতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা নবীর পেশ করা আদর্শ পুরাপুরিই গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন। যে কোন কাজের আদেশ তাহাদের করা হইয়াছে, তাহারা তাহা যথাযথরূপে পালন করিয়াছেন। ইহার পর এমন একটা সময় আসিয়াছে যখন এই জাতির পতন শুরু হইয়াছে। এই পতনের প্রধানতম কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, নবীদের পর তাহাদেরই অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ নবীদের নেতৃত্বে যে জাতি গঠিত হইয়াছে সেই জাতির নবীদের দ্বারা তাহাদের জীবদ্দশায় পর্যন্ত আদর্শ ও বাস্তব কর্ম— উভয় দিক দিয়াই প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব পাইয়াছে। কিন্তু নবীদের চলিয়া যাওয়ার পর সেই জাতির মধ্য হইতে অযোগ্য লোকেরা— যাহারা আদর্শ সম্পর্কীয় জ্ঞান,তদনুযায়ী বাস্তব কর্মের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত— তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বসিয়াছে, তখনই এই অনুপযুক্ত নেতৃত্বের কারণে গোটা জাতি পতনের মুখে চলিয়া গিয়াছে। এই নেতৃত্বের অযোগ্যতা দেখাইতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে যুগপতভাবে আল্লাহ্র নাফরমানী ও মুনাফিকী করা এবং পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলার দোষ দেখা দিয়াছিল। আর বাস্তবিকই এইরূপ দোষ যে দেশের নেতৃত্বে দেখা যায়, সেই নেতৃত্ব ও উহার সমাজ সবই একসঙ্গে ধ্বংস হইতে বাধ্য হয়।

এই সময় সমাজের আদর্শবাদী লোকদের কর্তব্য হইতেছে এই অসৎ-অযোগ্য নেতৃত্বের অভিশাপ হইতে জাতিকে রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করা। তাহারা যদি তাহা করিতে প্রস্তুত না হয় এবং ক্ষমতা, কথা ও মন— এই ত্রিশক্তির কোন একটিকেও উহার বিরুদ্ধে জিহাদ করার কাজে নিয়োজিত না করে, তবে তাহাদের ঈমানদার হওয়ার দাবি একেবারেই মিথ্যা।

জিহাদ ও ঈমান

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسُهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ - (مسلم)

হযরত অবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মরিয়া গেল, অথচ সে না জিহাদ করিয়াছে আর না তাহার মনে জিহাদের জন্য কোন চিন্তা, সংকল্প ও ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছে, তবে সেই ব্যক্তি মুনাফিকের ন্যায় মরিল। — মুসলিম

ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া চেষ্টা করা— অন্য কথায় জিহাদ ও যুদ্ধ করা— ইসলামের দৃষ্টিতে যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহা এই ছোট্ট হাদীসটি হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। হাদীস সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, ঈমানদার ব্যক্তিকে এই জিহাদ ও যুদ্ধ অবশ্যই করিতে হইবে। যদি কোন কারণবশত তাহা করিতে না পারে, তবে তাহাকে অন্তত মনে মনে অবশ্যই করিতে হইবে। তবে যে কারণে এই জিহাদ ও যুদ্ধ বাস্তব ক্ষেত্রে করা হইল না, তাহা বাস্তবিকই কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ কিনা এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তাহা গৃহীত হইবে কিনা, ও জিহাদের কর্তব্য পালন না করার অপরাধে ক্ষমা করা হইবে কিনা তাহার বিচার কিয়ামতের দিনই হইবে। আর যদি কেহ দ্বীন-ইসলামের জন্য জিহাদ না করে, এমন কি সে জন্য তাহার মনে যদি ইচ্ছাও জাগ্রত না হয়, তবে সে মুনাফিক এবং সে মরিয়া গেলে মুনাফিক অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে। (আল্লাহ সব মুসলমানক এই অবস্থা হইতে রেহাই দিন।)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ وَالْزِمْ بِالْجِهَادِ فَاِنَّهُ رُهْبَانِيَّةٌ لِّلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهٖ فَاِنَّهُ نُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ وَذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ وَاخْزَنْ لِسَانَكَ اِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّكَ بِذَالِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ -

হযরত অবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট আসিল এবং বলিতে লাগিল, হে নবী! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র ভয় (তাকওয়া) অবলম্বন কর, কেননা উহা সমস্ত কল্যাণের উৎস। জিহাদকে বাধ্যতামূলকভাবে ধারণ কর, কেননা মুসলমানদের জন্য ইহাই হইতেছে 'রুহবানিয়াত'। আর আল্লাহ্‌র স্মরণ

কর এবং আল্লাহ্র কিতাবের নিয়মিত তিলাওয়াত কর। কেননা উহা তোমাদের জন্য এই জমিনে আলোকবর্তিকা এবং আকাশ রাজ্যে স্মরণীয় হওয়ার কারণ। তোমরা নিজেদের বাকশক্তিকে বিরত রাখ, কিন্তু নেক কথা হইতে বিরত রাখিও না। এইভাবেই তোমরা শয়তানের উপর জয়ী হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা এখানে নবী করীম (স) পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপদেশ দিয়াছেন। এই পাঁচটি কাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইলেও মূলত ইহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম হইতেছে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ। কেননা আল্লাহ্র ভয় মনে না থাকিলে ও মনের গভীরে উহা দৃঢ়মূল না হইলে আল্লাহ্র দেওয়া বৃহত্তর জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা, আল্লাহ্র যাবতীয় হুকুম আহকাম যথাযথরূপে পালন করা কাহারো পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম করার জন্য জিহাদের উপদেশ দেওয়া হইয়াছ। আলোচ্য হাদীসে জিহাদকে মুসলমানদের জন্য 'রুহবানিয়াত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এখানে 'রুহবানিয়াত' অর্থ কৃচ্ছ্রসাধন। কেননা জিহাদে সকল প্রকার শক্তি-সামর্থ নিয়োজিত করিতে হয় এবং ইহারই মারফতে আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের বাস্তব প্রমাণ পেশ করিতে হয়। বস্তুত জিহাদ ব্যতীত অন্য এমন কোন জিনিসই নাই, যাহা দ্বারা সত্যিকারভাবে আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার হওয়ার কথা প্রমাণিত হইতে পারে। পরন্তু কৃচ্ছ্রসাধনা ও দুনিয়া ত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পন্থা মুসলমানদের জন্য এই জিহাদ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারাই দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিজদিগকে একমাত্র আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করিতে চাহেন, জিহাদে ঝাঁপাইয়া পড়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকিতে পারে না। আর যাহারা জিহাদ হইতে দূরে থাকিয়া আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণের স্বপ্ন দেখেন এবং মনে করেন যে, তাহারা বড় 'অলীউল্লাহ' হইয়াছেন, তাহারা নিজদিগকেও ধোঁকা দিতেছেন আর জনগণকেও প্রতারিত করিতেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্র 'যিকর' করিত বলা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্র যিকর অর্থ কেবলমাত্র মুখে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' করা নয়; বরং প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহ্কে স্মরণ করা এবং কোন অবস্থায়ই আল্লাহকে ভুলিয়া না যাওয়ার নাম আল্লাহ্র যিকর। বস্তুত ঃ আল্লাহ্র বন্দেগীর মূল কথাই হইতেছ আল্লাহ্র যিকর।

হাদীসে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মনে রাখা আবশ্যক যে, কিতাব তিলাওয়াত অর্থ শুধু পঠন নয়; বরং ইহাকে এমনভাবে পড়িতে হইবে যেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবধারা পাঠকের মনের পটে জাগিয়া উঠে। উহার আলোকে জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে মনযিল চিনিয়া লইতে হইবে, পথের কোণ, পথের বাঁকে ও চড়াই-উৎরাই ও খাদ উহারই সাহায্যে ভাল করিয়া জানিয়া লইতে হইবে। তবেই বিশ্ব জীবনে আল্লাহ্র কিতাবের উজ্জ্বল আলো হওয়া সার্থক হইতে পারে। আর আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী যদি জীবনপথ চলা যায়, তবে উর্ধ্ব লোকে— আল্লাহ্র দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভও নিশ্চিত।

অতঃপর বাকশক্তিকে অন্যায় কথা হইতে বিরত রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত বাকশক্তি আল্লাহ্র এমন একটি নিয়ামত, যাহার দ্বারা মানুষের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন সহজ ও সম্ভব। আবার উহার দ্বারাই মানুষের মধ্যে তিক্ততারও সৃষ্টি হইয়া থাকে। শয়তান এই শক্তিকে মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে ব্যবহার হইতে না দিয়া বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টির কাজেই ব্যবহার করিতে চায়। সেই জন্য বলা হইয়াছে যে, বাকশক্তিকে যদি

সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে তুমি শয়তানকে পর্যন্ত পরাজয় করিতে পারিবে অর্থাৎ অসংখ্য প্রকার পাপ কাজ হইতে বিরত থাকিতে পারিবে। বাকশক্তি যে বহু প্রকার অন্যায়ের উৎস ও বাহন এবং শয়তানের প্রভাবে উহা যে বহু অশান্তি করিতে পারে, হাদীসে সেই কথাই বলা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতাবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এক কথায় তাকওয়া, জিহাদ ও আল্লাহ্‌র যিকর এই কয়টি ইসলামী যিন্দেগীর মৌলিক গুণাবলী। 'তাকওয়া' না হইলে জিহাদ করা যায় না। আবার জিহাদের জন্য তাকওয়া অপরিহার্য। আর 'তাকওয়া' ভিত্তিক জিহাদই হইতেছে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র যিকরের বাস্তব রূপ। আর এই সবকিছুরই মূল উৎস হইতেছে আল্লাহ্‌র কিতাব।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ - (بخارى، مسلم)

হযরত আবূযার (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে রাসূল! কোন্ কাজ উত্তম ও উৎকৃষ্ট তাহা আমাকে বলিয়া দিন। উত্তরে রাসূল (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তাঁহার পথে জিহাদ করা সর্বোত্তম কাজ। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা উত্তম ও উৎকৃষ্ট কাজ কি এই প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (স) মাত্র দুইটি কাজের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ প্রথম, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানই যে ইসলামের মূল ও প্রথম কাজ, তাহা সুস্পষ্ট, কিন্তু সেই ঈমান অর্থ কেবল আল্লাহ্‌র বর্তমানতা বা আল্লাহ্‌কে শুধুমাত্র একজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মানিয়া লওয়াই নয়, বরং সত্যিকারভাবে যেরূপ ঈমান আনা দরকার কিংবা আল্লাহ্‌কে যেভাবে বিশ্বাস করিলে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা হয়, ঠিক সেইভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণ করা ইহার লক্ষ্য। ঈমানের পর এখানে জিহাদ ছাড়া অন্য কোন কাজ বা অন্য কোন ইবাদত— নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত— ইত্যাদির উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, এইগুলি না করিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিলেই সমস্ত দায়িত্ব পালন হইয়া যাইতে পারে। বরং ইহার অর্থ এই যে, ইবাদতের এই সব অনুষ্ঠান অপেক্ষা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের মর্যাদা অনেক বেশি এবং নামায-রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মূল লক্ষ্য যে একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা— তাহা একমাত্র এই জিহাদের মারফতেই কার্যকর হইতে পারে। সেইজন্য আলোচ্য হাদীসে ঈমানের পর একমাত্র জিহাদেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই জিহাদকে বাদ দিয়াই যাহারা কেবলমাত্র নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালন হইতেছে বলিয়া মনে করে, তাহাদের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট।

عَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رِبَطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ - (ترمذى)

হযরত উসমান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্‌র পথে একটি দিন সীমান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকা হাজার দিনের মনযিল অতিক্রম করা অপেক্ষা উত্তম। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা ইসলামী হুকুমতের সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি দিন কাজ করাও হাজার দিনের রাজ্য শাসনের সমুদ্র মন্থন অপেক্ষা উত্তম। কেননা আল্লাহ্‌র দ্বীনের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, একমাত্র সেইখানেই খালিসভাবে এক আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বান্দা হইয়া জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করিতে পারে। কাজেই এই রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি দিনও যদি সীমান্তে পাহারাদারীর কাজ করা যায়, তবে তাহা হাজার দিন পর্যন্ত অনৈসলামী রাষ্ট্রের খিদমত করা অপেক্ষা অনেক ভাল। কেননা এই কাজ একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রভুত্বকে স্বীকার করিয়াই করা হয়। ইহা হইতে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের গুরুত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (ترمذى)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূল (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না। প্রথম সেই চক্ষু, যাহা আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে আর দ্বিতীয় প্রকারের চক্ষু তাহা যাহা আল্লাহ্‌র পথে পাহারাদারী করিতে করিতে রাত্র কাটাইয়া দেয়। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা এখানে চক্ষু বলিতে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গকেই বুঝায় না, সমস্ত দেহকে বুঝায় আর চক্ষুকে জাহান্নামের আগুনের স্পর্শ না করার অর্থ সেই চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির গোটা সত্তাতেই স্পর্শ না করা। হাদীসে যে দুইটি চক্ষুকে আগুন স্পর্শ করিবে না বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছ তন্মধ্যে প্রথম হইতেছে আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দনরত চক্ষু। বস্তুত আল্লাহ্‌র ভয় যাহার মনের মধ্যে থাকে এবং আল্লাহ্‌র আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়, তাহার সমস্ত দেহ কাঁপে ও চোখ হইতে দরদর বেগে অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও শত্রুর হাত হইতে ইসলামী রাষ্ট্র ও আদর্শ রক্ষার জন্য পাহারাদারীতে নিযুক্ত অতন্দ্র চক্ষু। মনে রাখিতে হইবে যে, এই দুই প্রকার চক্ষুর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই এবং ইহা দুই বিপরীত ধরনের চক্ষুও নহে। বরং দুইটির মূলেই রহিয়াছে এক আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার ভাবধারা।

عَنْ اَبِىْ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اُغْبِرَتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ - (بخارى، ترمذى، نسائى)

হযরত আবূ আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যাহার দুই পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলিমলিন হয়, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করিয়া দেন। — বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা এই একই অর্থের হাদীস সামান্য কিছু শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বুখারী শরীফ ছাড়াও তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে আসাকির হইতে বর্ণিত এই অর্থের হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ ঃ নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا اغْبَرَتْ قَدَمَا عَبْدٍ وَّلَا وَجْهُهُ فِىْ عَمَلٍ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ مِنْ جِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্‌র শপথ যাহার হস্তে আমার জন–প্রাণ নিবদ্ধ— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট ফরয নামায ছাড়া আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ অপেক্ষা অধিক উত্তম বলিয়া কোন কাজই গণ্য হইবে না; যাহাতে বান্দা আত্মনিয়োগ করিয়াছে এবং যাহাতে বান্দার দুই পা ধূলিমলিন হইয়াছে।

উবাদা ইবনে রাফায়া বর্ণিত এই একই অর্থের হাদীসের ভাষা হইল ঃ

لَايَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِىْ جَوْفِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ -

একজন মুসলিম ব্যক্তির পেটে আল্লাহ্‌র পথের ধূলি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হইবে না।

لَايَجْمَعُ اللّٰهُ فِىْ جَوْفِ رَجُلٍ غُبَارًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانَ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ اَغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَا اللّٰهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ -

আল্লাহ্‌র পথের ধূলা ও জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া একই ব্যক্তির পেটে আল্লাহ তা'আলা একত্রিত করিবেন না। আর যাহার দুই পা আল্লাহ্‌র পথে মলিন হইবে, তাহার সমস্ত দেহকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য হারাম করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা একই অর্থের এই হাদীসসমূহ হইতে যে মূল কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহা এই যে, আল্লাহ্‌র পথের যে কোন কাজই সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার কাজ বলিয়া গণ্য এবং কেবলমাত্র ফরয ইবাদতগুলি ছাড়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ-এর মতো অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। অন্য কথায় মুসলমানদের প্রাথমিক কাজ হইতেছে আল্লাহ্‌র ফরযরূপে নির্ধারিত কাজসমূহ সম্পন্ন করা এবং তাহার পরপরই যে কাজটি অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মূল্যবান ও সম্মানযোগ্য, তাহা হইল আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। দ্বিতীয়, এই জিহাদের কাজ যাহারা করিবে, যাহাদেরই দুই পা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে ধূলিমলিন হইবে, তাহাদের কেহই জাহান্নামে যাইবে না। জাহান্নাম হইবে তাহাদের জন্য হারাম। হাদীসের শব্দে যদিও 'দুই পা' বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহার মর্মার্থ হইতেছে মানুষের সমগ্র সত্ত্বা, সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে সমর্পিত হওয়া। ফরযসমূহ আদায় করার পরই এই কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেকটি মুসলমানের কর্তব্য। ইহা সর্বাপেক্ষা ফযীলতের ও সর্বাধিক সওয়াবের কাজ। যাহারা নফলের পর নফল ইবাদত করিয়া যাইতেছেন; কিন্তু জিহাদের জন্য একবিন্দু অবসর পাইতেছেন না, কিংবা সেইজন্য একবিন্দু সময় দিতেও রাজি হন না, এই হাদীসের আলোকে তাহাদের কর্মনীতি ও কার্যসূচী যে পুনর্বিবেচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

জিহাদে অর্থ ব্যয়

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعَ مِائَةِ ضِعْفٍ - (ترمذى)

খুরাইম ইবনে ফাতিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কিছুমাত্র খরচ করিবে তাহার জন্য সাতশত গুণ বেশি সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হইবে। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় কেবল শারীরিক শ্রমসাধনাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই সঙ্গে আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ সাহায্য দানেরও বিশেষ আবশ্যক রহিয়াছে। আর আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে খালেস নিয়তে যে অর্থ খরচ করা হইবে তাহার ফল সাতশতগুণ বেশি পাওয়া যাইবে।

সাতশত গুণ অধিক সওয়ার পাওয়াব কারণ এই যে, সাধারণত এই পথে অর্থ খরচ করিতে খুব কম লোকই প্রস্তুত হইয়া থাকে। বস্তুত যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মন বৈষয়িক স্বার্থ লাভ ও বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে পবিত্র না হইবে এবং কেবলমাত্র পরকালের ফল লাভ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের দিকে ঐকান্তিক লক্ষ্য আরোপিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম করার কাজে অর্থ খরচ করিতে কেহই প্রস্তুত হইতে পারে না। আর এই গুণ নিজের মধ্যে পুরাপুরি সৃষ্টি করা কিছুমাত্র সহজ কাজ নহে। কাজেই এই দুরূহ কাজ যাহারা সঠিকরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, আল্লাহ তাঁহার নিজ মেহেরবাণীতে তাহাদিগকে সাতশত গুণ বেশি সওয়াব দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَغَازِ يًا اَوْ خَلَفَهُ فِىْ اَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُنْقَصُ مِنْ اَجْرِ الْغَازِىْ شَىْءٌ - (مسند احمد)

হযরত যায়দ ইবনে খালিদুল জুহানী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন, যে লোক জিহাদকারীকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিবে কিংবা জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবে, তাহার জন্য ঠিক জিহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব লিখিত হইবে। কিন্তু সে কারণে মূল জিহাদকারীর জিহাদের সওয়াব হইতে একবিন্দু কম করা হইবে না। — মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম ও রক্ষার জন্য জিহাদ করা যে কত বড় সওয়াব ও পুণ্যের কাজ তাহা পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ হইতে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীসে বলা হইয়াছে যে, যে লোক নিজে যে কোন কারণে জিহাদে কার্যত অংশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে, সে যদি কোন জিহাদকারীকে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্য-সামগ্রী দিয়া সজ্জিত করিয়া দেয় এবং তাহাকে এমনভাবে প্রস্তুত করিয়া দেয়, যেন সে পূর্ণ দক্ষতা সহকারে জিহাদের কাজ করিতে পারে, তবে সেই লোকও জিহাদেরই সমান সওয়াব লাভ করিতে পারিবে। জিহাদ না করিয়াও জিহাদের সওয়াব পাওয়ার আর একটি উপায় হইতেছে জিহাদে গমনকারীর অনুপস্থিতিতেই তাহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা। যে লোক জিহাদে গমন করে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবারবর্গের নানা প্রকার অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এমনও হইতে পারে যে, জিহাদে গমন করার সময় সে তাহার পরিবারবর্গের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারে নাই কিংবা তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার কেহ নাই; এমন কেহ নাই যে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; পাহারাদারী করিবে কিংবা সময়-অসময় দেখাশুনা করিবে। ইহার ফলে পরিবারবর্গ বড়ই কষ্ট হইবে ও নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে এবং এই দুরবস্থার কারণে জিহাদাকরী আন্তরিক উদ্বেগে ও মানসিক অশান্তিতে নিমজ্জিত হইতে পারে। তখন এই জিহাদকারীর প্রতি তাহার পরিবারবর্গের অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে, জিহাদকারীর মনও হইতে পারে বিরক্ত— বিতৃষ্ণ। আর

সামগ্রিকভাবে এই অবস্থা দ্বীনের জিহাদের কিছুমাত্র অনুকূলে নহে। এই কারণে যাহারা জিহাদে গমন করেন নাই, জিহাদে গমনকারীর পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব তাদের উপর বর্তে। ইহা পালন করা যেমন অতি সড় সওয়াব— ঠিক জিহাদ কারার সমান সওয়াব— লাভের উপায়, তেমনি ইহা একটি অপরিহার্য কর্তব্যও ।

মুসলিম শরীফে এই পর্যায়ে হাদীস হইল ঃ রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزٰى وَمَنْ خَلَفَهٗ فِىْ اَهْلِهٖ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزٰى-

যে লোক জিহাদকারীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করিল। আর যে লোক জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবারবর্গের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল, সেও যেন প্রত্যক্ষ জিহাদে যোগদান করিল।

মোটকথা, জিহাদ কার্যের ক্ষেত্র কেবলমাত্র জিহাদের ময়দান ও দুশমনের প্রত্যক্ষ মুকাবিলার ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাহা যুদ্ধের ময়দান হইতে অস্ত্র সংগ্রহ ও জিহাদকারীদের পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পর্যন্ত জিহাদের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত। যাহার পক্ষে যে স্থানে থাকিয়া এই জিহাদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব বা সহজ, সে লোক সেইখানে থাকিয়া স্বীয় দায়িত্ব পালন করিয়া জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে, পাইতে পারে জিহাদ করার অপূর্ব সওয়াব।

ইমাম নববী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

وَفِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَلْحَثُّ عَلَى الْاِحْسَانِ اِلٰى مَنْ فَعَلَ مُصْلِحَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ اَوْقَامَ بِاَمْرٍ مُهِمًّا تِهِمْ -

যেসব লোক মুসলিম সাধারণের পক্ষে কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে, কিংবা তাহাদের কোন সামগ্রিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই সব লোকদের প্রতি কল্যাণময় আচরণ করার এবং তাহাদের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সেই সব কাজ আঞ্জাম দেওয়ার প্রতি এই হাদীসে লোকদিগকে উৎসাহ দান করা হইয়াছে।

অন্য কথায়, হয় তুমি নিজে জিহাদে আত্মনিয়োগ কর, না হয় জিহাদে নিযুক্ত লোকদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণের কাজে লাগিয়া যাও। মুসলমানদের পক্ষে তৃতীয় কোন উপায় থাকিতে পারে না।

সাংগঠনিক জীবনের অপরিহার্যতা

عَنْ اَبِىْ سعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ - (ابوداؤد)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ সফরে এক সঙ্গে তিনজন থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে তাহারা যেন অবশ্যই আমীর বানাইয়া লয়। — আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা হাদীসটির বক্তব্য হইতেছে এই যে, মুসলমানকে অবশ্যই সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতে হইবে। কেবল একটি সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং নিজ ঘরে ও জনপদে উপস্থিত থাকা অবস্থায়ই নহে, এমনকি ঘর ও নিজ জনপদের বাহিরে বিদেশে সফরে থাকাকালেও এই সাংগঠনিকতাকে উপেক্ষা করা চলিবে না। তখনও নিজেদের মধ্য হইতে একজন লোককে আমীর বা নেতা বানাইয়া লইতে হইবে। এই কথাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হাদীসের গ্রন্থাবলীতে কয়েকজন সাহাবীই নিজ নিজ ভাষায় ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। মুসনাদে আহমদ-এ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে এই কথাটি বর্ণিত হইয়াছে নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُوْنُ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلَّا اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ -

নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ তিনজন লোক যখন কোন এলাকার কোন মরুভূমির মধ্যে থাকিবে, তখনো তাহাদের অসংগঠিত ও অসংবদ্ধ থাকা জায়েয নহে। তখনো তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া লওয়া কর্তব্য।

আবূ দাঊদ-এ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসের ভাষা এইরূপ ঃ

اِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ -

তিনজন লোক যখন সফরে বাহির হইবে, তখন অবশ্যই তাহাদের একজনকে তাহাদের আমীর বানাইয়া লইবে।

বাজ্জার ও তাবারানীও এই হাদীস সহীহ সনদসূত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে এই কথাটির বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছ নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَاَمِّرُوْا اَحَدَكُمْ ذَالِكَ اَمِيْرٌ اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

তোমরা যখন তিনজন লোক সফরে থাকিবে, তখনও তোমাদের একজনকে আমীর বানাইয়া লইবে। সে হইবে এমন আমীর যাহাকে স্বয়ং রাসূলে করীম (স) নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই সবকয়টি হাদীসে 'তিনজন লোক' স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, একটি ইসলামী জামা'আতের নিম্নতম সদস্য সংখ্যা হইতেছে তিন। তিনজন হইলেই যখন তাহাদের মধ্যে সংগঠন কায়েম করা আবশ্যক, তখন ততোধিক সংখ্যক সদস্যের বর্তমান থাকায় ইহার আবশ্যকতা অধিক তীব্র ও অনস্বীকার্য হইয়া উঠে। ইহার কারণ প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেন ঃ

لِأَنَّ فِيْ ذَالِكَ السَّلَامَةُ مِنَ الْخِلَافِ الَّذِيْ يُؤَدِّيْ إِلَى التَّلَافِ - (نيل الاوط ج٨، ص ١٠٧)

সংগঠন কায়েম করা প্রয়োজন এইজন্য যে, যেসব মতবিরোধ, অমিল ও মনোমালিন্য সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেয়, সাংগঠনিক জীবন ও সংঘবদ্ধতার ফলে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

বস্তুত সংঘবদ্ধ ও একজনের নেতৃত্বাধীন জীবন যাপন না করিলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের প্রত্যেকে নিজ ইচ্ছামত কাজকর্ম করিতে শুরু করে। আর তাহার পরিণাম নিশ্চিত ধ্বংস ছাড়া কিছুই নহে। পক্ষান্তরে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিলে ও একজনের নেতৃত্ব মানিয়া চলিলে পারস্পরিক মতবিরোধ হ্রাস পায়, অন্তত উহার ধ্বংসাত্মক পরিণতি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তখন ঐক্যবদ্ধতা সকলের জীবনে আনে পরম শৃঙ্খলা। আর এই শৃঙ্খলারই ফল হইতেছে নির্বিরোধ শান্তি ও সমৃদ্ধি।

ইমাম শাওকানী এই সব হাদীসের ভিত্তিতে লিখিয়াছেন ঃ

وَفِيْ ذَالِكَ دَلِيْلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ اِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَصْبُ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ - (نيل الاوطارج ٨، ص ١٥٧)

এই সব হাদীস প্রমাণ করে যে, নেতা নির্বাচন ও দায়িত্ব সম্পন্ন লোক ও বিচার ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য— ওয়াজিব। ইসলামের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুত নামাযের জামা'আতে যেমন একজন ইমাম প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও আবশ্যক মুসলমানদের মধ্য হইতে একজনকে আমীর, নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করা।

عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ ثَلٰثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بُدٍّ وَلَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - (ابوداؤد)

হযরত আবূদ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, কোন জঙ্গল কিংবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে আর তাহারা যদি তখন (জামা'আতবদ্ধভাবে) নামায পড়ার ব্যবস্থা না করে, তবে তাহাদের উপর শয়তান অবশ্যই প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিবে। অতএব জামা'আতবদ্ধ হইয়া থাকা তোমাদের কর্তব্য। কেননা পাল হইতে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে নেকড়ে বাঘ সহজেই খাইয়া ফেলে। — আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে কি শহরে, কি গ্রামে-জঙ্গলে সর্বত্র জামা'আতবদ্ধ হইয়া বসবাস করা ও জামা'আতের সহিত নামায পড়ার তাগিদ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, মুসলমান যদি জামা'আতবদ্ধ হইয়া বসবাস না করে ও নামায প্রভৃতি ইবাদতের কাজ সম্মিলিতভাবে সম্পদন না করে, তবে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের পরিবর্তে শয়তানের প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে।

শেষাংশে জামা'আতী জিন্দেগীর গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। নিম্নস্তরের জীব হওয়া সত্ত্বেও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া থাকার ও শত্রুর মুকাবিলা করার স্বাভাবিক ভাবধারা বিদ্যমান। এই জন্য দলবদ্ধ ছাগল-পাল হইতে কোন ছাগল হরণ করিয়া নেয়া কোন নেকড়ে বাঘের পক্ষেও সম্ভব হয় না; বরং নেকড়ে বাঘ সেই ছাগলকেই সংহার করিতে পারে, যাহা পাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অনুরূপভাবে ইসলামী আদর্শবাদী লোকদেরকেও সম্মিলিত ও জামা'আতবদ্ধ হইয়া জীবন জাপন করা উচিত। তাহা হইলে শয়তানের পক্ষে তাহাদের কাহাকেও পথভ্রষ্ট করার আশঙ্কা বেশি থাকে না। কিন্তু যখনই কোন মুসলিম ব্যক্তি জামা'আত ত্যাগ করিয়া বিচ্ছিন্ন ও একক জীবন যাপন করিতে শুরু করে, তখন তাহার পক্ষে যে কোন মুহূর্তে পথভ্রষ্ট হওয়া খুবই সম্ভব। উপরন্তু কুফরী শক্তি যেখানে সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত, সেখানে উহার শক্তি চূর্ণ করার জন্য ও সত্যের বিজয় সম্পাদনের জন্য সত্যপন্থী ও ইসলামী আদর্শবাদী লোকদের জামা'আতবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করা ও ইসলামী আদর্শ রূপায়নের জন্য সংগ্রাম করা একান্তই কর্তব্য। এইজন্য কুরআন ও হাদীসে জামা'আতী জীবন যাপনের জন্য বারবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আনুগত্য হইতে হাত গুটাইয়া লইল, কিয়ামতের দিন সে যখন সম্মুখে হাজির হইবে, তখন তাহার কিছুই বলিবার থাকিবে না। আর যে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় মরিবে যে, তাহার গলদেশে আনুগত্যের কোন রজ্জু নাই, তাহার মৃত্যু সম্পূর্ণ জাহিলিয়াতের উপর হইবে। — মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসেও ইসলামী সমাজ জীবন যাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের— খলীফাতুল মুসলিমীনের— আনুগত্য করা প্রত্যেকটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ আনুগত্য প্রত্যাহার করিবে; বিচারের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে সে ইহার কোন কৈফিয়তই দিতে পারিবে না। কেননা, ইহা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। ইসলাম উচ্ছৃঙ্খলতা কখনও বরদাশত করিতে পারে না। সেই জন্য ইহার পরেই বলা হইয়াছে, ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফাতুল মুসলিমীনের আনুগত্যের রজ্জু গলদেশে না থাকা অবস্থায় যাহার মৃত্যু হয়, মনে করিতে হইবে যে, তাহার মৃত্যু ইসলামী সমাজ ও পরিবেশে হয় নাই, বরং তাহার মৃত্যু হইয়াছে সম্পূর্ণ জাহিলিয়াতের মধ্যে। এই জাহিলী মৃত্যুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য একমাত্র উপায় হইতেছে ইসলামী সমাজ জীবন যাপন করা,

ইসলামী নেতার নেতৃত্ব মানিয়া চলা ও খালেসভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। সকল মুসলমানেরই এইজন্য উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِىْ الْاَمِيْرَ فَقَدَ عَصَانِىْ وَاِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ وَرَائَهُ وَيُتَّقٰى بِهٖ فَاِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهُ بِذَالِكَ اَجْرًا وَاِنْ قَالَ بِغَيْرِهٖ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ – (بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল, সে আল্লাহ্‌কে মানিয়া চলিল; আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল না, সে ঠিক আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিল। আর যে ব্যক্তি আমীরকে মানিয়া চলিল, সে ঠিক আমারই আনুগত্য করিল। এবং যে আমীরের কথা মানিয়া চলিল না, সে ঠিক আমাকেই অমান্য করিল। বস্তুত ইমাম ঢালস্বরূপ, তাহারই নেতৃত্বে শত্রুর সহিত লড়াই করা হয় এবং তাহারই পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এই ইমাম যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ করে এবং সুবিচার কায়েম করে তবে সে ইহার পুরস্কার পাইবে। আর সে যদি উহার বিপরীত কাজ করে তবে তাহাকে উহার শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ইসলামী সমাজ জীবনে আমীরের কথা যে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ তাহা এই হাদীস হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। হাদীসে মোটামুটি তিনটি মৌলিক নীতি পেশ করা হইয়াছে। প্রথমত, ইসলামী সমাজে আমীরকে মানিয়া চলা রাসূল ও আল্লাহ্‌কে মানিয়া চলার সমান পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই জন্য রাসূল বলিয়াছেন যে, আমীরকে মানিলে আমাকে মানা হইবে আর আমাকে মানিলে আল্লাহকে মানা হইবে। পক্ষান্তরে আমীরকে অমান্য করিলে আমাকে অমান্য করা হইবে। আর আমাকে অমান্য করিলে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করা হইবে। কাজেই ইসলামী সমাজের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, আমীর হইতেছে ইসলামের ঢালস্বরূপ। যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের ময়দানে ঢালের অন্তরালে দাঁড়াইয়া যুগপতভাবে নিজেকে রক্ষা করে ও শত্রুকে ঘায়েল করে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান— আমীরও— অনুরূপভাবে গোটা রাষ্ট্র সমাজের বিপুল জনগণের পক্ষে ঢাল স্বরূপ। আমীরই তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে এবং আমীরের নেতৃত্বে ও পরিচালনাধীনে জনগণ সুসংবদ্ধভাবে শত্রুর সহিত লড়াই করিতে পারে।

ইহা ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ করিতে হইলে অথবা ইসলামের দুশমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে সেই জন্য পূর্ব হইতে আদর্শভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে ও ইসলামী জনতাকে একজন আদর্শনিষ্ঠ ইমাম বা নেতার পশ্চাতে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত হইতে হইবে। এবং এইরূপ প্রস্তুতির পরই ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইবে মূলত তাহাই ইসলামের পরিভাষা

অনুযায়ী 'জিহাদ' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। আর প্রস্তুতি ব্যতীতই কোন প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতা শুরু করিলে কিংবা কোন আদর্শ নেতার নেতৃত্বাধীন না হইয়া বিক্ষিপ্ত জনতার উদ্দেশ্যহীন রক্তপাত করা হইলে কুরআনের পরিভাষায় তাহাকেই বলা হইবে 'ফাসাদ'।

তৃতীয়ত, আমীরের প্রকৃত দায়িত্ব হইতেছে জনগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া সৃষ্টি করা ও সুবিচার ইনসাফের মানদণ্ড উঁচ্চ করিয়া ধরা। তাহা করিলেই আমীর আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবে। অন্যথায় তাহার পাপের ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে।

জামা'আত গঠনের প্রয়োজনীয়তা

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّه مُسْلِمٌ -

(مسند احمد، ترمذى)

হযরত হারেসুল আশ'আরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম(স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "আমি তোমাদিগকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করিতেছি, তাহা এইঃ জামা'আতবদ্ধ জীবন, আদেশ শ্রবণে প্রস্তুত থাকা ও (নিয়ম, কানুন) মানিয়া চলা, হিজরত করা, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে লোক মুসলিম জামা'আত হইতে এক বিঘত পরিমাণ বাহিরে চলিয়া গেল, সে ইসলামের রজ্জু তাহার গলদেশ হইতে খুলিয়া ফেলিল— যতক্ষণ না সে পুনরায় জামা'আতের মধ্যে শামিল হইবে। আর যে লোক জাহিলিয়াতের সময়কার কোন মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাইবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হইবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলিয়া মনে করে। — মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে ইসলামী জীবনের পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কাজ হইতেছে জামা'আত করা, জামা'আতবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করা। দ্বিতীয় ও প্রথম কাজের পরবর্তী কাজ হইতেছে জামা'আতী নিয়ম-কানুন জানিতে চেষ্টা করা, জামা'আত নেতার তরফ হইতে যখন যে কাজের নির্দেশ আসিবে, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ও যথাযথরূপে পালন করিতে প্রস্তুত থাকা। জামা'আতের লোকদের মধ্যে এইরূপ মানসিক প্রস্তুতি না থাকিলে যেমন জামা'আত গঠিত হইতে পারে না, তেমনি জামা'আতী জীবনের নিহিত কল্যাণ লাভ করাও সম্ভব হয় না মনে রাখা আবশ্যক। জামা'আতবদ্ধ জীবনের অর্থ মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া জীবন যাপন করা, আধুনিক কালের দলীয় জীবন নয়।

তৃতীয় কাজ হইতেছে জামা'আত নেতার আদেশ-নির্দেশ মানিয়া চলা। জামা'আতের লোকদের মধ্যে যদি এই আনুগত্য না থাকে, তবে জামা'আত গঠন অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। জামা'আত গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত এই জামা'আত ছিন্নভিন্ন ও চূর্ণ হইয়া যাইতে বাধ্য হয়। জামা'আত গঠনের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাজ একান্তই অপরিহার্য।

চতুর্থ পর্যায়ে আদেশ করা হইয়াছে হিজরত করার। সাধারণত দেশ ত্যাগ করাকেই হিজরত মনে করা হয় এবং একজন ঈমানদার লোক কাফির রাজ্য হইতে যখন ইসলামী রাজ্যে চলিয়া আসে তখনই বলা হয়— 'সে হিজরত করিয়াছে।' মুসলমান যখন কোন দেশে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা করিয়াও অসমর্থ হয়, তখন চূড়ান্ত নৈরাশ্য ও নিরুপায় অবস্থায় জিহরত— দেশত্যাগ করাই তাহাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ইসলামে হিজরতের ইহা পারিভাষিক অর্থ। উহার শাব্দিক অর্থ হইতেছে 'ত্যাগ করা'। ইহা অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এই অর্থেই হিজরত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে রাসূলে করীমের অপর এক হাদীসে। সাহাবাদের 'হিজরত' সম্পর্কিত এক সওয়ালের জওয়াবে রাসূল (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَنْ تَهْجُرَ مَاكَرِهَ رَبُّكَ -

হিজরত অর্থ আল্লাহ্‌র ঘৃণিত-অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করা।

আলোচ্য হাদীসে প্রথম ও দ্বিতীয়— এই উভয় অর্থ গ্রহণীয়। ফলে এখানে হিজরত এমন এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ, যাহার ফলে সকল লোকের মন-মগজ, আকীদা-বিশ্বাস এবং চরিত্র-মুয়ামিলাত— জীবনের সকল পর্যায় হইতে ইসলাম বিরোধী সব জিনিসই দূর হইয়া যাইবে। বস্তুত ইহাই সর্বোত্তম ও সর্বপ্রথম হিজরত এবং এইরূপ 'হিজরত' করার জন্য জামা'আতের সকল লোকেরই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহার অর্থ হইতেছে ইসলামের আদর্শে জীবন যাপনের সুবিধার্থে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া এমন এক দেশে গমন, যেখানে একান্তই নির্বিরোধ পরিবেশে ইসলামকে পালন করা যায়।

পঞ্চম ও সর্বশেষ বিষয় হইতেছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। ইহাকে সকলের শেষে উল্লেখ করার কারণ এই যে, জিহাদ করার জন্য পূর্বোল্লেখিত চারটি কাজ সর্বপ্রথম করা অপরিহার্য। তাহা না করিয়া জিহাদ করিতে চাহিলে তাহা প্রকৃত জিহাদ হইবে না, হইবে না তাহা 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।'

'জিহাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ— কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া চেষ্ট করা। ইসলামে জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কিন্তু তাহা নিছক জিহাদ নহে, তাহা হইতেছে 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ'। কুরআন ও হাদীসে যেখাইে জিহাদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে সেখানেই 'আল্লাহ্‌র পথে' কথাটি একটি জরুরী অপরিহার্য শর্ত হিসাবে উহার সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা কিছুতেই তাৎপর্যহীন হইতে পারে না।

'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ, ইসলামের বিশেষ পরিভাষা। ইহার অর্থ হইতেছে আল্লাহ্‌র দ্বীন পূর্ণমাত্রায় কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া চেষ্টা করা। ইহা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের উপর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের উপর অর্পিত হইলেও ইহা পালন করার জন্য জামা'আত গঠন ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। ইসলামী জিহাদের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা একক চেষ্টার সাহায্যে কিছুতেই লাভ করা সম্ভব নয়। এই জন্যই কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত জোরালো ও গুরু-গম্ভীর ভাষায় জামা'আত গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে জামা'আতের পক্ষে মারাত্মক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া রাসূলে করীম (স) মুসলমান সমাজকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

এই পর্যায়ে দুইটি কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম, জামা'আত হইতে বিছিন্ন হইয়া যাওয়া। এই প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন যে, কোন লোক যদি জামা'আতী শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া একবিন্দু পরিমাণও বাহিরে চলিয়া যায়, তবে সে কেবল জামা'আত হইতে বাহির হয় না, কার্যত ইসলামের রজ্জুও তাহার গলদেশ হইতে ছিন্ন হইয়া যায় এবং সে যতক্ষণ পর্যন্ত জামা'আতের বাহিরে থাকিবে, ততক্ষণ সে ইসলাম হইতেও বাহিরে গিয়া সম্পূর্ণ কুফরী জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে। এই কথা হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতী জীবন ও ইসলাম পালন মূলত একই কথা। যেখানে জামা'আত নাই, সেখানে ইসলামও নাই। এই দৃষ্টিতে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর ঘোষণা لَاإِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ "জামা'আত ছাড়া ইসলাম পালন করা সম্ভব নয়"— ইহার তাৎপর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহার অর্থ মুসলমানদের সামাজিক শৃঙ্খলা।

দ্বিতীয়, ইসলাম বিরোধী চিন্তা-বিশ্বাসের প্রচার। জামা'আতী জীবনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাস ও কাজের উপর। কেহ যদি জামা'আতের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগের গায়র-ইসলামী আদর্শ, মত ও বিশ্বাস প্রচার করিতে শুরু করে, তবে তাহার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা সে ইহার দ্বারা যেমন ইসলামী আদর্শের বিরোধিতা করে, অনুরূপভাবে তাহার এই কাজের ফলে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত জামা'আত (মুসলমানদের সামাজিক জীবন) চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। আর এই কাজের উপযুক্ত শাস্তি কঠিন জাহান্নামই হইতে পারে।

হাদীসের শেষাংশে বলা হইয়াছে যে, এই ধরনের কাজ করার পর কেহ যদি নামায-রোযা যথাযথভাবে পালন করিতে থাকে ও নিজেকে মুসলমান বলিয়া মনে মনে ধারণা করেও, তবু তাহার পক্ষে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে না।

সমাজনেতা ও রাষ্ট্র নায়কদের পরিচয়

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَامَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ وَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاكْرَهُوْا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوْا يَدًا مِّنْ طَاعَتِهِ - (مسلم)

হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের উত্তম নেতা হইতেছে তাহারা, যাহাদিগকে তোমরা ভালবাস ও তাহারাও তোমাদিগকে ভালবাসে; তাহারা তোমাদের জন্য দো'আ করে, তোমরা তাহাদের জন্য দো'আ কর। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হইতেছে তাহারা, যাহাদিগকে তোমরা ঘৃণা কর এবং যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তোমরা যাহাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর আর যাহারা তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। সাহাবাদের তরফ

হইতে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ "হে রাসূল! আমরা কি তরবারির সাহায্যে তাহাদের সহিত মুকাবিলা করিব" তিনি বলিলেন ঃ না, যতক্ষণ তাহারা তোমাদের মধ্যে নামাযের ব্যবস্থা কায়েম করিতে থাকিবে। তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে যদি তোমরা এমন কোন জিনিস দেখিতে পাও যাহাকে তোমরা অপছন্দ কর, তবে তোমারা তাহার কাজকে ঘৃণা করিতে থাক; কিন্তু তাহার আনুগত্য হইতে হাত টানিয়া লইও না। — মুসলিম

ব্যাখ্যা উপরিউক্ত হাদীসে ভাল নেতা ও খারাপ নেতা এবং ভাল শাসক ও মন্দ শাসকের পরিচয় দান করা হইয়াছে। আর এই ভাল-মন্দের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হইয়াছে ইসলামী জনতার মনোভাব ও দৃষ্টিকোণ। হাদীসে সম্বোধন করা হইয়াছে ইসলামী জনতাকে এবং বলা হইয়াছে ঃ তোমরা যাহাদিগকে ভালবাস ও ভাল মনে কর, তাহারাই তোমাদের ভাল নেতা। আর যাহাদিগকে তোমরা মন্দ মনে কর, তাহারাই তোমাদের মন্দ নেতা— মন্দ শাসক। কিন্তু ইহা একতরফা ভাল বা মন্দ মনে করা নয়, এই ভাল-মন্দ ধারণা উভয় পক্ষ হইতেই হইতে হইবে।

ভাল নেতা ও উত্তম শাসকের পরিচয় প্রসঙ্গে দুইটি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি মুহব্বত مَحَبَّتٌ ভালবাসা, আর সালাত صَلٰوةٌ অপরটি কল্যাণ কামনা, দো'আ ও রহমত বর্ষণ। রাসূলের এই ঘোষণা অনুযায়ী প্রথমত ভাল নেতা ও শাসক তাহারা যাহাদিগকে মুসলিম জনসাধারণ ভালবাসে এবং তাহারাও মুসলিম জনগণকে ভালবাসে। জনগণ ও শাসক বা নেতার পারস্পরিক সম্পর্ক ভালবাসার সম্পর্ক। শাসকগণ তাহাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করিবার কারণে সর্বতোভাবে তাহাদের কল্যাণ করিত চেষ্টিত এবং কোন দিক দিয়াই তাহাদের কোন ক্ষতি বা অকল্যাণ করিতে রাজি নয়। আর এই কারণেই জনগণও তাহাদিগকে ভালবাসে। তাহাদের প্রতি আন্তরিক ঝোঁক ও টান ও সমবেদনা অনুভব করে।

দ্বিতীয়, পারস্পরিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করাও ভাল নেতার একটি বিশেষ পরিচয়। জনগণের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সব শাসক ও নেতার জন্য দো'আ জাগে, তাহারাই জনগণের উপযুক্ত নেতা ও শাসক। পক্ষান্তরে যে শাসক ও নেতা জনগণের সঠিক কল্যাণের জন্য সব সময় আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করে, তাহারাই জনগণের যোগ্য নেতা ও ভাল শাসক।

মন্দ নেতা ও শাসকদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে রাসূল (স) দুইটি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। একটি بغض 'বুগ্য' আর অপরটি لعنت অর্থঃ

نِفَارُ النَّفْسِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِيْ تَرْغَبُ عَنْهُ وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ -

কোন জিনিস হইতে মন ফিরিয়া যাওয়ার কারণে উহার প্রতি মনে ঘৃণা জাগ্রত হওয়া।

ইহা ভালবাসার বিপরীত لعنت 'লা'নত' শব্দের অর্থ ঃ

اَلطَّرْدُ وَالْاِبْعَادُ عَلٰى سَبِيْلِ السَّخَطِ - (مفردات)

ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণে দূর করিয়া দেওয়া, বিতাড়িত করা।

অর্থাৎ যাহাদিগকে জনগণ অপছন্দ করে, যাহারা জনগণকেও ঘৃণা করে এবং যাহাদের নিকট যাইতে জনগণ আকর্ষণ বোধ করে না, জনগণকেও যাহারা নিজেদের নিকট আসিতে দিতে প্রস্তুত হয় না, তাহারা জনগণের উপযুক্ত নেতা ও শাসক নহে। জনগণের নেতা হইতে হইলে

প্রথমে জনগণকে ভালবাসিতে হইবে, জনগণের কল্যাণ কামনা করিতে হইবে এবং জনগণকে ভালবাসিয়াই তাহাদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব লাভ করিতে হইবে। যাহারা এইভাবে জনগণের নেতা ও শাসক হয়, তাহারাই তাহাদের নেতৃত্ব লাভের যোগ্য অধিকারী। আর যাহারা জনগণের তীব্র অসন্তোষ ও রুদ্ররোষকে উপেক্ষা করিয়া নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে বসিয়া থাকে, তাহাদের মতো নির্লজ্জ ও ক্ষমতালোভী আর কেহ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা নেতা নহে, তাহারা চিতাবাঘ। তাহারা অযোগ্য শাসক নহে, তাহারা জনগণের রক্তের শোষক।

হাদীসের শেষাংশে মন্দ শাসকদের সহিত ইসলামী জনতার কিরূপ সম্পর্ক হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এইরূপ মন্দ শাসক যখন ক্ষমতা দখল করিয়া বসে তখন কি অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের সহিত মুকাবিলা করা ও তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করা ইসলামী জনতার কর্তব্য নয়? রাসূলে করীম (স) ইহার জওয়াবে দুইটি কথা বলিয়াছেন। প্রথমত এই যে, এই ধরনের মন্দ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবে না; বরং তাহাদের মানিয়া চলিতে থাকিবে। দ্বিতীয়ত, এই মন্দ লোকদের আনুগত্য করিতে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তাহারা সমাজে সামগ্রিক নামায কায়েম করিতে থাকিবে। অর্থাৎ খারাপ শাসক হইয়াও যদি তাহারা নামায কায়েমের ব্যবস্থা করিতে থাকে, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যাইবে না। কিন্তু নামায কায়েমের ব্যবস্থাও যদি প্রতিষ্ঠিত ও চালু না থাকে এবং ইহার প্রতি নেতৃবর্গ যদি গুরুত্ব আরোপ না করে, তবে তাহারা মুসলিম জনগণের আনুগত্য কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। ইসলামী সমাজের শাসকদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হইতেছে নামায কায়েমের ব্যবস্থা করা এবং জনগণের নিকট আনুগত্য লাভের জন্য ইহাই সর্বশেষ শর্ত।

দ্বিতীয়ত, শাসকদের মধ্যে মন্দ ও ঘৃণ্য কোন কাজ বা স্বভাব দেখিতে পাইলে সেই কাজ ও স্বভাবকে তো ঘৃণা করিতেই হইবে এবং সে ঘৃণার প্রচারও করিতে থাকিতে হইবে; চেষ্টা করিতে থাকিতে হইবে তাহা দূর করা ও সংশোধন করার জন্য। সেই জন্য জনমত জাগ্রত ও সংগ্রহ করিতে হইবে এবং জনমতের চাপে শাসকদের সুপথে আনিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তখনও প্রতিষ্ঠিত সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করা কিছুতেই জায়েয হইবে না।

আনুগত্যের সীমা

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحِبَّ وَكَرِهَ اِلَّا اَنْ يُّوْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ وَاِنْ اَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَاطَاعَةَ - (بخاری، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি (রাসূল) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর কর্তব্য হইতেছে শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এমন সব ব্যাপারেই, যাহা সে পছন্দ করে আর যাহা তাহার

মনোপূত নয়। কিন্তু যদি কোন নাফরমানী ও গুনাহের কাজের আদেশ করা হয়, তবে অন্য কথা। যদি কোন গুনাহের কাজের আদেশ করা হয়, তবে তাহা যেমন শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইবে না, তেমনি তাহার আনুগত্য করিতে ও মানিয়া চলিতেও পারিবে না।

— বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ও রাষ্ট্রকর্তার আনুগত্য করা রাষ্ট্রের প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিরই কর্তব্য। এই আনুগত্য সকল ব্যাপারে ও সকল ক্ষেত্রেই করিতে হইবে। অনেক বিষয় হয়ত তাহার পছন্দ হইবে আবার অনেক বিষয় হয়ত তাহার পছন্দ হইবে না। আনুগত্য করা না করা ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভরশীল নহে। বরং সকল ক্ষেত্রে আনুগত্য করিয়া যাওয়াই কর্তব্য। কিন্তু যদি এমন কোন কাজের আদেশ করা হয়, যাহা করিলে আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয়— গুনাহ্ হয়, তবে সেই কাজ করিয়া রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখানো কিছুতেই জায়েয হইতে পারে না। এইরূপ কাজে কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রকর্তাই মুসলিমের আনুগত্য পাওয়ার দাবি করিতে পারে না। মুসলমানও পারে না এই ধরনের কাজ করিয়া আনুগত্য দেখাইতে। বরং তখন স্পষ্ট ভাষায় ইহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করাই হইতেছে মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য। কেননা রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

মানুষের যে আনুগত্যে স্রষ্টার নাফরমানী হয়, সে আনুগত্য কখনই করা যাইবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهٖ فَضْلاً فَاِنْ حُدِّثَ بِاَنَّهٗ تَرَكَ لِدَيْنِهٖ وَفَاءً صَلّٰى وَاِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهٗ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ – (مسلم، بخارى، باب قول النبى صلعم من ترك كلا فالى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স)-এর নীতি এই ছিল যে, কোন ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ 'এই ব্যক্তি তাহার ঋণ শোধের জন্য কোন সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে কি ?' ইহার জবাবে যদি তাহাকে জানানো হইত যে, সে তাহার ঋণ শোধের ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছে, তবে তিনি তাহার জানাযা নামায পড়িতেন। অন্যথায় মুসলমানদের তিনি বলিতেন ঃ "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়।" উত্তরকালে যখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে বহুদেশ বিজয়ের সুযোগ করেন, তখন রাসূল বলিলেন ঃ আমি মু'মিনদের প্রতি তাহাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্বশীল। অতএব মুমিনদের মধ্যে কেহ যদি মৃত্যুবরণ করে আর সে যদি ঋণ রাখিয়া যায়, তবে তাহা আদায় করিবার দায়িত্ব আমার। পক্ষান্তরে কেহ যদি সম্পদ রাখিয়া যায়, তবে তাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের জন্য। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসটি বুখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মুসলিম শরীফেও এই হাদীসটি উল্লেখিত হইয়াছে। এই হাদীসটির একটি পটভূমি রহিয়াছে। ঋণ করা ও ঋণ রাখিয়া মরিয়া যাওয়াকে রাসূলে করীম (স) কখনো উৎসাহিত করিতেন না। এই কারণে তিনি প্রথম পর্যায়ে কোন ঋণগ্রস্ত মৃতের জানাযা নামায পড়িতেন না। একবার এক আনসার বংশীয় ব্যক্তির জানাযা নামায পড়িতে ঠিক এই কারণেই তিনি অস্বীকার করেন। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এই সময় হযরত জিবরাইল (আ) আসিয়া রাসূলে করীম(স)-কে বলিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اِنَّمَا الظَّالِمُ عِنْدِىْ فِى الدُّيُوْنِ الَّتِىْ حَمَلَتْ فِى الْبَغْىِ وَالْاِسْرَافِ وَالْمَعْصِيَةِ فَاَمَّا الْمُتَعَفِّفُ ذُوالْعِيَالِ فَاَنَا ضَامِنٌ اَنْ اُؤَدِّىَ عَنْهُ –

আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতই বলিতেছেন যে, আল্লাহদ্রোহিতা, বেহুদা, অপ্রয়োজনীয় ও বাজে খরচ এবং গুনাহের কাজে ব্যয় করার কারণে যে সব ঋণ হয় আর সেই ঋণ রাখিয়া যে

মরে, আমার নিকট সেই লোকই জালিম। (কেবল এই ধরনের লোকেরই জানাযার নামায না পড়িবার প্রশ্ন আসিতে পারে); কিন্তু যে লোক পরিবার পরিজনের দায়িত্বসম্পন্ন ও সদাচারী, তাহার ঋণের জন্য আমিই জামিন থাকি, আমিই তাহার ঋণ পরিশোধ করিব। (অতএব এই লোকের জানাযা নামায পড়িবার ব্যাপারে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না)। অতঃপর নবী করীম (স) জানাযা নামায পড়িলেন।

ইহা হইতে জানা যায় যে, যে লোক অন্যায় কাজে অর্থ ব্যয়ের দরুন ঋণী হইয়া মরিয়া যায় কিংবা যে লোক ঋণ করে কিন্তু তাহা শোধ করিবার কোন চেষ্টা করে না, শোধ করিবার কোন চিন্তা-ভাবনাও করে না, তাহার জানাযা নামায পড়া অন্তত রাসূলে করীম (স)-এর পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তাহা পড়া হইলে ভাল-মন্দের কোনই পার্থক্য থাকে না, সকলেই একাকার হইয়া যায়। অথচ ইসলামে ভাল ও মন্দ লোকদের সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, উহার ফলে ঋণ করিয়া অন্যায়-অযথা খরচ করিবার প্রতি জনসাধারণকে উৎসাহ দান করা হয়।

বস্তুত ঋণ অনাদায় রাখিয়া মরিয়া যাওয়া এবং তাহা পরিশোধ করিবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই অন্যায় এবং পরিণামের দিক দিয়া খুইব ভয়াবহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدِّيْنَارِ وَلَا بِالدِّرْهَمِ وَلٰكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ - (مسند احمد)

যে লোক ঋণ রাখিয়া মরিবে (এবং তাহা শোধ করিবার ইচ্ছা পর্যন্ত রাখিবে না) কিয়ামতের দিন তাহা টাকা-পয়সা দ্বারা আদায় করা যাইবে না, বরং তাহা আদায় করিতে হইবে নেক-আমল দিয়া ও বদ-আমল নিজের উপর গ্রহণ করিয়া।

অর্থাৎ দুনিয়ায় ঋণ শোধ করিয়া না গেলে কিংবা শোধ করিবার ব্যবস্থা রাখিয়া না গেলে কিয়ামতের দিন তাহা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। কিন্তু সেখানে তাহা টাকা-পয়সা দিয়া আদায় করা সম্ভব হইবে না। কেননা সেখানে টাকা-পয়সা বলিতে কিছুই থাকিবে না। সেখানে থাকিবে শুধু মানুষের আমল— ভাল কিংবা মন্দ। কাজেই ঋণ আদায় বাবদ সেখানে নিজের নেক আমল ঋণ-দাতাকে দিতে হইবে এবং তাহার বদ-আমল নিজের উপর গ্রহণ করিতে হইবে।

অবশ্য যে সব লোক পরিবার পরিজনের জরুরী ব্যয়বহনের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে এবং তাহা আদায় করিবার ইচ্ছাও রাখে, চেষ্টাও করিতে থাকে, তাহারা যদি শেষ পর্যন্ত ঋণ আদায় না করিয়া বা তাহা আদায়ের ব্যবস্থা না রাখিয়াই মরিয়া যায়, তবে তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এইজন্য অভিযুক্ত করিবেন না ও বেহেশতে যাইতেও বাধা দিবেন না। প্রথম পর্যায়ে ইহাদের ঋণ আদায়ের জন্য স্বয়ং আল্লাহই জামিন হইয়াছিলেন। উত্তরকালে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট যখন বায়তুলমাল সংগৃহীত হয় ও এই ধরনের লোকদের ঋণ আদায়ের সামর্থ্য হয়, তখন রাসূলে করীম (স) ইসলমী রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে এই ধরনের ঋণ আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাসূলে করীম (স)-এর এই পর্যায়ের কথাটি অপর এক হাদীসে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

مَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا أَوْدَيْنًا فَالَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مِيْرَاثًا فَلِاَهْلِهِ -

যে লোক কোন ঋণ বা দায়িত্ব রাখিয়া যাইবে, তাহা শোধ ও বহন করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইবে। আর যাহারা মীরাস রাখিয়া যাইবে, তাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হইবে।

রাসূলে করীম (স)-এর এই ঘোষণার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ঃ

يَجِبُ عَلَى الْاِمَامِ اَنْ يَقْضِىْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْفُقَرَاءِ اِقْتِدَاءً بِالنَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِوُجُوْبِ ذَالِكَ عَلَيْهِ- (عمدة القارج ١٢، ص ١١٣)

রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য হইতেছে গরীব-ফকীর লোকদের অপরিশোধিত ঋণ বায়তুলমাল হইতে আদায় করা। তাহা করিলেই নবী করীম (স)-এর অনুসরণ করা হইবে। কেননা তিনি নিজেই ইহা করা ওয়াজিব বলিয়া স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছেন।

— উমদাতুলকারী জিঃ ১২ পৃ. ১১৩

গরীব ফকীর লোকদের ঋণ আদায়ের এই দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বর্তিবে এই কারণেও যে ঃ

وَكَمَا اَنَّ عَلَى الْاِمَامِ اَنْ يَسُدَّ رَمَقَهُ وَيُرَاعِىْ مَصْلَحَتَهُ الدُّنْيُوِيَّةَ فَالْاُخْرُوِيَّةَ اَوْلَى - (ايضا)

গরীব-ফকীরের খাদ্য-বস্ত্র, চিকিৎসা-বাসস্থান ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা ও তাহাদের সকল বৈষয়িক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখা যখন ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য তখন ঋণের মতো একটি পরকালীন ব্যাপারেরও দায়িত্ব গ্রহণ অবশ্যই তাহার কর্তব্য হইবে।

ইমাম নববী মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

وَاِنْ خَلَفَ عِيَالًا مُحْتَاجِيْنَ جَائِعِيْنَ فَلْيَاتُوْا اِلَىَّ فَعَلَىَّ نَفْعَتُهُمْ وَمُؤْ نَتَهُمْ - (نبوى ج٢)

যদি অভাবগ্রস্ত ও প্রয়োজন পূরণ অভাবে ধ্বংসোন্মুখ সন্তান-সন্ততি রাখিয়া যায়, তবে তাহারা যেন আমার নিকট আসে, তাহাদের যাবতীয় খরচ বহন ও জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমার। — নববী, ২য় খন্ড

ইহার উপর ভিত্তি করিয়া ইবনে বাত্তাল লিখিয়াছেন ঃ

فَاِنْ لَمْ يُسْقِطِ الْاِمَامُ عَنْهُ شَيْئًا وَقَعَ الْقِصَاصُ مِنْهُ فِىْ الْاٰخِرَةِ وَلَا يُحْبَسُ الْمَيِّتُ عَنِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ لَهُ مِثْلُهُ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ -

রাষ্ট্রপ্রধান যদি উক্ত পর্যায়ে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন সেই জন্য তাহার কিসাস করা হইবে এবং বায়তুলমালের উপর তাহার হক পরিমাণ ঋণের জন্য ঋণী ব্যক্তিকে জান্নাতে যাইতে বাধা দেওয়া হইবে না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋণগ্রস্ত গরীব-ফকীর লোকদের ঋণ আদায় করিবার যে দায়িত্ব রাসূলে করীম (স) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত। মুসলমানদের সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ইহা নহে। কিন্তু এই কথা গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা এই হাদীসটির এক বর্ণনায় রাসূলের কথা فَعَلَىَّ "আমার উপর বর্তিবে" ইহার পরিবর্তে فَعَلَيْنَا "আমাদের উপর বর্তিবে" উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে করীমের এই কথা কোন ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা ছিল না; বরং ইহা হইতেছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে নীতি-নির্দেশনামূলক ঘোষণা। অতএব ইহা সর্বকালের ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَاُ هُمْ لِكِتَابِ اللّٰه فَاِنْ كَانُوْا فِىْ الْقِرَاَة سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِسُنَّة فَاِنْ كَانُوْا فِىْ السُّنَّة سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَايَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهِ عَلٰى مَقْعَدِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ - (مسلم، مسند احمد)

আবূ মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ লোকদের ইমাম (নেতা) হইবে সেই ব্যক্তি, যে তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'আলিম'। এই দিক দিয়া সব সমান হইলে সেই ব্যক্তি অগ্রসর হইবে যে 'সুন্নত' সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ। ইহাতেও সব সমান মানের হইলে সেই ব্যক্তি নামায পড়াইবে, যে হিজরতের ব্যাপারে অগ্রবর্তী। ইহাতেও সমান হইলে ইমাম হইবে সেই ব্যক্তি, যে বয়সের দিক দিয়া বড়। কোন ব্যক্তি যেন অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির স্থানে ইমামতি না করে এবং তাহার ঘরে তাহার গদির উপর তাহার অনুমতি ব্যতীতও যেন কেহ না বসে। — মুসলিম, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা এই হাদীসে বিশেষভাবে নামাযে ইমামতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে এবং সমবেত নামাযীদের মধ্যে ইমাম হইবার জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি কে, কি তাহার গুণ তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি যেহেতু পৃথক পৃথক কিংবা পরস্পর বিরোধী নয়, বরং নামাযের মসজিদ ও নামাযের বাহিরে রাজনীতির ময়দান উভয় ক্ষেত্রেই একই রূপ নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য। এই জন্য নামাযের ইমাম নির্বাচনের জন্য যে সব গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের জন্য নেতা নির্বাচনের সময়ও সেই সব গুণের দিকে পুরাপুরি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাদীসে ইমামের জন্য মোটামুটি নিম্নলিখিত গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

(১) কুরআনের জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব (২) সুন্নাত অর্থাৎ হাদীস তথা ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশি হওয়া (৩) হিজরত কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কাজে অগ্রসর হওয়া এবং (৪) বয়সের দিক দিয়া বেশি হওয়া।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনি ব্যাপারে অগ্রগণ্যতা লাভের মাপকাঠি হইতেছে দ্বীন সম্পর্কিত ইলম ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। ইহা যেমন নামাযের ইমামতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি রাষ্ট্রীয় মর্যাদার ব্যাপারেও অবশ্যই লক্ষণীয়।

হাদীসের শেষাংশে বলা হইয়াছে যে, যেখানে যে আলিমের অধিক প্রভাব ও জনপ্রিয়তা রহিয়াছে, সেখানে নামাযের ইমামতি কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্বে অপর কোন ব্যক্তির দখল করিয়া বসা মুসলমানদের সমাজ জীবনকে চরম বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া পড়িতে পারে। সেইজন্য ইহা করা কোন আলিমের পক্ষেই ঠিক হইবে না বরং প্রত্যেককেই এই দিক দিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সেই প্রভাবশালী আলিম নিজেই যদি ইহার অনুমতি দেয়, তবে অবশ্য অন্যকথা। এইভাবে কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট বিশেষ গদি কিংবা চেয়ারে তাহার অনুমতি ব্যতীত কাহারো বসা উচিত নহে। কেননা উহাতেও পারস্পরিক তিক্ততা, ভুল ধারণা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে।

নামাযের ইমাম হউন কিংবা নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান, তাঁহার মধ্যে চরিত্র ও নৈতিকতার দিক দিয়া জনপ্রিয়, গণবন্ধু ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় হওয়ার গুণ বর্তমান থাকা একান্তই অপরিহার্য। এই গুণ না থাকিলে নামাযের ইমাম ও সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতা হওয়ার কাহারো কোন অধিকার থাকিতে পারে না। এইজন্য যখনই কোন ইমাম কিংবা নেতা অনুভব করিতে পারিবে যে, জনগণের অধিকাংশই তাহাকে শ্রদ্ধা করে না— তাঁহার প্রতি কোন আস্থা রাখে না, তখনি নিজে নিজেই ইস্তফা দিয়া দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে সরিয়া পড়া কর্তব্য। বস্তুত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ও ইমামদের মধ্যে এই গুণ অবশ্যই থাকিতে হইবে। অন্যথায় সমাজের লোকদের মধ্যে ইসলামী ভাবধারা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা-আস্থার পবিত্র পরিবেশ বর্তমান থাকা সম্ভব হইবে না।

এই হাদীসকে সম্মুখে রাখিয়া যখন বর্তমান বিপর্যস্ত সমাজের সর্বস্তরের অবস্থা চিন্তা করি তখন দেখিতে পাই যে, মসজিদের ইমাম মুসল্লীদের ভক্তি-শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছে— বরং তাহার স্থানে তাহাদের মনে জাগিয়াছে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা; কিন্তু তখনও ইমাম সাহেব নামাযের ইমামতি ত্যাগ করিতে রাজি নয় কিংবা মন্ত্রী বা এম. পি. সাহেব সুস্পষ্টরূপে যখন জানিতে পারিয়াছে যে, জনগণ তাহাদের প্রতি একবিন্দু আস্থা রাখে না, বরং তাহাদিগকে চোর, দুর্নীতিপরায়ণ, মিথ্যাবাদী, ওয়াদা খিলাফকারী ও ধোঁকাবাজ বলিয়া গালাগালি করিতেছে ও তাহাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু তবুও মন্ত্রী সাহেব গদি ছাড়িতে ও এম. পি. এ. সাহেব মিথ্যা গণনেতা হওয়ার সুযোগটুকু ত্যাগ করিতে রাজি নয়। আজ এই উভয় প্রকার স্বার্থপর মোল্লাদের অভিশাপে সমাজ ধ্বংসপ্রায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلٰوتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ - (ابن ماجه)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তিন প্রকারের লোক এমন আছে যাহাদের নামায তাহার মাথার এক বিঘত পরিমাণ উর্ধ্ব উঠে না অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হওয়ার মর্যাদা পায় না। তাহারা হইতেছে— (১) এমন ব্যক্তি যে লোকদের ইমাম (নেতা) হইয়া বসিয়াছে বটে; কিন্তু সেই লোকেরাই তাহাকে অপছন্দ করে। (২) যে স্ত্রী এমন অবস্থায় রাত্রি যাপন করে যে, তাহার স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং (৩) দুই মুসলমান (ভাই) যাহারা একে অপর হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বসিয়াছে। — ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা এই পর্যায়ে তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারে কুতনী, বায়হাকী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে আরো কয়েকটি হাদীস বিভিন্ন সনদ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এ সব হাদীসের সনদ সম্পর্কে যদিও নানা আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে কিন্তু একই কথা বহু সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে মূল কথাটির বলিষ্ঠতা ও সুস্পষ্টতা অনস্বীকার্য হইয়া উঠিয়াছে। এখানে উদ্ধৃত ইবনে মাজাহ্র হাদীসটির সনদ সম্পর্কে ইরাকী বলিয়াছে ঃ اسْنَادُهُ حَسَنٌ "এই হাদীসটির সনদ উত্তম।" কাজেই এই মূল কথাটি প্রমাণের জন্য এই সব হাদীস পরিপূরক ও দলীল হিসাবে অনায়াসেই পেশ করা যাইতে পারে। হাদীসের মূল বক্তব্য হইল– তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না। 'কবুল হয় না' কথাটি বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট কথা হইয়াছে ঃ

ثَلاَثَةٌ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُمْ صَلٰوةً – (ابوداؤد، ابن ماجه)

তিনজন লোকের নামায আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

আবূ ইমামা বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

ثَلاَثَةٌ لاَتُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ اٰذَانَهُمْ – (ترمذى)

তিনজন লোকের নামায তাহাদের কর্ণদেশ অতিক্রম করে না।

হযরত আনাস বর্ণিত অপর এক হাদীসে এই কথাটি অধিকতর কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةً – (ترمذى)

তিনজন লোকের উপর রাসূলে করীম (স) অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন।

আবূ সা'দ বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

ثَلاَثَةٌ لاَتُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ رُؤُسَهُمْ – (بيهقى)

তিনজন লোকের নামায তাহাদের মাথা অতিক্রম করিয়া যায় না।

আর উপরে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

ثَلاَثَةٌ لاَتُرْفَعُ صَلٰوَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا – (ابن ماجه)

তিনজন লোকের নামায তাহাদের মাথা অতিক্রম করিয়া এক বিঘত পরিমাণও উপরে উত্থিত হয় না।

উপরের এইসব কথারই মর্ম হইল "তিনজন লোকের নামায আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না।"

এই তিনজনের মধ্যে সর্বপ্রথম হইতেছে ঃ

رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ –

সেই ব্যক্তি যে লোকদের ইমাম হইয়া বসে কিন্তু সে লোকেরা তাহাদের ঘৃণা করে, অপছন্দ করে।

অর্থাৎ লোকেরা যাহাকে ঘৃণা করে, অপছন্দ করে, তাহার ইমাম হওয়ার অধিকার নাই, ইমাম হইলে অতঃপর তাহার নামায কুবল হইবে না। তাহার উপর আল্লাহ্র অভিশম্পাত।

বস্তুত ইমামকে জনগণের আস্থাভাজন হইতে হইবে। যে লোক জনগণের আস্থাভাজন নয়, যাহার প্রতি জনগণ ঘৃণা পোষণ করে, যাহাকে ইমাম বানাইতে লোকেরা সন্তুষ্টচিত্তে রাজি নয়, তাহার ইমাম হওয়া এই হাদীসসমূহের ভিত্তিতে স্পষ্ট হারাম। জনমতকে আগ্রাহ্য করিয়া জনগণের মর্জির বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি করিয়া লোকদের ইমাম হইয়া বসিবার কোন অধিকার কাহারও নাই— তাহা নামাযের ইমামতির ব্যাপারই হউক, কি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের ক্ষেত্রেই হউক, উভয় স্থানে একই নীতি প্রযোজ্য। জনগণের ইমাম বা নেতা হইতে হইলে তাহাকে অবশ্যই জনগণের আস্থা অর্জন করিতে হইবে এবং প্রমাণ করিতে হইবে যে, যাহাদের উপর সে ইমাম হইতেছে কিংবা 'ইমাম' হওয়ার দাবি করিতেছে, তাহারা তাহাকেই ইমাম পাইবার জন্য আন্তরিকভাবে প্রস্তুত, আগ্রহান্বিত। যাহার প্রতি জনগণের এইরূপ আন্তরিক অকুণ্ঠ সমর্থন ও আস্থা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তাহার যেমন 'ইমাম' হইবার ও নিজেকে 'ইমাম'রূপে পরিচালিত করার এবং ইমামের ন্যায় প্রভাব বিস্তার ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নাই, তেমনি তাহাকে ইমামরূপে গণ্য করিবার অধিকারও কাহারও থাকিতে পারে না। ইসলামে এই কারণেই সর্বস্তরের ইমামতি— নেতৃত্ব নির্ধারণের জন্য জনমত যাচাইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। জনমত যাচাই করিবার বাস্তব পন্থা পদ্ধতি কি হইবে, সেই প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কেননা, ইহার জন্য কোন স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল পদ্ধতি দেওয়া যাইতে পারে না। দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজও নহে। ইহা লোকদের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী করা হয়। ইসলাম তাই ব্যবহারিক পদ্ধতি ও কর্মোপযোগী কাঠামোর প্রতি কোন আগ্রহ দেখায় নাই। কিন্তু জনমত যে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর ভিত্তি, ইহাকে কোন মতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যাইতে পারে না এবং নীতি যে সর্বকালের সকল স্তরের সমাজের জন্যই নির্দিষ্ট তাহা সম্পূর্ণভাবে অকাট্য ও অনস্বীকার্য। এই কারণে জোর করিয়া নামাযের ইমাম হওয়া যেমন ইসলামে নিষিদ্ধ, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করিয়া বসাও অনুরূপভাবেই হারাম।

বস্তুত ইসলামে নামাযের মসজিদ আর দুনিয়ার রাজনীতি ও রাষ্ট্রক্ষমতা সবই এক ও অভিন্ন।

অপর দুই ব্যক্তির আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া তাহা আলোচিত হইল না।

ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ وَلِّى مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحَ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ كَنُصْحِهِ وَجُهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ النَّارِ- (المعجم الصغير للطبرانى)

মা'কাল বিন ইয়াসার হইতে বর্ণিত হইয়াছে— তিনি বলিয়াছেন যে, আমি রাসূল (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয় ও ব্যাপারে দায়িত্বশীল হইয়া বসিল কিন্তু অতঃপর সে তাহাদের কল্যাণ কামনা ও খিদমতের জন্য এই রকম চেষ্টাও করিল না, যাহা সে নিজের জন্য করিয়া থাকে, তবে আল্লাহ তাহাকে উপুড় করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

ব্যাখ্যা হাদীসের বক্তব্য সুস্পষ্ট। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত তাহাকে আমীর, রাষ্ট্রপ্রধান, নেতা ও দায়িত্বশীল বানানো হয়, যাহার মধ্যে জনগণের নিঃস্বার্থ খিদমত করিবার ভাবধারা বর্তমান। কিন্তু এই ধরনের কোন ব্যক্তি যদি দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর তাহা পালন না করে, অন্তত নিজ স্বার্থের জন্য মানুষ যতখানি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে চেষ্টা করিয়া থাকে সেইরূপ চেষ্টাও না করে, তবে সে সামগ্রিক দায়িত্বের প্রতি অবহেলার অপরাধে অপরাধী। এইরূপ অবস্থায় পদত্যাগ করাই তাঁহার কর্তব্য। আর তাহা যদি না করে বরং পদ আকড়াইয়া ধরিয়া উক্ত পদের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ যথাযথ পালন হইবার সুযোগ করিয়া না দেয় তবে তাহার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। এই দুনিয়ার মানুষের দরবারেও সে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে আর পরকালে তাহার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট থাকা স্বাভাবিক।

পরকালে এই ধরনের লোকদিগকে উপুড় করিয়া উল্টাদিকে ঝুলাইয়া মাথা নিচে ও পা উপরের দিকে করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। মনে করা যাইতে পারে যে, ন্যস্ত দায়িত্ব অবহেলা করিবার অপরাধের ইহা হইতেছে নিকৃষ্ট ধরনের অপমানকর শাস্তি। অথবা তাহাকে লাঞ্ছণাপূর্ণ শাস্তি দেওয়া হইবে তাহাই বুঝাইবার জন্য এই কথা বলা হইয়াছে।

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِّى مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِّى مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَرَفِقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ -

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিয়া বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের লোকদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের যে যিম্মাদার হইবে, যে যদি লোকদিগকে ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখকষ্টে নিক্ষেপ করে তবে হে আল্লাহ! তুমিও তাহার জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টপূর্ণ করিয়া দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সামগ্রিক ব্যাপারে ও কাজকর্মের দায়িত্বশীল হইবে এবং অতঃপর সে যদি জনগণের প্রতি ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, তবে হে আল্লাহ! তুমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ দান কর। — মুসলিম

ব্যাখ্যা ইহা হযরতের একটি মূল্যবান দো'আ বিশেষ। রাসূলে করীম (স) এই দো'আর মাধ্যমে উম্মতকে একদিকে সমাজের নেতৃস্থানীয় কর্তৃত্বশীল লোকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জানাইয়া দিয়েছেন, আর অপরদিকে দায়িত্বশীল লোকেরা দায়িত্ব পালন না করিলে কিংবা উহাতে অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে কি পরিণতি হইতে পারে তাহা মূলগতভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। মোটামুটিভাবে দো'আয় বলা হইয়াছে যে, সেই ব্যক্তিই মুসলমান সমাজের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল সম্পন্ন হইতে পারে, যাহার মধ্যে জনগণের প্রতি দরদ, সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনা বিদ্যমান। আর যাহার মধ্যে জনগণের প্রতি তাহা নাই, যে ক্ষমতাসীন ও দায়িত্বশীল হইয়া অন্যের উপর দুঃখকষ্ট ও বিপর্যয় চাপাইয়া দেয়, সে কখনও মুসলমানদের নেতা ও রাষ্ট্রকর্তা হইতে পারে না। অন্যকথায় মুসলমান সমাজের নেতা ও রাষ্ট্রকর্তার কর্তব্য হইতেছে, জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, জনগণকে ভালবাসা এবং তাহাদিগকে শান্তি দানের ও তাহাদের কল্যাণের জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকা। যদি তাহা না করে, যদি জনগণের উপর দুঃখকষ্ট ও অশান্তির বোঝা চাপাইয়া দেয় তবে সে এক মুহূর্তের তরেও মুসলিম সমাজের আমীর, নেতা ও রাষ্ট্রকর্তা থাকিতে পারে না। আর রাষ্ট্রকর্তা হইয়া যদি সে

জনগণের কল্যাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, তবে সে আল্লাহ্র রহমত লাভ করিতে পারে। আর যদি তাহা না করে, তবে সে ইহকাল-পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই অপরাধী, লাঞ্ছিত ও শাস্তির যোগ্য হইবে। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নেতৃত্বের গোড়ার কথা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মানব সমাজ স্বর্ণ ও রৌপের খনির মতো। তাহাদের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগে যাহারা উত্তম, ইসলামের ক্ষেত্রেও তাহারাই উত্তম প্রমাণিত হইতে পারে, অবশ্য যদি তাহারা তাহা পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারে। — মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে মানব সমাজকে স্বর্ণ ও রৌপের খনির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য খনিতেই জন্মে। স্বর্ণ খনিতে স্বর্ণের জন্ম এবং রৌপের খনিতে রৌপ্যের উৎপাদন হয়। ইহা ব্যক্তিক্রম হওয়া সম্ভব নয়। ভাল-মন্দ— এই দুই ধরনের মানুষ সমাজ হইতেই উত্থিত হয়। সমাজ যদি উত্তম হয়, তবে তাহার অধঃস্তন বংশধরেরাও উত্তম হইবে। পক্ষান্তরে সমাজ মন্দ হইলে তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও মন্দ হইতে বাধ্য। বস্তুত স্বর্ণ ও রৌপ্য যেমন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের দরুন লোকদের নিকট মর্যাদা পাইয়া থাকে, মানুষও দুনিয়ায় নিজ নিজ স্বাভাবিক গুণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে সম্মান পাইয়া থাকে। বস্তুত স্বাভাবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ সকল অবস্থায় সকল ধরনের পরিবেশেই নিজ নিজ মর্যাদায় ভূষিত হইয়া থাকে। যাহারা ভাল নীতিবাদী, তাহারা সকল পরিবেশেই নিজ নিজ গুণে বিভূষিত হয়। যাহাদের মধ্যে জন্মগত প্রতিভা, গুণ ও কর্মক্ষমতা আছে তাহারা ইহার সাহায্যে জাহিলিয়াতের পরিবেশে যেমন নিজের প্রাধান্য স্থাপিত করিয়া থাকে, তেমনি ইসলামের পরিবর্তিত পরিবেশেও প্রধান রূপে বরিত হইতে পারে। স্বর্ণ ও রৌপ্য যেমন নিজ নিজ গুণের ভিত্তিতে নিজের মূল্য আদায় করে এবং সেই দিক দিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যে পার্থক্য থাকে তেমনি মানুষও নিজ নিজ স্বাভাবিক যোগ্যতা ও গুণের দিক দিয়া বিশ্বসমাজে মর্যাদা লাভ করে এবং সেদিক দিয়া তাহাদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া থাকে। কিন্তু সেই জন্য ইসলামকে অনুধাবন করা ও তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করা জরুরী শর্ত হইয়া রহিয়াছে। ইসলামকে যথাযথরূপে অনুধাবন না করিলে এই বৈশিষ্ট্য লাভ করা সম্ভব নয়।

ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসকেও সম্মুখে রাখিলে এই হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আরো সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। নবী করীম (স)-এর ইসলামী আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাহারা সর্বপ্রথম ইহাতে যোগদান করিবার জন্য অগ্রসর হন, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রাক-ইসলামী সমাজে নানাভাবে প্রধান ও মর্যাদা সম্পন্নরূপে বরিত ছিলেন। হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, আলী হায়দার ও উসমান জিন্নুরাইন (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। যে খালিদ ইসলামকে নির্মূল করিবার জন্য তরবারী চালাইয়াছেন জাহিলিয়াতের যুগে এবং মুসলিম নিধন কার্যে একে একে নয়খানি শানিত তরবারী চূর্ণ করিয়াছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ইসলামের দিগ্বিজয়ের সূচনা করেন। এই সকল ব্যক্তির স্বাভাবিক জন্মগত

যোগ্যতা ছিল বলিয়াই তাঁহারা যেমন ইসলাম পূর্ব সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি ইসলাম উত্তর যুগেও ইহাদের যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও বিপুল কর্মক্ষমতার কারণে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী জয় করা সম্ভব হইয়াছিল।

এই হাদীসের মূল বক্তব্য এই যে, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা থাকিলে উহার দ্বারা যেমন ইসলামের দুশমনি করা যায় পূর্ণ যোগ্যতা সহকারে তেমনি ইসলামের খিদমত— ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ দক্ষতা সহকারেই কাজ করা যায়। আর যোগ্যতা না থাকিলে তাহার দ্বারা কোন কাজই হওয়া সম্ভব নয়। অযোগ্য লোকদের দ্বারা যেমন ইসলামের দুশমনি ও বিশেষ কিছু হইতে পারে না তেমনি ইসলামের কোন খিদমত হওয়াও সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যোগ্য লোকেরা যেমন কোন মিথ্যা, বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য আদর্শ ও মতবাদকে গ্রহণ করিয়া উহাকে সব কিছুর উপর জয়ী করিতে পারে; তেমনি অযোগ্য লোকেরা কোন সুষ্ঠু, উন্নত ও মানবতার পক্ষে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উহার শুধু দুর্নামই করিয়া থাকে। বর্তমান দুনিয়ার যোগ্যতাহীন মুসলমানদের দ্বারা ইসলামী জীবনাদর্শের ক্ষতি ছাড়া উপকার কিছুই হইতেছে না অথচ যোগ্য ও কর্মক্ষমতা সম্পন্ন লোকদের বলিষ্ঠ হস্তে কমিউনিজমের ন্যায় একটি জঘন্য ও মানবতা বিরোধী মতবাদ সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করিয়াছে। মুসলমানকে আজ এই হাদীসের আলোকে যোগ্যতা ও বিশিষ্ট গুণ সহকারে ইসলামের ঝাণ্ডা উন্নত করিবার জন্য নতুনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

দায়িত্বপূর্ণ পদের লোভ

عَنْ اَبِى مُوْسٰى رض قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى النَّبِيِّ ﷺ اَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِى عَمِّى فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِّرْنَا عَلٰى بَعْضِ مَّا وَلَّاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّا وَاللّٰهِ لا نُوَلِّىْ هٰذَا الْعَمَلَ اَحَدًا سَأَ لَهُ وَلَا اَحَدً حَرَص عَلَيْهِ -

হযরত আবূ মুসা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন ঃ আমি ও আমার চাচার বংশের দুই ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। অপর দুই ব্যক্তির একজন বলিল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে বিরাট দায়িত্ব-ক্ষমতা দান করিয়াছেন তাহার কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমাকে নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ প্রার্থনা জানাইল। তখন নবী করীম (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ, আমি এই কাজে এমন কাহাকেও নিযুক্ত করিব না, যে উহার প্রার্থনা করে এবং উহা পাইবার লোভ পোষণ করে।

— মুসলিম

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسْئَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا - (بخارى مسلم)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমীর পদ লাভের জন্য প্রার্থী হইও না। কেননা এই পদ যদি তুমি

প্রার্থনা করিয়া লাভ কর, তবে তোমাকে উহার নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া হইবে, আর আমীর পদ যদি প্রার্থনা ব্যতিরেকেই লাভ হয়, তবে (সেখানে দায়িত্ব পালনের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে) তোমাকে সাহায্য করা হইবে। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ইসলামী সংস্থা ও সমিতির আমীর বা নেতৃপদ এবং ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি এতদূর কঠিন দায়িত্বপূর্ণ বিষয় যে, কোন বুদ্ধিমান মানুষই নিজে চাহিয়া, প্রার্থনা করিয়া উহা লাভ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে না।

এতদসত্ত্বেও যদি কেহ চেষ্টা-সাধনা করিয়াই এই দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করে তবে হয় সে এই পদের গুরুত্ব, তীব্রতা ও কঠোরতা অনুধাবন করিতে পারে নাই; আর না হয়, না বুঝিবার কারণেই সে উহা লাভ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। অন্যথায় সব বুঝিতে পারিয়া নিছক ক্ষমতার লোভ ও লালসার কারণেই সে উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আর এই উভয় অবস্থায়ই এই ধরনের ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের কোন একটি কর্তৃত্বের পদই পাওয়ার যোগ্য নয়। ঠিক এইজন্য প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করা ও সেই জন্য অর্থ ব্যয় করা একেবারেই জায়েয নয়। উপরন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে তাহাকে এই ধরনের পদ লাভের সুযোগ দেওয়াও ইসলামে সম্পূর্ণ নাজায়েয।

পক্ষান্তরে পদের জন্য প্রার্থনা বা চেষ্টা-সাধনা ব্যতিরেকেই যদি কাহারো উপর কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পিত হয়, তবে তাহা যত বড় পদই হউক না কেন, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে রহমত ও সাহায্য নাযিল হইবে। কেননা এই পদ সে নিজে প্রার্থনা বা চেষ্টা করিয়া লাভ করে নাই, চেষ্টা ও প্রার্থনা ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র মঞ্জুরীক্রমে জনগণের পক্ষ হইতে তাহার উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। কাজেই এই দায়িত্ব পালনে সে আল্লাহ্‌র রহমত ও জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিতে পারিবে।

ঠিক এই কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রে নেতা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরপেক্ষ মনোনয়ন ভিত্তিক নির্বাচন পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও সমাজে নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিলেই এই হাদীসের সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতে পারে।

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَالَ وُكِلَ اِلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهٗ - (ترمذى، ابن ماجه)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চাহিয়া গ্রহণ করিল, তাহাকে তার নফসের নিকটই সোপর্দ করিয়া দেওয়া হইবে। আর যাহাকে এই কাজ করিবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছে, তাহার প্রতি আল্লাহ ফেরেশতা নাযিল করিবেন, সে তাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে থাকিবে।
— তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা কেবল বিচারকের পদই নহে, সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ কোন পদই যদি কেহ চাহিয়া ও প্রার্থনা করিয়া লাভ করে তবে সে এই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোনই রহমত পাইতে পারে না। কেননা সেই ইহা নিজে চাহিয়া, প্রার্থনা করিয়া ও সেইজন্য চেষ্টা-সাধনা

করিয়া পাইয়াছে। আর এই সবকিছুর সাহায্যে কোন পদ লাভ করা হইলে প্রমাণিত হয় যে, ইহা লাভ করিবার পিছনে তাহার নিজের কোন স্বার্থ, লোভ ও কুমতলব নিশ্চয়ই ছিল। আর স্বার্থপর কুমতলবের লোক আল্লাহ্‌র রহমত হইতে চিরদিনই বঞ্চিত হইতে বাধ্য। ইহার বর্ণনা প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ লিখিয়াছেন ঃ

وَالْحِكْمَةُ فِيْ أَنَّهُ لَا يُوَلَّى مَنْ يَسْئَلُ الْوَلَايَةَ أَنَّهُ يُوَكَّلُ إِلَيْهَا وَلَا يَكُوْنُ مَعَهُ إِعَانَةٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِعَانَةٌ لَا يَكُوْنُ كُفُوًا وَلَا يُوَلَّى غَيْرُ الْكَفْءِ لِأَنَّ فِيْهِ تُهْمَةٌ - (نيل الاوطارج، ص١٥٩)

যে লোক পদপ্রার্থী হইবে তাহাকে কোন পদ না দেওয়ার কারণ এই যে, তাহাকে তাহা দেওয়া হইলে তাহাকে উহার প্রতিই সোপর্দ করা হইবে। তাহার জন্য কোন সাহায্য আসিবে না। আর যাহার জন্য কোন সাহায্য আসিবে না সে উহার উপযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে না। আর উপযুক্ত না হইলে তাহাকে কোন পদ দেওয়া ঠিক নয়, কেননা তাহাতে বিশেষ দোষ রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে সে যদি কোন পদ পাইতে না চাহে, নিজে প্রার্থনা না করে ও কোন প্রকার চেষ্টা-তদবীর না করে, বরং জনগণ কিংবা জনপ্রতিনিধিরা নিজেরাই এই পদে তাহাকে অভিষিক্ত করে ও এই কাজ করিতে বাধ্য করে, আর ইহার পরই সে এই পদ লাভ করে, তবে এই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সে আল্লাহ্‌র রহমত পাইবে। কেননা তাহার মধ্যে কোন স্বার্থপরতা ছিল না, কোন কুমতলব ছিল না বলিয়াই সে চাহে নাই। ইহার জন্য প্রার্থনা করে নাই। এখন যখন জনগণই তাহাকে এই পদে নিযুক্ত করিয়াছে, তখন জনগণের সহযোগিতা ও আল্লাহ্‌র রহমতে এই কাজ সম্পন্ন করা তাহার পক্ষে সহজ ও সম্ভব। বিশেষত এইরূপ অবস্থায় সঠিক পথে থাকিয়া সঠিক কাজ করিবার জন্য আল্লাহ্ নিজেই কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

সৎ ও অসৎ নেতৃত্বের পরিণাম

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ أُمَرَا ئُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ سُمَحَا لَكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَا ئُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَا ئُكُمْ بُخَلَائَكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ إِلٰى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا - (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের নেতা ও শাসকগণ যখন (চরিত্র ও কাজকর্মের দিক দিয়া) উত্তম লোক হইবে, তোমাদের (সমাজের) সচ্ছল ও ধনী লোকগণ যখন দানশীল হইবে এবং তোমাদের সামগ্রিক ও সামাজিক কাজকর্ম যখন পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হইবে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য পৃথিবীর উপরিভাগ (অর্থাৎ এই জীবন) নিম্নভাগ (অর্থাৎ মৃত্যু) হইতে উত্তম হইবে।

পক্ষান্তরে তোমাদের নেতা ও শাসকগণ যখন দুষ্ট-প্রকৃতির অসচ্চরিত্রের হইবে, তোমাদের ধনী লোকেরা কৃপণ হইবে এবং তোমাদের জাতীয় ও সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ তোমাদের বেগমদের নিকট সোপর্দ হইবে, তখন জমির নিম্নভাগ (মৃত্যু) উপরিভাগ (এই জীবন) হইতে উত্তম হইবে। —তিরমিযী

এই হাদীসে তিনটি জিনিসকে ইসলামী সমাজের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ লাভের একমাত্র উৎস বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কোন মুমিন সমাজে এই তিনটি জিনিস যথাযথভাবে বর্তমান থাকিলে উহা সর্বাত্মক শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ হইতে পারে।

সেই তিনটি জিনিস যথাক্রমে এইঃ (১) আল্লাহভীরু নেতৃত্ব ও সরকার (২) দানশীল ও গরীবের বন্ধু, সচ্ছল ও ধনী লোক এবং (৩) সমস্ত জাতীয় ও সামগ্রিক ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শ গণ-অধিকার সম্মত পন্থায় সম্পন্ন হওয়া।

এই তিনটি জিনিস যদি কোন সমাজে বর্তমান না থাকে বরং উহার বিপরীত তিনটি জিনিস যথা অসচ্চরিত্রের নেতা ও দুষ্ট প্রকৃতির শাসক, কৃপণ, লোভী ও শোষক ধনী লোক এবং নারীদের প্রাধান্য যদি সমাজে স্থান পায় তবে সেই সমাজে কোন মানুষই শান্তি পাইতে পারে না। তখন মানুষের জীবন হইবে দুঃখ-ভারাক্রান্ত এবং তখন লোকেরা মরিয়া বাঁচিবে এবং শান্তি পাইবে। আর এই ধরনের সমাজ দুনিয়ায় বেশি দিন টিকিয়াও থাকিতে পারে না। আজ হউক আর কাল হউক, তাহা ধ্বংস হইবেই। বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা এই হাদীসের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিতেছে।

দ্বীন ও রাষ্ট্র

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رض قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذُوْا الْعَطَا مَادَامَ عَطَاءً فَاذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلَاتَاْخُذُوْهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِهٖ يَمْنَعُكُمْ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ اَلَا اِنَّ رِحَاالْاِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ اَلَا اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانَ فَلَاتُفَارِقُوْا الْكِتَابَ اَلَا اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ - قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

(المعجم الصغير للطبرانى)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ দান-উপঢৌকন গ্রহণ করিতে পার, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা দান-উপঢৌকন হইবে। কিন্তু ইহা যদি দ্বীনের ব্যাপারে ঘুষের পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায় তবে তাহা কিছুতেই কবুল করিতে পারিবে না। কিন্তু সম্ভবত তোমরা তাহা ছাড়িতে রাজি হইবে না, দারিদ্র্য ও প্রয়োজন তোমাদিগকে তাহা কবুল করিতে বাধ্য করিবে।

হাঁ, জানিয়া রাখ, ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান হইয়া আছে, অতএব তোমরা কুরআনের সাথে ঘূর্ণায়মান হও। মনে রাখিবে, কুরআন ও শাসন-ক্ষমতা-প্রভুত্ব উভয়ই অচিরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তবে সাবধান, তোমরা যেন কুরআনের সঙ্গ পরিত্যাগ না কর। ভবিষ্যতে এমন সব লোক তোমাদের শাসক হইয়া বসিবে, যাহারা তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করিবে। তখন তোমরা যদি তাহাদিগকে মানিয়া চল, তবে তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবে, আর তোমরা যদি তাহাদে অমান্য কর, তবে তোমাদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিবে।

হাদীস বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে রাসূল! তখন আমরা কি করিব ? উত্তরে রাসূল ইরশাদ করিলেন ঃ তোমরা তখন তাহাই করিবে, যাহা হযরত ঈসা (আ)-এর সঙ্গী-সাথীগণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে করাত দ্বারা দীর্ণ করা হইয়াছে, তাঁহারা শুলবিদ্ধ হইয়াছেন। কেননা আল্লাহ্র নাফমানী লিপ্ত জীবন অপেক্ষা আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্য দিয়া মৃত্যুবরণ অনেক উত্তম। — আল-মু'জিমুস সগীর

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রথমত পারস্পরিক হাদিয়া-তোহফা দান-উপঢৌকন এবং দাওয়াত-যিয়াফত খাওয়া-দাওয়া করা মূলত অত্যন্ত ভাল ও উত্তম কাজ সন্দেহ নাই। হাদীসে এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ উৎসাহ দান করা হইয়াছে।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই হাদিয়া-তোহফা নির্দোষ হাদিয়া-তোহফা থাকে না, তখন তাহা সুস্পষ্টরূপে ঘুষের পর্যায়ে পড়িয়া যায়। রাসূলে করীম (স) এই কথাটি দ্বারা তাঁহার উম্মতকে এই বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কেননা ঘুষ ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে হারাম, তাহা যে-কোন ভাবে বা যে-কোন রূপে দেওয়া ও গ্রহণ করা হউক না কেন।

হাদিয়া-তোহফা জায়েজ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা পারস্পরিক বন্ধুত্ব প্রীতি এবং ভালবাসা বৃদ্ধি ও গভীর করে। যেমন অপর একটি হাদীসে স্বয়ং রাসূলে করীম (স) পারস্পরিক হাদিয়া-তোহফা দেওয়া-নেওয়া করিতে বলিয়াছেন এই ভাষায় ঃ

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا -

তোমরা পরস্পর হাদীয়া-তোহফা দেওয়া-নেওয়া কর, তাহা হইলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, প্রীতি ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে ও বৃদ্ধি পাইবে।

স্পষ্ট বুঝা যায়, হাদিয়া-তোহফা যতক্ষণ পর্যন্ত সমশ্রেণীর লোকদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে দেওয়া-নেওয়া হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা জায়েয হইবে অবশ্য যদি পারস্পরিক বন্ধুত্ব-ভালোবাসা বৃদ্ধি করা উহার লক্ষ্য হয় এবং তাহা এক তরফা না হইয়া উভয় পক্ষ থেকে হইতে থাকে। এক পক্ষ কেবল দিবে আর অপর পক্ষ কেবল গ্রহণ করিতে থাকিবে, এইরূপ হইলে তাহা রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ মতো হইল না বুঝিতে হইবে।

এই হাদীয়া-তোহফা যদি কোন একপক্ষ অধিক শক্তিশালী বা অধিক মর্যাদাশালী ব্যক্তিকে কেবল দিতেই থাকে, আর অপর পক্ষ তাহা কেবল গ্রহণ করিতেই থাকে তাহা হইলে উহা আর হাদিয়া-তোহফা থাকিবে না, ঘুষে পরিণত হইবে।

যেমন সাধারণ মানুষ যদি সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তিকে হাদিয়া-তোহফা দেয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই সেই পদাধিকারী ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার দ্বারা কোন অবৈধ বৈষয়িক স্বার্থ

লাভই উদ্দেশ্য হইতে পারে। এখানে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে পারস্পরিকতা যেমন নাই, তেমনি দাতা ও গ্রহীতা সমশ্রেণীরও নয় বলিয়া পারস্পরিক ভালোবাসা বন্ধুত্ব বৃদ্ধিরও কোন প্রশ্ন এখানে নাই। এখানে এই হাদিয়া-তোহফা নিছক ঘুষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনুরূপভাবে কামিল পীর নামে খ্যাত ব্যক্তিদেরকে তাহাদের মুরীদরা যে একতরফাভাবে হাদিয়া-তোহফা দেয়, দিয়া দিয়া স্তুপ সৃষ্টি করে, যাহার পরিণাম না গণিয়া ধারণা করা যায় না, অনুমান করিতে গিয়া কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না এবং কে কত হাদিয়া পায় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এক-একজন পীরের শ্রেষ্ঠত্ব ও কামালত্ব যাচাই করা হয়, ইহা কখনই জায়েয ধরনের এবং রাসূলের করীম (স)-এর কথানুরূপ হাদিয়া-তোহফা নয়। বস্তুত তাহা নিছক ঘুষের পর্যায়ে গণ্য। কেননা মুরীদরা এখানে এই মনোভাব লইয়া হাদিয়া দেয় যে, ইহাতে পীর খুশী হইবেন আর পীর খুশী হইলে পরকালে বেহেশতে যাইতে পারা নিশ্চিত হইবে। বেশি ও মূল্যবান হাদিয়া দাতা মুরীদ মনে করিতে পারে, পীর সাহেবকে এত এত হাদিয়া-তোহফা দিলাম, তিনি নিশ্চিয়ই আমাকে সঙ্গে না লইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবেন না। অর্থাৎ পীর তো বেহেশতে যাইবেনই ইহা নিশ্চিত আর তাহাকে হাদিয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিতে থাকার দরুন মুরীদের বেহেশতে যাওয়াও সুনিশ্চিত। বস্তুত ইহাও অবৈধ স্বার্থলাভের জন্য দেওয়া হাদিয়া, যদিও তাহা বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়, পরকালীন স্বার্থের জন্য। অতএব ইহাও ঘুষের পর্যায়ে গণ্য। রাসূলে করীম (স)-এর কথা অনুযায়ী ইহা ধর্মীয় ব্যাপারে ঘুষ।

হাদিয়া ধর্মীয় ব্যাপারে ঘুষ হইয়া যায় যদি শরীয়তের মাসলা বিকৃত করিয়া কাহারও নাজায়েয কাজকে জায়েয প্রমাণ করার জন্য হাদিয়ার বিনিময়ে ফতোয়া দেওয়া হয়। ইহা আরও মারাত্মক ধরনের ঘুষ হইয়া যায়, যখন দ্বীনের দৃষ্টিতে কোন শাসকের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা, প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করা একান্ত কর্তব্য হইলেও শাসকের নিকট হইতে নগদ দ্রব্যরূপে হাদিয়া পাইয়া সেই কর্তব্য পালন হইতে বিরত থাকা হয়। যেমন মুসলিম দেশগুলিতে গায়র-ইসলামী ও জালিম শাসকের মূল্যবান উপঢৌকন বা বড় বড় বেতনের চাকুরী কিংবা সুযোগ-সুবিধা পাইয়া আলেমগণ তাহার বিরোধিতা বা সমালোচনা-প্রতিবাদের পরিবর্তে তাহার প্রতি সমর্থন জানাইতে থাকেন, তাহাকে 'যিল্লুল্লাহ' আল্লাহ্‌র ছায়া বা 'জালালাতুল মালিক'— মহাপ্রতাপান্বিত বাদশাহ' প্রভৃতি শিরকী উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং প্রতি পদে পদে তাহার প্রতি আনুগত্য জানাইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা হয়। এই সময় উপঢৌকন, বড় বেতনের চাকুরী ও সুবিধা 'বড়'র নিকট হইতে 'ছোট'র নিকট আসে। ইহাও সমশ্রেণীর লোকদের মধ্যে হয় না, পারস্পরিক হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া হয় না। ফলে ইহাকে ঘুষ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান হইয়া আছে। অতএব তোমরা কুরআনের সাথে সাথে ঘূর্ণায়মান হও— ইহা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতেই ইসলামের স্থবিরতার পরিবর্তে ক্রমে অগ্রগতির কথা বলা হইয়াছে। কালও যেমন বিবর্তনশীল, অগ্রসরমান দ্বীন-ইসলামও অনুরূপভাবে বিবর্তন বিকাশশীল, ক্রম সম্প্রসারণশীল। এই অবস্থায় একটি জিনিসকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইল আল্লাহ্‌র কিতাব— কুরআন মজীদ। কাল ও উহার অগ্রসরমানতা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি, কুরআন সেই আল্লাহরই কালাম। কালের বিকাশ ও অগ্রগতি যতই তীব্র হউক, কুরআন সেই তীব্রতার সহিত পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মানুষকে পথ-নির্দেশ করিতে সক্ষম। অতএব কুরআনকে শক্ত করিয়া

ধরিতে হইবে এবং কোন অবস্থায়ই উহা ছাড়া যাইবে না। তাহা হইলে কালের কুটিল চক্রে উর্ত্তীণ হওয়া ও ইসলামের পথে দৃঢ় হইয়া থাকা সম্ভব হইবে।

রাসূলে করীম (স) যে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন, তাহা ছিল পুরাপুরিভাবে কুরআনভিত্তিক। কার্যত উহা ছিল কুরআনভিত্তিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা। আলোচ্য হাদীসে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া মুসলমানদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, একটা সময় আসিবে, যখন মুসলমানদের সমাজ ও রাষ্ট্র কুরআনভিত্তিক ও কুরআন অনুসারী থাকিবে না। কুরআন ও রাষ্ট্র তখন 'এক' থাকিবে না, ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। রাষ্ট্র কুরআন অনুযায়ী চলিবে না, কুরআনকে রাষ্ট্রের বিধান রূপে গ্রহণ করা হইবে না। বস্তুত খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলের পর হইতে মুসলিম জাহানের যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে ও বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিতেছে রাসূলে করীম (স)-এর উক্ত কথাটিতে 'মনে রাখিও কুরআন ও রাষ্ট্র-শাসন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে' তে উহার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইতিহাস রাসূলের কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। মুসলিম জাহানের এই অবস্থা শধু মুসলিম ইতিহাসেই নয়। বিশ্ব মানবের ইতিহাসে একটি অতিবড় কলংক। মুসলমানেরা রাসূলের সাবধানবাণীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই।

এইরূপ অবস্থায় ঈমানদার লোকদের কর্তব্য কি ? রাসূল (স) বলিয়াছেন, কর্তব্য হইল ঃ কুরআন অমান্যকারী রাষ্ট্র-সরকার ও বিচারককে প্রকাশ্যভাবে অমান্য করা। কেননা উহা মানিলে দ্বীন-ইসলাম হইতে গুমরাহ হইয়া যাইতে হইবে। আর যদি অমান্য করা হয়, তাহা হইলে অবশ্য কঠিন কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

তিনি এই পর্যায়ে হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মতের উপর কৃত অমানুষিক অত্যাচার-জুলুমের কথা শুনাইয়া বলিলেন, তোমাদের উপরও অনুরূপ অত্যাচার-জুলুম করা হইবে, করাত দিয়া দীর্ণ করা হইবে, শুলবিদ্ধ করা হইবে, ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হইবে। বস্তুত যে রাষ্ট্র কুরআনভিত্তিক ও কুরআন অনুসারী নয়, তাহা নিঃসন্দেহে মানবতার দুশমন। তাহা মানুষকে স্বাধীনভাবে কোন আকীদা গ্রহণ ও কোন আদর্শ পালন করিতে দিতে প্রস্তুত হয় না। এবং কেহ তাহা করিলে তাহার উপর অত্যাচার জুলুমের পাহাড় ভাঙ্গিয়া ফেলে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে ঈমানদার ব্যক্তি ও ব্যক্তিগণের নীতি কি হওয়া উচিত, সাহাবীর এই প্রশ্নের জওয়াব দানের পর রাসূলে করীম (স) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র আনুগত্যের অধীন মৃত্যুবরণ আল্লাহ্র নাফরমানীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকার তুলনায় অনেক উত্তম।

বস্তুত ইহা মুল্যমানের (Values) কথা। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য। ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যু অনিবার্য, অতএব ইহা অবশ্যই আল্লাহ্র আনুগত্যের অধীন হইতে হইবে। তাহা হইলে এই মৃত্যু ব্যক্তির জন্য পরকালীন চিরন্তনী সুখ ও শান্তি নিয়া আসিবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র নাফরমানীর মধ্যে জীবনে বাঁচিয়া থাকার পরিণাম নিজের জন্য ইহকালীণ লাঞ্ছণা ও পরকালীন জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

মুসলিম ব্যক্তির নিকট তাই এই জীবনের তুলনায় আল্লাহ্র আনুগত্য ভিত্তিক মৃত্যুই শ্রেয়। ইসলামী তওহীদী ঈমানের ইহাই অনিবার্য দাবি। মুসলমানেরা রাসূলের নিকট হইতে এই বিপ্লবী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা বিশ্বমানকে জাহিলিয়াতের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের বুক দীর্ণ করিয়া তওহীদী দ্বীনের দিক উজ্জ্বলকারী সূর্যের উদয় সম্ভব করিয়াছিলেন, সক্ষম হইয়াছিলেন বস্তুবাদী মুশরিকী সভ্যতার পতন ঘটাইয়া ইসলামী সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত

করিতে। কেননা তাঁহারা মৃত্যুকে ভয় করিতেন না, আল্লাহ্‌র জন্য মৃত্যুর তুলনায় আল্লাহ্‌র নাফরমানীর জীবন তাঁহাদের নিকট ছিল ঘৃণ্য। ইহা রাসূলেরই শিক্ষার ফসল।

নাগরিকদের কর্তব্য

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيْ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلاَ ئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ - (صحيح مسلم)

তামীমীদ্দারী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ দ্বীন বলা হয় নসীহত ও কল্যাণ কামনাকে। (এই কথা তিনি একাধিক্রমে তিনবার বলিয়াছেন) হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ হে রাসূল! এই নসীহত ও কল্যাণ কামনা কাহার জন্য ? উত্তরে তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ আল্লাহ্, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রাসূল, মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম জনগণের জন্য। — মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইহা হইতে প্রমাণিত হয় এই হাদীসটিকে মুসলিম ছাড়াও তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারেমী প্রভৃতি গ্রন্থে একই ভাষায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইমাম আবূ উবাইদা তাহার ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কিত গ্রন্থ 'কিতাবুল আমওয়াল'-এর সূচনাতেই এ হাদীসটির উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম নববী হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ

هٰذَا حَدِيْثٌ عَظِيْمُ الشَّانِ وَعَلَيْهِ مَدَارُالْاِسْلَامِ -

ইহা এক বিরাট মর্যাদা ও গুরুত্বসম্পন্ন হাদীস এবং ইহার উপর ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপিত।

হাদীসে উল্লেখিত 'নুসহ' শব্দের আসল অর্থঃ সকল প্রকার ভেজাল, মিশ্রণ ও জাল হইতে পবিত্র হওয়া। মধু যখন মোম ইত্যাদি আবর্জনা হইতে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন করিয়া লওয়া হয়, তখন (আরবীতে) বলা হয় খালিস মধু। মানুষের মন যখন কপটতা, হিংসা, দ্বেষ ও সকল প্রকার বক্রতা, কুটিলতা হইতে পবিত্র হয়, তখন আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ نَصَحَ قَلْبُ الْاِنْسَانِ । ইহা দ্বারা মানুষের ভিতর ও বাহির মন ও মুখের পূর্ণ সামঞ্জস্য ও উহার পরিচ্ছন্নতা এবং কপটশূন্য হওয়া বুঝায়। কুরআন মজীদে ঠিক এই অর্থে ঈমানদার লোকদিগকে 'তওবাতুন্নুসুহ' করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এমনভাবে তওবা করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে যাহা সকল প্রকার মুনাফিকী ও বহুরূপ ভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কুরআনে মুমিনদের পরিচয় প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ مَايُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (التوبة- ٩١)

অক্ষম, রুগ্ন এবং জিহাদের সময় কিছু খরচ করিতে অসমর্থ লোকদের সম্পর্কে কোনই অভিযোগ নাই, অবশ্য যদি তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য নসীহতের বাস্তব প্রতীক

হয়। আর যাহারা মুহসিন, তাহাদের উপরও কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল। — সূরা তাওবা ঃ ১৯

অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় জিহাদের ময়দান হইতে পশ্চাদপসরণ করা ঈমান ও আল্লাহনুগত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যুক্তিসঙ্গত ওজর থাকিলে অবশ্য আল্লাহ্র নিকট তাহা ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে; কিন্তু সেই জন্য শর্ত এই যে দ্বীন, ঈমান ও আল্লাহ্নুগত্যের গভীর ভাবধারায় পরিপূর্ণ থাকিবে।

ইহা হইতে জানা গেল যে, অক্ষম লোকদের উপর ইসলামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও কার্যকরীভাবে প্রচেষ্টা চালাইবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় নাই। নসীহত ও কল্যাণ কামনা একটি সাধারণ কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। কিন্তু ইহার দায়িত্ব নির্বিশেষে সকল ঈমানদারের উপরই অর্পণ করা হইয়াছে।

হাদীসে উক্ত 'আল্লাহ্র জন্য নসীহত' অর্থ এই যে, মানুষ নিজের ও আল্লাহ্র মধ্যবর্তী সম্পর্কের ব্যাপারে কোন প্রকার কৃত্রিমতার স্থান দিবে না বরং হৃদয় ও অন্তরের গভীরতম কেন্দ্রের প্রত্যেক স্পন্দন দিয়াই আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের অভিব্যক্তি করিবে।

এই আন্তরিক নিষ্ঠার দাবি এই যে, আল্লাহ্র প্রত্যেক বান্দা আল্লাহ্র জাত, সিফাত, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অধিকার প্রভৃতি কোন একটি দিক দিয়াও কাহাকেও তাহার সহিত শরীক করিবে না। ইহার ফলে মানুষ ঠিক নিজেরই কল্যাণের ব্যবস্থা করিবে ও নিজেরই ইহ-পরকাল সুন্দর করিয়া গড়িবে। ইহাই বলা হইয়াছে এই আয়াতে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ -

যে লোক নেক আমল করিল সে তাহার নিজের জন্যই করিল। (ফল সে নিজেই পাইবে)।

আল্লাহ্র কিতাবের জন্য নসীহত অর্থ ঃ কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্যকে কার্যকরীভাবে পূর্ণ করা। এই উদ্দেশ্য কার্যকর করিবার উপায় হইতেছে তিনটি ঃ

১. তিলাওয়াত ঃ কুরআন মজীদ সঠিকভাবে, থামিয়া থামিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে পাঠ করা।

২. চিন্তা গবেষণা ঃ কুরআনের নিছক পাঠ বিরাট কোন কল্যাণ বহন করিয়া আনিতে পারে না, বরং মূলত উহা চিন্তা ও গবেষণার জিনিস।

৩. কুরআনের বিধান কার্যকরভাবে জারী করণ ঃ বস্তুত কুরআন শধু এইজন্য নাযিল হয় নাই যে, উহা কেবলমাত্র পাঠ করা হইবে। উপরন্তু নিছক কোন দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থও উহা নহে। প্রকৃতপক্ষে উহা হইতেছে মানুষের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই উহাকে পড়িতে হইবে, গবষণা ও অনুধাবন করিতে হইবে এবং উহাকে একখানি আইন ও বিধান গ্রন্থ হিসাবে জীবনের সর্বদিকে কার্যকরভাবে জারি করিতে হইবে।

'রাসূলের জন্য নসীহত' অর্থাৎ রাসূলের আদর্শকে জীবন্ত ও পুনপ্রতিষ্ঠিত করা এবং রাসূলের প্রদত্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করা। রাসূলের প্রদত্ত আদর্শকে অন্যান্য সকল আদর্শের উপরে স্থান দিতে হইবে। তাঁহার কথা ও কাজের উপর অন্য কাহারো কাজ বা কথা একবিন্দু প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না।

"মুসলিম ইমামদের জন্য নসীহত" অর্থ মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্র পরিচালকদের জন্য কল্যাণ কামনা এখানে নামায ও মসজিদসর্বস্ব ইমামদের কথা বলা হয় নাই। কেননা

মসজিদের অভ্যন্তরে নামাযের ইমাম হইলেও সত্যিকারভাবে মুসলিম সমাজের সর্বাত্মক নেথ" তাহারা নহেন। পক্ষান্তরে তথাকথিত ধর্মহীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথাও এখানে বলা হয় নাই। কেননা তাহারা রাজনীতি হইতে আল্লাহকে বে-দখল করিয়া দিয়া নৈতিকতা বিবর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতা লইয়া মাতিয়াছে। বরং এখানে ইসলামী সমাজের আদর্শবাদী সর্বাত্মক নেতৃত্ব সম্পন্ন লোকদের কথাই বলা হইয়াছে।

তাহাদের জন্য নসীহত অর্থ সর্বাবস্থায়ই তাহাদের কল্যাণ কামনা করা। তাহারা সঠিক কাজ করিলে তাহাদের পূর্ণ সহযোগিতা, আর অন্যায় কিছু করিলে তাহাদের সমালোচনা করা ও তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য স্পষ্ট ভাষায় সত্য কথা বলা। এইরূপ নসীহত করিত দিয়া নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন ইতিহাসে এইরূপ লোক কিছুমাত্র বিরল নহেন।

"সাধারণ মুসলমানের জন্য নসীহত", নিম্নোক্তভাবে কয়েকটি দিক দিয়াই এই কাজ সম্পন্ন করা যাইতে পারে ঃ

১. সাধারণ মুসলমান গোমরাহ হইতে গেলে তাহাদিগকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া সৎপথের দিকে ফিরাইয়া লইয়া আসা।

২. তাহারা মূর্খ হইলে তাহাদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান প্রচার করা এবং ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত পৌছাইয়া দেওয়া।

৩. রোগাক্রান্ত হইলে তাহাদের সেবা-শুশ্রুষা করা, তাহাদের জন্য ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; যেন কেহই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু মুখে পতিত হইতে বাধ্য না হয়।

৪. মুসলমানদের কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে, মজলুম হইলে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এই বিপদ ও জুলুম হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করা।

৫. কোন মুসলমান মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তাহার কাফন, জানাজা ও দাফনের ব্যবস্থা করা এবং তাহাতে যোগদান করা। তাহার নিকটতর আত্মীয় স্বজনকে 'সবরের' উপদেশ দেওয়া।

বস্তুত ইহা আকারে একটি ছোট্ট হাদীস হইলেও মূলত ইহাতে দ্বীন-ইসলামের সারাংশ শামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মুসলিম জীবনের জন্য একটি উন্নত ধরনের কার্যসূচীও ইহাতে রহিয়াছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوٰى هُمْ لَادَّعٰى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ - (مسلم)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে , রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লোকদের পক্ষে যদি কেবল তাহাদের দাবি অনুযায়ীই ফয়সালা করিয়া দেওয়া হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই জান-মালের দাবিদার জুটিয়া যাইবে (আর কাহারো জান ও মাল সুরক্ষিত থাকিতে পারিবে না।) এইজন্য বিবাদীকে শপথ করার অধিকার দান করিতে হইবে।

— মুসলিম

ব্যাখ্যা ন্যায়পরায়ণ বিচার নীতির সঠিক পন্থা কি হইতে পারে, এই ছোট্ট হাদীস হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ইসলামে বিচারকের উপর কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিয়া মামলার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিবার জন্য দায়িত্ব সহকারে চেষ্টা করিয়া রায়দান করাই কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অন্যথায় বিচারের পরিবর্তে জুলুম হওয়ার আশংকা অধিক। কাজেই কোন দাবিদারের দাবি অনুসারেই রায়দান করা উচিত নহে, যতক্ষণ না তাহার দাবির যৌক্তিকতা ও সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে। এইজন্য বাদীকে বা ফরিয়াদীকে তাহার দাবি প্রমাণের জন্য উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচারকের সম্মুখে পেশ করিতে হইবে। অপরদিকে বিবাদী বা আসামীকেও তাহার নির্দোষিতা প্রমাণের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। বাদীপক্ষ উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করিতে সমর্থ না হইলে আলোচ্য হাদীসের আলোকে বিবাদী বা আসামীকে আল্লাহ্‌র নামে 'শপথ' করিয়া নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করা ও অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। বস্তুত এইরূপ বিচার-পদ্ধতিতে জুলুম বা অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে।

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ادْرَؤُا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ كَانَ لَهٗ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهٗ فَاِنَّ الْاِمَامَ اَنْ يُّخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يُّخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ - (ترمذى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন : মুসলমানদের উপর শরীয়তী দন্ডবিধান কার্যকর করা হইতে যতদূর সম্ভব দূরে থাক। অভিযুক্তের নিষ্কৃতি লাভের সামান্য মাত্র সুযোগ থাকিলেও তাহার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দাওক্ষ কেননা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে ভুল করিয়া কাহাকেও মুক্তিদান করা ভুল করিয়া কাহাকেও শাস্তিদান করা অপেক্ষা উক্ত ও কল্যাণকর। — তিরমিযী

ব্যাখ্যা অপরাধমূলক কাজ বন্ধ করিবার ব্যাপড়রে অপরাধীর মনে পরিবর্তন সাধনই হইতেছে সর্বোত্তম পন্থা। দ্বিতীয়ত, নিরপরাধীকে শাস্তি দান করা এমন একটি অপরাধ, যাহা আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়। কাজেই অপরাধ প্রমাণ হইতে যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে অভিযুক্তকে শাস্তি না দিয়া মুক্তি দান করাই ভাল। উপরন্তু অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পূর্বে কাহাকেও গ্রেফতার করা ও বিনা বিচারে আটক রাখাও এই হাদীস অনুযায়ী ইসলামসম্মত কাজ নহে। কেননা বিচারে সে যদি নির্দোষ প্রমাণিত হয় তবে সে যে শাস্তি ভোগ করিয়াছে তাহা একেবারে অনাহুত ও অকারণ হইবে। আর ইহা হইতে দূরে থাকাই ইসলামের নির্দেশ।

অভিযুক্তকে কেবল শাস্তি দান করিলেই সুবিচার কায়েম হয়— ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা কোন অকাট্য কথা নহে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে রেহাই দিয়াও শাস্তি দানের সার্থকতা লাভ করা সম্ভব। বস্তুত ইসলামের লক্ষ্য পাপের মূল উৎসকে চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া। আর কেবল দৈহিক শাস্তির দ্বারাই ইহা কখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য অপরাধীর মনের পরিবর্তন সাধনের দিকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে।

সৎ নেতৃত্বের উৎস

عَنْ يَحْيٰى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا تَكُوْنُوْنَ كَذَالِكَ يُوَ مَّرُ عَلَيْكُمْ - (مشكوة)

ইয়াহইয়া ইবনে হাশিম ইউনুস ইবনে আবূ ইসহাক হইতে, ইউনুস তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা যে ধরনের লোক হইবে তোমাদের শাসকও ঠিক সেই ধরনেরই হইবে। — মিশকাত

ব্যাখ্যা উপরিউক্ত হাদীসের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম এই যে, সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব সৃষ্টির মূল ক্ষেত্র হইতেছে জনগণ। আর নেতা ও শাসকগণ হয় সমাজের নির্যাস ও দুধ নিংড়ানো মাখনের মতো। দুধ যে প্রকারের হইবে, উহার মাখনও হইবে ঠিক সেইরূপ। কাজেই জনগণ যদি সৎ হয়, তবে তাহাদের মধ্য হইতে নেতা ও শাসক শ্রেণীর যে সব লোক বাহির হইবে, তাহারাও হইবে সৎ প্রকৃতির ও আদর্শনিষ্ঠ। আর জনগণই যদি অসৎ প্রকৃতির চরিত্রহীন ও দুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে যে সব নেতা ও শাসক বাহির হইবে তাহারা কিছুতেই সৎ ও আদর্শ চরিত্রবান হইতে পারে না।

ইসলামী সমাজের নেতা ও শাসক জনগণের মধ্য হইতেই নির্গত হয়। জনগণই তাহাদের নির্বাচক। জনগণ সৎ না হইলে তাহাদের নির্বাচিত নেতা ও শাসক কখনই সৎ হইতে পারে না। কেননা অসৎ জনগণ অসৎ নেতৃত্বই পছন্দ করিয়া থাকে। আবার অসৎ নেতারা একবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে গোটা সমাজকেই অসৎ করিয়া তুলিবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক চেষ্টা ও প্রস্তুতি চালায়।

দ্বিতীয় অর্থ এই হইতে পারে যে, সমাজের অধিকাংশ লোক যদি পাপী ও অসৎ প্রকৃতির হয়, আল্লাহ তা'আলা লানত স্বরূপ তাহাদের উপর অসৎ নেতা ও জালিম শাসকদিগকে বসাইয়া দিয়া থাকেন। কাজেই সমাজ যাহাতে কোনক্রমেই অসৎ হইতে না পারে, সেই জন্য পূর্বাহ্নেই প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যক।

অন্যায় কাজের অসহযোগিতা

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهَا قَالَتْ مَاخَيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِذَا كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - (الادب المفرد)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ রাসূলে করীম (স) কে কখনও দুইটি কাজের যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইলে তিনি উভয়ের মধ্যে সহজতর কাজকেই গ্রহণ করিতেন, অবশ্য যদি তাহা গুনাহের কাজ না হয়। কিন্তু যদি গুনাহের কাজ হয় তবে তিনি তাহা হইতে সকলের অপেক্ষা অধিক দূরে সরিয়া থাকিতেন এবং নবী করীম (স) তাঁহার নিজের কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন

নাই। কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘিত হইতে দেখিলে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হইতেন। — আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে নবী করীম (স)-এর জীবনের কর্মনীতি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্য। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত কার্যসমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজই তিনি গ্রহণ করিতেন, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার পথ তিনি গ্রহণ করিতেন না। কেবল কৃচ্ছ্রসাধনা করিতে পারিলেই— আল্লাহ্‌র নামে কেবল কষ্ট স্বীকার করিলেই— আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা হয় বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহাদের ভুল সুস্পষ্ট। বস্তুত তাহাদের এই কর্মনীতি আর যাহাই হউক, নবী চরিত্রের অনুসারী নহে; বরং উহাকে পরিষ্কার ব্রাহ্মণ্যবাদ বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে কাজ সহজ হইলেই যে তিনি তাহা করিতে উদ্যোগী হইতেন— উহাতে পাপ হয় না পূণ্য হয়, সেইদিকে লক্ষ্য দিতেন না— এমন কথাও নহে। বরং সেই সহজ কাজ করিলে যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানী হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে তাহা তিনি কিছুতেই করিতেন না।

নবী করীম (স) ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিগত হিংসা-দ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহার বশবর্তী হইয়া কোন কাজ করিতেন না। বরং প্রত্যেকটা কাজই করিতেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্য, তাহার ফরমাবরদারী করিবার জন্য। তাঁহার উপর কেহ আক্রমণ করিলে তিনি উহার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যোগী হন নাই। কেননা ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কখনো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘিত হইতে দেখিতে প্রস্তুত হন নাই। সেইরূপ হইতে দেখিলে তখনই তিনি উহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুত ইহাই হইতেছে প্রত্যেক মুমিনের জন্য আদর্শ-চরিত্র ও কর্মনীতি। সাহাবাদের চরিত্র এই আদর্শ পুরাপুরিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। হযরত আলী (রা)-এর একটি ঘটনা এই ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি এক দুর্ধর্ষ শত্রুকে ধরিতে পারিয়া কতল করিতে উদ্যত হইয়াও শুধু এইজন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, শত্রুটি তাঁহার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিয়াছিল। কেননা তখন তাহাকে হত্যা করিলে নিজেরই কোন প্রতিশোধ গ্রহণ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করা হইত— একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাহাকে হত্যা করা হইত না। আর এইরূপ কাজ কোন ঈমানদার লোকই করিতে পারে না।

عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ اَوْ اَبِىْ مَالِكَ الْاَشْعَرِىْ رض اَنَّهٗ سمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَّسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ -

আবূ আমের কিংবা আবূ মালিক আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও হইবে যাহারা যিনা-ব্যভিচার, রেশমী পোশাক ব্যবহার, মদ্যপান ও আনন্দ-স্ফূর্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হালাল মনে করিয়া লইবে।

ব্যাখ্যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে নিজের জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে নাই— এই ধরনের মুসলিমদের ইসলামদ্রোহীতা সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক করিয়া তোলার জন্য আলোচ্য হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, উম্মতের মধ্যে এমন নামধারী মুসলিমও হইবে, যাহাদের আল্লাহ্‌র শরীয়তের প্রতি ঈমান থাকিবে না। শুধু তাহাই নয়, আল্লাহ্‌র শরীয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজই তাহারা করিবে। আল্লাহ্‌র শরীয়তে যাহা হারাম ও

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, তাহাকেই তাহারা 'হালাল'— সঙ্গত ও বৈধ বলিয়া মনে করিবে এবং তাহা বন্ধ করার পরিবর্তে সমাজ ক্ষেত্রে তাহা চালু করিবে। এক কথায় আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিবে, নিজদিগকে আল্লাহ্‌র স্থানে বসাইবে।

বস্তুত ইসলামে কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করার আইন রচনা করার অধিকার চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট। মানুষের কর্তব্য আইন রচনা করা নয়; আল্লাহ্‌র রচিত আইন পালন ও জারী করা মাত্র। এমনকি রাসূলে করীম (স)-এরও কোন ব্যক্তিগত ক্ষমতা বা অধিকার নাই কোন জিনিসকে হালাল এবং কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা করার। তিনি একবার রাগান্বিত হইয়া নিজের উপর মধূ পান 'হারাম' করিয়া লইয়াছিলেন। আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে ইহার সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন ঃ (الملك -١) - يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ —হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন, তুমি তাহা নিজের জন্য হারাম করিতেছ কেন। ফলে তিনি নিজের হারাম করা জিনিস মধূপান আল্লাহ্‌র হালাল করার কারণে পুনঃ ব্যবহার করিতে শুরু করেন।

আলোচ্য হাদীসে রাসূলে করীম (স) সাবধান করিয়া দিয়া বলেন যে, আল্লাহ্‌র হারাম করা জিনিস মুসলিম নামধারী লোকেরা (নিজেদের জন্য) হালাল করিয়া লইবে, ইহা মুসলিমের কাজ নহে। ইহা সুস্পষ্টরূপে কুফরীর কাজ ও কাফিরদের উপযোগী কাজ। মুসলিম হইয়াও যাহারা এইরূপ দৃষ্টতা দেখায়, তাহাদের অপেক্ষা অমানুষ আর কেহ হইতে পারে না। তাহারা লালসার দাস, কুপ্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা ও উত্তেজনায় পড়িয়া আল্লাহ্‌র হারাম করা জিনিসকে হালাল করিতে উদ্যত হয়। ইহা এক অমার্জনীয় অপরাধ ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

কোন মুসলিম সমাজে যাহাতে আল্লাহ্‌র হারাম করা জিনিস সাধারণভাবে চালু হইতে না পারে— উহা বৈধ হওয়ার মতো মর্যাদা লাভ করিতে না পারে; পরন্তু উহা কেহ যেন প্রকাশ্যভাবে অবলম্বনও করিতে সাহসী না হয়, সেইদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেকটি মুসলিমের ব্যক্তিগত কাজ তো বটেই, এক বিরাট সামাজিক ও সামগ্রিক দায়িত্বও বটে। আলোচ্য হাদীসে রাসূলে করীম (স) তাঁহার উম্মতকে এই দিকেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

এখানে রাসূলে করীম (স) দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি হারাম জিনিসের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতেছে যিনা, ব্যভিচার, পুরুষের জন্য রেশম ব্যবহার, মদ্যপান ও গান-বাজনার যন্ত্র ইত্যাদি। এখানে অবশ্য সমস্ত হারাম জিনিসের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহার অর্থ এই নয় যে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হারাম জিনিসকে হালাল করিয়া লওয়া বুঝি অপরাধ নয়।

বরং এখানে উল্লেখিত জিনিস কয়টি তো মাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য হইতেছে যে, আল্লাহ্‌র হালাল ও হারাম করা কোন জিনিসকেই হারাম বা হালাল করার কোন অধিকার মানুষের নাই।

আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত হারাম জিনিসগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এইগুলির প্রত্যেকটি মানুষের জন্য মারাত্মক, সমাজ-শৃঙ্খলা বিধ্বংসী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী। এইগুলির প্রত্যেকটির হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া হারাম করা হইয়াছে। অতএব কেহ এইগুলিকে হালাল করিলে তাহা যে কেবল কুফরী হইবে তাহাই নয়, তাহার ফলে গোটা সমাজ এবং মানব জীবনের পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَاتَعُوْدُوْا شُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِضُوْا -
(الادب المفرد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আনাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন ঃ শরাবখোর ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে দেখিতে ও তাহার শুশ্রূষা করিতেও যাইবে না। — আল-আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যা হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা পরিষ্কার। শরাব ইসলামে একটি অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ জিনিস। যে ব্যক্তি তাহা পান করে, সে যে ঈমান শূন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু তাহাই নহে, ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহসও ক্ষমার অযোগ্য। মুসলিম সমাজের মধ্যে থাকিয়া যে ব্যক্তি ইসলামের একটি কঠোর নিষিদ্ধ জিনিসকে ব্যবহার করিয়া দৃষ্টতা দেখাইতে পারে, তাহার প্রতি কোন ঈমানদার ব্যক্তি একবিন্দু সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। কাজেই এই ধরনের লোক রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে দেখিতে যাওয়ার মতো কাজটুকুও করা যাইতে পারে না। বস্তুত পাপী ও পাপাসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ঈমানদার লোকদের কোনপ্রকার আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত নহে।

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهٗ بَلَغَهَا اَنَّ اَهْلَ بَيْتٍ فِىْ دَارِهَا كَانُوْا سُكَّانًا فِيْهَا عِنْدَ هُمْ نَرْدٌ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوْ هَا لَاُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِىْ وَاَنْكَرَتْ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ - (الادب المفرد)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাহার ঘরে যে কয়জন লোক বসবাস করিতেছে, তাহাদের নিকট শতরঞ্চ খেলার গুটি রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা যদি এইসব জুয়াখেলার সরঞ্জাম বাহিরে নিক্ষেপ না কর, তবে আমি তোমাদিগকে আমার ঘর হইতে বহিস্কার করিয়া দিব। এতদ্ব্যতীত এই ব্যাপারে তিনি সেই সব লোককে খুব বেশি শাসাইয়া দিলেন।
— আল-আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যা অন্যায় কাজ ও অন্যায়কারীর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করাই ঈমানদার লোকদের বৈশিষ্ট্য। ঈমানের প্রমাণই হইতেছে এই যে, যাহার মধ্যে তাহা আছে সে কোন অন্যায় ও পাপ কার্যকে একবিন্দু সমর্থন করিবে না এবং উহার সহিত বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ও সংশ্রবও রাখিবে না। এমনকি পাপীদের সহায়তা ও সহযোগিতা হয়— এমন কোন ব্যাপারকেও সে বরদাশত করিবে না। আর ইহাই সকল মুসলিমের বিপ্লবী চরিত্র। হযরত আয়েশা (রা)-এর উল্লেখিত কাজ এই চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম ইহারই দাবি করে প্রত্যেকটি মুমিনের চরিত্রে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ اُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَالِكَ الزَّمَنِ فَلَا يَكُوْنَنَّ لَهُمْ جَابِيًا وَلَا عَرِيْفًا وَلَا شُرْطِيًا - (المعجم الصغير)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ শেষযুগে জালিম শাসক, ফাসিক মন্ত্রী ও কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বাসঘাতক বিচারপতি এবং মিথ্যাবাদী ফকীহ্‌র প্রাদুর্ভাব হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা এই যুগ পাইবে, তাহারা যেন ঐসব লোকদের রাজস্ব সংগ্রহকারী নিযুক্ত হইতে প্রস্তুত না হয়, তাহাদের তরফ হইতে কোন মাতব্বরী কিংবা সরদারীও যেন কেহ গ্রহণ না করে এবং তাহাদের কোন সম্মানিত দায়িত্বপূর্ণ পদ দখলকারীও যেন কেহ না হয়।

ব্যাখ্যা অসৎ দুর্নীতিপরায়ণ ও বিশ্বাসঘাতক শাসকের অধীনে থাকিয়া কোন ব্যক্তিই নিজেদের ঈমান, সততা, আদর্শবাদিতা ও পূতঃচরিত্র বহাল রাখিতে পারে না। এমন কি খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিরাও যদি এইরূপ কর্তাদের হুকুমবরদারী করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহারাও নিজেদের ঈমান ও নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা চিরতরে হারাইতে বাধ্য হইবে। সেই জন্য রাসূলের এই নির্দেশ। বস্তুত কোন সমাজের উপর বর্ণিত ধরনের লোকদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য স্থাপিত হওয়া সেই সমাজ ও জাতির প্রতি একটি অভিশাপ বিশেষ। আল্লাহ্ যেন এইরূপ অভিশাপ কোন জাতির উপর চাপাইয়া না দেন। কেননা ইহার ফলে দেশের কোটি কোটি লোক কেবল লুণ্ঠিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত নিপীড়িত হয় না, সেই সঙ্গে নিজেদের ঈমানের শেষ সম্পদটুকু হারাইতে বাধ্য হয়।

হাদীসের মূল সুর এই কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র দেওয়া আইনসমূহ বাস্তবায়িত করাই হইতেছে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব।

বিচারকের জরুরী গুণাবলী

عَنْ بَرِيْدَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِىْ الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِىْ النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِىْ الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِىْ الْحُكْمِ فَهُوَ فِىْ النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى النَّاسَ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِىْ النَّارِ - (ابوداؤد، ابن ماجه)

হযরত বরীদাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তিন প্রকারের বিচারক রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজন মাত্র বেহেশতে যাইতে পারিবে। আর অপর দুইজন জাহান্নামে যাইতে বাধ্য হইবে। যে বিচারক বেহেশতে যাইবে, সে এমন ব্যক্তি, যে প্রকৃত সত্যকে জানিতে পারিয়াছে ঃ অতঃপর তদনুযায়ী বিচার ও ফয়সালা করিয়াছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানিতে পারিয়াও ফয়সালা করিবার ব্যাপারে অবিচার ও জুলুম করিয়াছে, সে জাহান্নামে যাইবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের জন্য বিচার ফয়সালা করিয়াছে, সেও জাহান্নামী হইবে। — আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসটি আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক নিজ নিজ হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হইলেও ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকেমও অনুরূপ অর্থের হাদীস স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই হাদীসটিকে 'সহীহ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

এই হাদীস হইতে বিচার বিভাগ ও বিচার কার্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী বিধান জানা যায়। যথা ঃ

১. হাদীসের বর্ণনাভঙ্গী হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, নবী করীম (স)-এর দৃষ্টিতে বিচার বিভাগের দায়িত্ব অপরিসীম এবং এই কাজের দায়িত্ব যার-তার উপর অর্পণ করা কিছুতেই সমীচীন নহে। আর সকল প্রকার বিচারকেরই পরিণাম একরূপ হইবে না।

২. বিচারকার্য অত্যন্ত গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ। ইহা কোন দুনিয়াবী ব্যাপার নহে। এই কাজ সঠিকরূপে ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করিবার উপর পরকালে বেহেশত লাভ করা না-করা নির্ভর করে। বেহেশত লাভ করা না-করা একান্তই ধর্মীয় ব্যাপার। এই কারণে বিচারকার্য ও সুষ্ঠু ইনসাফকারী বিচার-বিভাগ প্রতিষ্ঠা করাও ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জরুরী। ইহাকে দুনিয়াদারী কাজ মনে করিয়া এই বিভাগ কর্তৃক জুলুম ও না-ইনসাফী বিচার হইতে দেওয়া মোটেই দ্বীনদারী নহে।

৩. বিচার করিবার সময় বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃত হক কোন দিকে, তাহা জানিবার উপর সর্বাধিক লক্ষ্য আরোপ করিতে হইবে। কেবলমাত্র বাহ্যিক দাবি-দাওয়া, বাকপটুতা ও

প্রকৃত হক প্রমাণ করিবার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়— এমন সব সারহীন যুক্তি-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন রায় দিলে ইনসাফ না হওয়ার আশংকা বেশি। কাজেই প্রকৃত হক জানিত পারিয়া তদনুযায়ী রায় দিতে ও ফয়সালা করিতে হইবে। অতএব এই হককে জানিতে পারিয়া যে তদনুযায়ী রায় দিবে না; বরং যাহার হক নয়, তাহার পক্ষে রায় দিয়া হকদার ব্যক্তির প্রতি জুলুম করিবে, পরকালে তাহার স্থান হইবে জাহান্নামে। তৃতীয়ত, যে বিচারক হক না জানিয়াই অজ্ঞতা সহকারে রায় দিবে, তাহার পরিণামও অনুরূপ হইবে।

আল্লামা শাওকানী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

هٰذَا الْحَدِيْثُ اَعْظَمُ وَازِعٌ لِلْجَهَلَةِ عَنِ الدُّخُوْلِ فِى هٰذَ الْمَنْصَبِ الَّذِىْ يَنْتَهِىْ بِالْجَاهِلِ اِلَى النَّارِ - (نيل الاوطار ج۹، ص ۱٦٨)

এই হাদীস অজ্ঞ-মূর্খ লোকদিগকে বিচারকের পদে আসীন হওয়ার পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। কেননা জাহিল ও অবিচারক লোক এই পদের দরুন জাহান্নামে যাইতে বাধ্য হইবে।
— নাইলুল আওতার জি, ৯-পৃ. ১৬৮

আর জাহিল বিচারক কে ? জাহিল বিচারক হইতেছে সেই, যে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না, অথচ এই মূর্খতা থাকা সত্ত্বেও সে লোকদের বিচার-ফয়সালা করে।

এই কারণে বিচারককে অবশ্যই আল্লাহ্র কিতাব, তাঁহার আইন ও বিধানসমূহ এবং রাসূলের সুন্নাহ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ও উহার অধিকাংশের হাফেয হইতে হইবে।

৪. হাদীসটিতে বিচারক হিসাবে رَجُلٌ (পুরুষ) উল্লেখিত হইয়াছে এবং এই শব্দের উল্লেখ হইয়াছ পরপর তিনবার। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বিচারকদের পদে কেবলমাত্র পুরুষ লোকই নিযুক্ত হইতে পারে, কোন মহিলাকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা ইসলামী বিচার নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরদার। তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ اَمْرَ هُمْ اِمْرَأَةٌ -

যে জাতি তাহার দায়িত্বপূর্ণ কাজ কোন নারীর উপর অর্পণ করিয়াছে, সে কখনই এবং কিছুতেই কল্যাণ লাভ করিতে পারে না।

এই হাদীসাংশটি ইমাম আহমদ, বুখারী, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ ইমামগণ নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব ইহার শুদ্ধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। রাসূলে করীম (স) যখন জানিতে পারিলেন যে, পারস্যবাসিগণ কিসরা কণ্যাকে সিংহাসনে বসাইয়াছে ও তাহাকে নিজেদের 'শাসক' বানাইয়াছে, তখনই উপরিউক্ত কথাটি বলিয়াছিলেন। সামান্য মতভেদ থাকা সত্ত্বেও গোটা ইসলামী সমাজ এই সম্পর্কে একমত যে, কোন নারীকে যেমন 'ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান' বানানো যাইতে পারে না, অনুরূপভাবে কোন বিচারক পদেও নারীকে আসীন করা যাইতে পারে না। ইহার পশ্চাতে অকাট্য যুক্তি রহিয়াছে তাহা এই ঃ

اِنَّ الْقَضَاءَ يَحْتَاجُ اِلَى كَمَالِ الرَّأْىِ وَرَأْىُ الْمَرْأَةِ نَاقِصٌ -

যেহেতু বিচারকার্য অত্যন্ত নির্ভুল, নিখুঁত ও পরিপূর্ণ রায়দানের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নারী স্বভাবতই অসম্পূর্ণ রায় সম্পন্না। (নির্ভুল ও নিখুঁত রায়দান তাহার দ্বারা প্রায়ই সম্ভবপর হয় না)।

আদালতের বিচার পদ্ধতি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ رض قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْخَصْمَيْنِ يُقْعِدَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْحَاكِمِ - (احمد، ابوداؤد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (স) ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন যে, (বিচারের সময়) বিবদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসাইতে হইবে। — আহমদ, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা হাদীসটি সনদের দিক দিয়া খানিকটা দুর্বল হইলেও ইসলামের বিচার-পদ্ধতির দৃষ্টিতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, বিচারের সময় বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে বিচারকের সম্মুখে আসীন করা শরীয়তের বিশেষ ব্যবস্থা ও বসানোই কর্তব্য। ইহাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা হয়।

এই হাদীস হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাদী-বিবাদী উভয়ের প্রতি আদালতে সম্পূর্ণ সমতা রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। কোন এক পক্ষের প্রতি আসন গ্রহণ, ইশারা-ইঙ্গিত, কথোপকথন প্রভৃতি কোন একদিক দিয়াও বিন্দুমাত্র অসমতার প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে না।

ইহারই অনুরূপ অর্থপূর্ণ আরও কয়েকটি হাদীস রহিয়াছে। তাহা হইতে বিচারপদ্ধতির ব্যাপক বিবরণ জানিতে পারা যায়। নবী করীম (স) একদা হযরত আলী (রা)কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ঃ

يَاعَلِىُّ اِذَا جَلَسَ اِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الْاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْاَوَّلِ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ - (ابوداؤد، ترمذى)

হে আলী! দুই পক্ষ যখন তোমার সম্মুখে বিচারের জন্য উপবিষ্ট হইবে, তখন এক পক্ষের কথা যেমন শুনিয়াছ, অনুরূপভাবে অপর পক্ষের কথাও না শুনিয়া তুমি উভয়ের মধ্যে ফয়সালার কোন রায় প্রকাশ করিবে না। এইরূপ নিয়ম তুমি পালন করিলে তবে তোমার দ্বারা সুষ্ঠু বিচারনীতি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হইবে। — আবূ দাউদ, তিরমিযী

পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসানোর আর একটি দিক এই হাদীস হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, বাদী-বিবাদী কাহারো প্রতি যেমন অসম ব্যবহার করা যাইবে না, অনুরূপভাবে একপক্ষের কথা শুনিয়া ও অপর পক্ষের জওয়াব শ্রবণ না করিয়া কোন রায় দেওয়াও কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। বরং উভয় পক্ষের কথা সমান গুরুত্ব, মর্যাদা ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার পরই বিচারের রায় দান বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় কোন এক পক্ষের প্রতি চরম অবিচার হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

এই সব হাদীস হইতে আরো একটি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও বিবাদী উভয়ই বিচারকের সামনে বসিবার অধিকার পাইবে। বর্তমানের বিচারালয়ে যেমন আসামীকে অপরাধী সাজিয়া কাঠগড়ায় হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, ইসলামী আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সেভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে না; বরং তাহারা বসিতে পারিবে।

বস্তুত ইসলামের বিচার নীতি এমনিই সুষ্ঠু, নিখুঁত ও নির্দোষ। সকল পর্যায়ের বিচারকার্যের এই নীতি কড়াকড়িভাবে অবলম্বিত হইলে সম্ভবত দুনিয়ায় অবিচার বলিতে কিছুই থাকিত না। কিন্তু বর্তমানে দুনিয়ায় বিচারের নামে যে প্রসহন হইতেছে, তাহা গোটা মানবতাকে অবিচার-অপমানে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। ইসলাম উহার সম্পূর্ণ অবসান দাবি করে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِيْمُوا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَاْخُذُكُمْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ - (ابن ماجه)

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের উপর আল্লাহ্‌র দন্ডসমূহ কার্যকর কর। আর আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যেন কোন উৎপীড়কের উৎপীড়ন তোমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে না পারে। — ইবনে মাজাহ্‌

ব্যাখ্যা ইসলামের আইনের শাসন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আরো স্পষ্ট ভাষায়, একমাত্র ইসলামেই পুরামাত্রায় আইনের শাসন কার্যকর। এই ব্যাপারে কাহারো প্রতি যেমন পক্ষপাতিত্ব করা যাইতে পারে না, তেমনি কাহাকেও আইনের উর্ধ্বে মনে করাও যাইতে পারে না। আইনের এই শাসনে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোন পার্থক্য নাই, নাই আত্মীয়-অনাত্মীয়ের, গরীব-ধনীর ও ভদ্র-অভদ্রের কোন তারতম্য। ইহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, শাশ্বত, তীক্ষ্ণ, শানিত। আল্লাহ্‌র রাসূল এই আইনের শাসন কায়েম করিয়াছেন ইসলামী রাষ্ট্রে। আর তিনি তাঁহার উম্মতের প্রতি অনুরূপ নিরপেক্ষ আইনের শাসন কায়েম করার স্পষ্ট ও কড়া নির্দেশ দান করিয়াছেন। এই নির্দেশ কিছুতেই লংঘন করা যাইতে পারে না।

কেননা আইনের এ শাসনে প্রকৃত বাদীপক্ষ হইতেছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা। ইহা আল্লাহ্‌র হক এবং আল্লাহ্‌র হক অবশ্যই পূরণীয়। কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কিংবা বৈষয়িক দিক দিয়া কোন মারাত্মক ক্ষতিও যদি এই পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, তবুও তাহা কিছুমাত্র পরোয়া করা চলিবে না। দুনিয়ার মুমিন মুসলমানদের ইহা এক বিরাট ও বিশেষ দায়িত্ব।

বিচার ব্যবস্থায় সুপারিশের দুর্নীতি

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ

حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدُهَا - (بخارى، مسلم)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কুরায়শগণ একদা মাখজুমী বংশের এক স্ত্রীলোকের অবস্থার জন্য অত্যন্ত ভাবিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই স্ত্রীলোকটি চুরি করিয়াছিল। তাহারা পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ করিল ঃ এই স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে নবী করীম (স)-এর নিকট কে কথা বলিবে ? তাহারাই একে অপরকে বলিল ঃ রাসূলের প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়দ ভিন্ন আর কে কথা বলার সাহস করিতে পারে ?— উসামা তাঁহার নিকট জরুরী কথা পেশ করিলেন। শুনিয়া রাসূলে করীম (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র অনুশাসন কার্যকরী করার ব্যাপার তুমি সুপারিশের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ ? অতঃপর তিনি উঠিলেন ও জনতাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোক শুধু এই জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কোন ভদ্র বা অভিজাত বংশীয় লোক চুরি করিলে তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিত। কিন্তু যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করিত তবে তাহার উপর অনুশাসন কার্যকর করিত। আল্লাহ্‌র শপথ, মুহাম্মাদ তনয়া ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে তাহার হাতও কর্তিত হইবে। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ইসলামী আইনে চুরির শাস্তি হাতকাটা। কুরায়শ গোত্রের প্রসিদ্ধ মাখজুম বংশীয় ফাতিমা বিনতুল আসওয়াদ নামে একজন স্ত্রীলোক চুরি করিয়াছিল। এই চুরির শাস্তিস্বরূপ তাহার হাত কাটা যাইবে, ইহা সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু এই অভিজাত বংশীয় মেয়েলোকটির হাত কাটা যাওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর অপমানকর ব্যাপার মনে করিয়া কুরায়শ বংশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে, এই শাস্তি যাহাতে কার্যকর না হয় সেইজন্য রাসূলের প্রিয় ব্যক্তি উসামা ইবনে যায়দ তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবেন। উসামা তাহা করিলে রাসূলে করীম (স) অসন্তুষ্ট হইলেন এবং আল্লাহ্‌র আইন কার্যকর করার পথে সুপারিশের বাধা সৃষ্টি করা যে একটি দুর্নীতি তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন।

শুধু এতটুকু করিয়াই রাসূলে করীম (স) ক্ষান্ত হইলেন না, বরং তিনি মনে করিলেন যে, জাহিলী যুগের এই দুর্নীতি আল্লাহ্‌র অনুশাসনের আভিজাত্যবোধ ও ছোট-বড়োর পার্থক্যকরণ মুসলমানদের মধ্যে আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। এই মারাত্মক রোগ হইতে এই জাতিকে মুক্ত না করিতে পারিলে তাহা ভয়াবহ পরিণতির কারণ হইবে। তাই তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী লোকদের একত্র করিলেন এবং ইতিহাস বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, অবিচার আত্মীয়প্রীতি, বিচারের পক্ষপাতিত্ব ও আল্লাহ্‌র অনুশাসনে দুর্নীতির প্রশ্রয় দানই ছিল তাহাদের ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ। তিনি বলিলেন ঃ এই মারাত্মক দুর্নীতি জাহিলী যুগে চলিয়াছে বটে; কিন্তু ইসলামী ইনসাফের ক্ষেত্রে ইহা আদৌ চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া তিনি বলিলেন ঃ আজ তোমরা ফাতিমা বিনতে আসওয়াদের হাত কাটা বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করিতে উদ্যত হইয়াছ, আমি ঘোষণা করিতেছি ঃ ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও যদি চুরি করে তবে তাহার

হাতকাটা কিছুতেই বন্ধ করা হইবে না। কেননা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এই দুই ফাতিমার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আশরাফ-আতরাফ, ধনী-গরীব ও উচ্চ নীচের মধ্যেও তেমনি কোন পার্থক্য করা যাইতে পারে না। বস্তুত ইসলাম এক নিরপেক্ষ সুবিচার ব্যবস্থা উপস্থাপিত করিয়াছে। মানব রচিত আইনে নিরপেক্ষ সুবিচার হওয়া সম্ভব নয়। উহাতে কোন দুর্নীতি বিরোধী অনুশাসন থাকিলেও কেবল চুনোপুটিরাই তাহাতে ধরা পড়ে, বড় বড় রুই-কাতলারা চিরদিনই অথৈ জলে ডুবিয়া বেড়াইতে পারে।

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের গুনাহ

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رض قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْقَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -
(بخارى، مسلم)

হযরত আবূ বাকরাতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমরা এক দিন রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে সবচেয়ে বড় (কবীরা) গুনাহ সম্পর্কে জানাইব না ? এই কথাটি তিন তিনবার বলিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ তাহা হইতেছে আল্লাহ্র সহিত শির্ক করা, পিতামাতার সহিত অসৎ ব্যবহার করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান অথবা মিথ্যা কথা বলা। নবী করিম (স) এই সময় পিছনে ঠেক লাগাইয়া বসিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং এই কথাটি বারবার বলিতে লাগিলেন। হযরত আবূ বাকরাতা বলেন ঃ আমি তখন মনে মনে বলিতেছিলাম যে, রাসূল যদি থামিয়া যাইতেন তবে কতই না ভাল হইত।

— বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে তিনটি প্রধান ও সবচেয়ে বড় গুনাহের উল্লেখ করা হইয়াছে। গুনাহ তিনটি হইতেছে ঃ আল্লাহ্র সহিত শিরক করা, পিতামাতার সহিত অসঙ্গত ব্যবহার করা— তাঁহাদের হক আদায় না করা ও তাঁহাদের সহিত খারাপ ব্যবহার করা, কষ্টদান করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা কিংবা মিথ্যা কথা বলা। তৃতীয় কথাটি দুই রকম বলার কারণ এই যে, নবী করীম (স) এই দুইটির মধ্যে ঠিক কোন্ শব্দটি বলিয়াছেন, সেই সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূ বাকরাতা (যাঁহার আসল নাম নুফাই ইবনুল হারিস) সন্দেহ পোষণ করিতেছেন। অর্থাৎ রাসূলে করীম (স) হয় বলিয়াছেন 'মিথ্যা সাক্ষদান' কিংবা বলিয়াছেন 'মিথ্যা কথা বলা'।

হাদীসের প্রতিপাদ্য এই কারণে অতিশয় বলিষ্ঠ যে, প্রথমে রাসূলে করীম (স) কথাটি বলার জন্য তিনবার উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ঃ "আমি কি তোমাদের সাবধান করিব না", "আমি কি তোমাদের জানাইব না।" ইহা দ্বারা তিনি শ্রোতাদের বক্তব্য শুনিবার জন্য মনেপ্রাণে উন্মুখ করিয়া তুলিলেন এবং বুঝাইয়ে দিলেন যে, যে কথাটি অতঃপর বলা হইবে তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, রাসূলে করীম (স) শুরুতে পিছনে ঠেক লাগানো অবস্থায় বসিয়া কথাটি বলিতেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সোজা হইয়া বসিয়া উহা বারবার বলিতে থাকেন।

আলোচ্য হাদীসের শেষোক্ত কথাটিই এখানে আমাদের প্রধানত আলোচ্য বিষয়। মিথ্যা সাক্ষ্যদান বা মিথ্যা কথা বলা ইসলামের দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহের শামিল। কেবল হাদীসেই নয়, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেও মিথ্যা কথা ও শির্ককে একই পর্যায়ে রাখা হইয়াছে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ-
(الحج - ٣٠)

অতএব তোমরা মূর্তিপূজার নাপাকী পরিহার কর এবং তোমরা মিথ্যা কথা বলা আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ ও একমুখী হওয়া অবস্থায় এক আল্লাহ্‌র সহিত কোন প্রকার শির্ক না করা অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর।

মিথ্যা সাক্ষ্যদান যে কবীরা গুনাহ, তাহাতে মুসলিম মিল্লাতে কোন দ্বিমত নাই। অবশ্য সাক্ষ্য দান ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা কিরূপ গুনাহ এ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে অর্থাৎ কেহ কবীরা গুনাহ বলিয়াছেন আর কেহ বলিয়াছেন সগীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহ যাহারা বলিয়াছেন, তাঁহাদের দলিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কিতাবে মিথ্যা কথা বলাকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের কাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন আর তাহারা হইতেছে কাফির ও মুনাফিক। অতএব যে লোক মিথ্যা কথা বলে সে হয় কাফির, না হয় মুনাফিক। আর এইসব লোক নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী। এই পর্যায়ে নবী করীম (স)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَانَّهُ يَهْدِيْ الَى الْبِرِّ وَانَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ الَى الْجَنَّةِ -

তোমরা অবশ্যই সত্য কথা বলিবে, কেননা সত্য মানুষকে পূণ্যের দিকে পরিচালিত করে। আর পূণ্য মানুষকে জান্নাতের দিকে লইয়া যায়।

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَايَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَانَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ الَى الْفُجُوْرِ وَانَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ الَى النَّارِ -

তোমরা অবশ্যই মিথ্যা হইতে দূরে থাকিবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপ ও নাফরমানীর কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ ও নাফারমানী মানুষকে জাহান্নামে লইয়া যায়।

এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমামগণ সর্বসম্মতভাবে বলিয়াছেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদান সম্পূর্ণ কুফরীর ন্যায় কাজ এবং মিথ্যাবাদী সাক্ষ্যও আদালতে গ্রহণ করা যাইবে না।

বস্তুত মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ না করা অকাট্য যুক্তিসঙ্গত নীতি। কেননা ইহার ফলে সাক্ষ্যের মূল বাহনটাই বিপর্যস্ত হইয়া যায়। অন্ধের নিকট হইতে যেমন চন্দ্র দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না এবং বধিরের যেমন সাক্ষ্যও লওয়া যায় না কাহারো কোন কথা বলা না বলা সম্পর্কে। কেননা অন্ধ দেখিতে পারে না ও বধির শুনিতে পারে না। ঠিক তেমনি মিথ্যাবাদী ব্যক্তির কোন সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা তাহার জিহ্বা— বাকশক্তি— এক অক্ষম অঙ্গ। বরং তাহার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদী ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন একটি চিহ্ন

করিয়া দিবেন, আর সে চিহ্ন হইতেছে سَوْدُوْ جُوْهُهُمْ — "তাঁহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে।" ইহা মিথ্যার তীব্র প্রভাবে সঙ্ঘটিত হইবে।

সাতটি বড় গুনাহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَكَبَّ فَاَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِىْ لَا يَدْرِىْ عَلٰى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ وَفِىْ وَجْهِهٖ الْبُشْرٰى فَكَانَتْ اَحَبَّ اِلَيْنَا مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ قَالَ مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّىْ الصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكٰوةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرِ السَّبْعَ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ لَهٗ اُدْخُلْ بِسَلَامٍ - (نسائى- ابن ماجه)

হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা দুইজনই বলিয়াছেন যে, নবী করীম (স) একদা খুতবা দান প্রসঙ্গে বলেন ঃ যে আল্লাহ্র মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ নিবদ্ধ তাঁহার শপথ, সেই আল্লাহ্র শপথ যাঁহার দৃঢ় মুষ্টিতে আমার প্রাণ বন্দী, "সেই আল্লাহ্র কসম যাহার মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ বন্দী" এই বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন এবং তাহার পর তিনি মস্তক নিচু করিয়া কাঁদিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া মজলিসের সকল লোকই মাথা নিচু করিয়া কাঁদিতে থাকেন। ইহার পর নবী করীম (স) মস্তক উঠাইলেন। তখন তাঁহার মুখমন্ডলে অপূর্ব খুশী ও স্মিত হাস্য দেখা গেল। আমাদের নিকট ইহা দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় জিনিস ছিল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ যে ব্যক্তিই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে, রমযান মাসের রোযা রাখিবে, যাকাত দিবে এবং সাতটি বড় গুনাহ হইতে দূরে থাকিবে, তাহার জন্য বেহেশতের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে এবং কিয়ামতের দিন তাহাকে বলা হইবে যে, নিশ্চিন্তে ও পূর্ণনিরাপত্তা সহকারে ইহাতে প্রবেশ কর। — নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ - (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সাতটি ধ্বংসকারী কাজ হইতে দূরে থাক। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, সেই সাতটি কাজ কি কি ? উত্তরে তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ আল্লাহ্র সহিত শিরক করা, যাদুগিরি করা, এমন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অকারণ হত্যা করা যাহাকে কতল করাকে

আল্লাহ হারাম করিয়া দিয়াছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা ও পবিত্র স্বভাবা অসতর্ক নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন। — বুখারী

ব্যাখ্যা হাদীস দুইটিতে মুমিন লোকদের কয়েকটি অস্তিবাচক গুণ এবং কয়েকটি নেতিবাচক গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য কথায়, মুমিন লোকের মধ্যে কি কি গুণ থাকা একান্তই আবশ্যক আর কি কি দোষ না থাকা চাই এবং কি কি কাজ তাহার আদৌ করা উচিত নহে, তাহা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা গণিয়া বলার মতো কয়েকটি জিনিস নহে; বরং ইহা ঈমানদার লোকদের কয়েকটি সুস্পষ্ট দিক। ইহার মারফতে তাহার জীবনের পূর্ণ চিত্র উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহা একটি বিরাট মূল সত্যকে বিস্তারিতরূপে অভিব্যক্ত করে। কোন লোকের মধ্যে ঈমানের পবিত্র ভাবধারার সৃষ্টি হইলে তাহার জীবনের প্রত্যেকটি মূহূর্ত ও প্রত্যেকটি পদক্ষেপ দ্বারাই অনিবার্যরূপে তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অস্তিবাচক গুণগুলি এইঃ ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। অন্য কথায় দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহ্র সম্মুখে মস্তক নত করিয়া আল্লাহ্র স্মরণে অতিবাহিত করা। তাঁহার সমীপে নিজেদের মনের কামনা-বাসনা পেশ করিয়া দো'আ প্রার্থনা করিতে থাকা, নিজেদের কঠিন ব্যস্ততা ও আকর্ষণ আগ্রহের কাজ ত্যাগ করিয়া বারবার আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়া। বস্তুত দিনে রাত্রে পাঁচবার নামায পড়ার ফলশ্রুতি ইহাই।

২. রমযান মাসে রোযা পালন করা— আল্লাহ্র হুকুম চূড়ান্তভাবে নিজেদের উপর আরোপ করাই ইহার মৌলিক ভাবধারা। এমনকি আল্লাহ্র নিকট হইতে কখনও নিজেদের নিম্নতম প্রয়োজনও পরিত্যাগ করার দাবি উত্থাপিত হইলে তাহা পালনে পশ্চাদপদ না হওয়া। রোযা মানুষের মধ্যে ঠিক এই ভাবধারাই জাগ্রত করে।

৩. যাকাত দান করা। অন্য কথায়, মানুষ তাহার ধন-সম্পদের উপর আল্লাহ্র হক স্বীকার ও প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাহার কথামত যাবতীয় ধন-মালকে সম্পূর্ণরূপে নিজেরই উপার্জিত মনে না করিয়া বরং আল্লাহ-প্রদত্ত বলিয়া মনে করিবে ও আল্লাহ্র মর্জি অনুযায়ী তাহার ব্যয়-ব্যবহার করিবে। যাকাতের মূল কথা ইহাই।

উল্লেখিত তিনটি হইতেছে মুমিন বান্দাদের অস্তিবাচক গুণ। ইহা কার্যকরভাবে মুমিনের মধ্যে বর্তমান থাকা একান্তই আবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত সাতটি কাজ হইতে ঈমানদার লোকদিগকে অবশ্যম্ভাবীরূপে দূরে থাকিতে হইবে। অন্য কথায়, সাতটি নেতিবাচক গুণ মুমিনের মধ্যে অবশ্যই বর্তমান থাকিতে হইবে।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, এই তিনটি অস্তিবাচক ও সাতটি নেতিবাচক গুণ এই উভয় শ্রেণীর গুণাবলীর সবকিছু নয়। ইহা প্রধান প্রধান কয়েকটি জিনিস মাত্র। সাতটি নেতিবাচক কাজের বিশ্লেষণ নিম্নে করা যাইতেছে ঃ

১. আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করা যাইবে না। অন্য কথায় ইহার অর্থ এই যে, এই ভূমণ্ডলে আল্লাহ ছাড়া আর যাহা কিছু আছে তাহার মর্যাদা ঠিক তাহাই যাহা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শিরক আল্লাহ্র সৃষ্ট জিনিসকে এমন মর্যাদা দান করে যাহা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই হইতে পারে, অন্য কাহারও জন্য নয়।

২. যাদুকার্য পরিহার অর্থাৎ নিজেকে কোন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা এবং যে কাজ সাধারণ মানুষের অসাধ্য তাহা সে করিতে পারে বলিয়া জাহির করা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেননা ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও একেবারেই ভিত্তিহীন ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩. যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ্‌র শরীয়তে হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে অকারণে হত্যা না করা অর্থাৎ মানুষের সাথে আল্লাহ্ যেরূপ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহার সাথে সেইরূপ ব্যবহার করা— অন্যায়ভাবে ও অকারণে কোন প্রাণী হত্যা করা, লোকদের উপর অবাঞ্ছিত জোর-জুলুম করা প্রভৃতি মানুষের প্রতি অত্যন্ত নির্মম নিকৃষ্টতম ব্যবহার। ইহা ত্যাগ করিতে হইবে।

৪. সুদ না খাওয়া অর্থাৎ জীবিকার্জনের জন্য স্বার্থপরতা ও লুটতরাজের পন্থা অবলম্বন না করা এবং তাহার পরিবর্তে জায়েয পন্থায় রোজগার করা। সুদ হইতেছে স্বার্থপরতা ও লুণ্ঠনমূলক উপায়ে অর্থোপার্জনের নিকৃষ্টতম পন্থা। ইহা কোন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার পরিণাম চরম নৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই হয় না।

৫. ইয়াতীমের মাল ভোগ না করা। অন্য কথায়, সমাজের দুর্বল লোকদের সহিত স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার করা। তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে লুণ্ঠন করা— ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। বস্তুত ইয়াতীম হইতেছে সমাজের দুর্বলতম ব্যক্তি। তাহার হক নষ্ট করা নিকৃষ্টতম পাপ।

৬. জিহাদের ময়দান হইতে পালায়ন না করা। আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য কুরবানী দেওয়ার প্রয়াজন দেখা দিলে তাহা হইতে পশ্চাদপদ না হওয়া— পলায়ন না করা। ইহা ঈমানদার ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা জিহাদের ক্ষেত্রে ঈমানদার লোকদের অগ্নি-পরীক্ষার সংকটপূর্ণ মুহূর্ত। এই মুহূর্তে আত্মদানে ব্যর্থ হইলে সেই ব্যর্থতা চিরদিনের।

৭. সতী-সাধ্বী ঈমানদার মহিলার উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করা। অপরকে লাঞ্ছিত করার ইহা নিকৃষ্টতম উপায়। ইহা যে করিবে তাহার অপরাধও সাংঘাতিক হইবে। সে মহিলা হয়ত জানিতেও পারে না যে, তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও জঘন্যতম অভিযোগ আনা হইয়াছে।

খোলাসা

আলোচিত হাদীসদ্বয় হইতে ঈমানদার লোকের যে ছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহা এক সঙ্গে বলিতে গেলে নিম্নলিখিত রূপ দাড়ায় ঃ

ঈমানদার লোক আল্লাহ্‌কে প্রত্যেকটি মুহূর্ত স্মরণ করে, তাঁহারই সম্মুখে মাথা নত করে, আল্লাহ্‌র বিধান যথাযথরূপে পালন করে। তাঁহার জন্য শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইলে তাহা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সে তাহার প্রত্যেকটি জিনিসের উপর আল্লাহ্‌র অধিকার স্বীকার করে এবং তাঁহার মর্জি অনুযায়ী তাহা ব্যয়-ব্যবহার করে। সেই সঙ্গে সে দুনিয়ার কোন একটি জিনিসকেও সেই মর্যাদা দান করে না, যাহা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই শোভনীয়। সে কখনও ফাঁকিবাজী বা ধোঁকাবাজী করে না। নিজে যাহা নয় তাহা সাজিয়া

প্রকৃতপক্ষে নিজের যে ক্ষমতা নাই সেই ক্ষমতার কথা প্রচার করিয়া লোকদের নিকট হইতে অর্থ লুটিয়া নেয় না। মানুষের প্রতি সে সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মানুষের প্রাণ অন্যায়-অকারণে সে সংহার করে না, কাহাকেও হত্যা করে না, কাহাকেও বিনা কারণে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেয় না। সে সুদ খায় না। অবৈধ উপায়ে অর্থ লুটে না, অন্য মানুষের রক্ত শুষিয়া নেয় না। সমাজের মধ্যে দুর্বলতম ব্যক্তিদের ধন-সম্পদ তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া কখনো লুটিয়া লয় না। আল্লাহ্‌র ডাক যখনই যে-কাজের জন্য আসে তখনই সে নিজেকে তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে ও সেই কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িতে একবিন্দু কুণ্ঠিত হয় না। সে কখনো বাতিল, কাফির ও ইসলামের দুশমন লোকদের সহিত মুকাবিলা করিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না। সম্মুখ সমরে জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করিতেও একবিন্দু কুণ্ঠিত হয় না। ব্যক্তি-স্বার্থের জন্য অপর লোকের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা তাহার স্বভাব নয়। কাহারো উপর যিনা-ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করার মতো ঘৃণ্য কাজও সে কখনো করে না।

বস্তুত এই গুণ-সিফাত এক সঙ্গে যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে, আল্লাহ্‌র রাসূল তাহার জন্য এই সুসংবাদ দান করিয়াছেন যে, এই ধরনের লোকদের জন্যই বেহেশতের দ্বারই উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে নিশ্চিন্তে ও নির্ভীক মনে তাহাতে প্রবেশ করার জন্য সাদর আহ্বান জানাইবেন।

ইসলামী তমদ্দুনের গোড়ার কথা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ عِلْمًا فِيْهِ سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ وَمَنْ بَطَّاَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তির কোন পার্থিব দুঃখ দূর করিয়া দিবে। আল্লাহ তাহার কিয়ামতের দিনের যে কোন দুঃখ অবশ্যই দূর করিয়া দিবেন। কোন মানুষের সংকট যে সহজ করিয়া দিবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার যাবতীয় সংকট সহজ করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের লজ্জাস্থান আবৃত রাখিবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার সমস্ত দোষত্রুটি গোপন রাখিবেন। বস্তুত মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার কোন ভাইয়ের

সাহায্যের কাজে লিপ্ত থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সাহায্যকারী থাকেন। যে ব্যক্তি পথ চলে কোন জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার পথ তাহার জন্য সুগম করিয়া দিবেন। বহুলোক যখন আল্লাহ্‌র কোন ঘরে একত্রিত হইয়া আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং পরস্পরে মিলিতভাবে উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন তাহাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ্‌র রহমত তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া লয়, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখেন। আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে তাঁহার নিকটবর্তীদের সহিত আলোচনা করেন। কিন্তু যাহার আমল অনগ্রসর হইবে তাহার বংশ তাহাকে দ্রুততর করিবে না। — মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি উহার আলোচ্য বিষয়সমূহের গুরুত্বের দিক দিয়া অত্যন্ত সারগর্ভ ও ইসলামী তমদ্দুনের দৃষ্টিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের একটি অন্যতম প্রাথমিক ভাবধারা হইতেছে সামাজিক জীবন ও মানবতার প্রতি মমত্ববোধ। মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। একত্রে বসবাসকারী মানুষদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, দয়া, অনুগ্রহ, স্নেহ-ভালোবাসা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। পরস্পরের প্রতি এই মমত্ববোধের বাস্তব প্রকাশ ঘটে তখন, যখন একজনের দুঃখে অপরজন দুঃখিত হয়, একজনের দুঃখ মোচনের জন্য অপরজন পূর্ণ উদ্যম সহকারে অগ্রসর হইয়া আসে। শুধু তাহাই নয়, এইভাবে মানুষের বৈষয়কি জীবনও হয় সুখী ও সমৃদ্ধিপূর্ণ। বস্তুত ইহাই হইতেছে মনুষ্যত্বের অপরিহার্য গুণ। এই গুণ যে মুহূর্তে মানুষ হারাইয়া ফেলে, ঠিক তখনই মনুষ্যত্বের মহান মর্যাদা হইতে তাহার বিচ্যুতি ও পতনে ঘটে। এই গুণ যাহাতে সতত মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে, মানুষ যাহাতে প্রত্যেকটি মুহূর্ত অন্যের জন্য সক্রিয় ও সজাগ হইয়া থাকে। সেইজন্যই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তিই অপরের কোন দুঃখ মোচন করিবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাহার দুঃখ ও বিপদ লাঘব করিবেন। এই পন্থায় প্রত্যেকটি মানুষ পরকালীন কঠিন বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ পাইতে পারে। আর পরকাল যেহেতু ইসলামী বিশ্বাসের একটি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ স্তম্ভ, অতএব পরকালীন মুক্তির জন্য সকলকে উৎসাহ দানের চেষ্টা করা হইয়াছে; যেন মানুষ কোন একটি মুহূর্তও পরকালীন মুক্তি লাভের উপায়স্বরূপ মানবতার খিদমতের কাজ হইতে গাফিল হইয়া না যায়।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ কোন সংকটাপন্ন মানুষের সংকটকে যে সহজ করিয়া দিবে, আল্লাহ তাহার ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সংকটশূন্য করিয়া দিবেন এবং বলা হইয়াছে, কোন মুসলিমের লজ্জাস্থানকে যে আবৃত করিয়া রাখিবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিবেন। হাদীসের বর্ণিত বিপদ হইতে উদ্ধার করা, সংকট দূর করার ও লজ্জাস্থান আবৃত রাখা। এই তিনটি কথার মূল একই এবং তাহা হইতেছে মানবতার প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববোধ। 'লজ্জাস্থান আবৃত' করার অর্থ সাধারণ দৃষ্টিতে এই যে, কেহ যদি তাহার দেহের এমন স্থান— যাহা আবৃত করিয়া রাখারই নির্দেশ রহিয়াছে— উলঙ্গ করিয়া রাখ, তবে অপর যে ব্যক্তি উহা টের পাইবে তাহার কর্তব্য হইবে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া। কিন্তু ইহার ব্যাপক অর্থ এই যে, কেহ যদি কোন লোকের গোপন ত্রুটি, পাপ বা লজ্জাকর কাজের খবর পায়, তখন তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া ও তাহাকে লাঞ্ছিত করা কিছুতেই উচিত নহে। বস্তুত মানুষ নিষ্পাপ, নির্দোষ ও ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে না। এমতাবস্থায় তাহার প্রতি মমত্ববোধের অনিবার্য দাবি হইতেছে, কাহারো এই ধরনের ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হইলে তাহা প্রচার না করিয়া গোপন করা এবং গোপনে তাহাকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করা।

কেননা পরের দোষ প্রকাশ করিয়া দেওয়া ও পরের লজ্জাকর কাজের কথা মুখে গাহিয়া বেড়ানোর ফলে লোকদের পরস্পরের মধ্যে চরম হীনমন্যতা ও বিদ্বেষভাব জাগ্রত হয়। ইহাতে মানুষের সমাজ জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়।

ইহার পরবর্তী বাক্যে একটি মূল নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের সাহায্য কাজে লিপ্ত থাকিবে আল্লাহও ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সাহায্যকারী থাকিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করিতে হইলে তাহার উপায় হইতেছে অপরের সাহায্য করা। এখানে 'ভাই' শব্দ দ্বারা এই কথাই বুঝানা হইয়াছে যে, মানুষ পরস্পরের ভাই। আর ভাইয়ের পক্ষে ভাইয়ের সাহায্য করা, দুঃখে দুঃখিত হওয়া, তাহার অপরাধ লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামের প্রতিটি নীতির মধ্যেই দুইটি দিক রহিয়াছে ঃ একটি উহার আধ্যাত্মিক দিক আর অপরটি বাহ্যিক ও বৈষয়িক। অন্যকথায়, একটি স্বয়ং আল্লাহ্‌র সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অপরটি দুনিয়ার মানুষের সহিত জড়িত। আর প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইতেছে ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য হাদীসের আলোচিত অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসের শেষভাগে জ্ঞান অর্জন ও বিদ্যালাভের গুরুত্ব ও মাহাত্ম বুঝানো হইয়াছে। প্রথম বলা হইয়াছে ঃ জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথ অতিক্রম করিলে সেই পথে চলা সহজ করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ জান্নাত পাওয়ার জন্য যে ঈমান ও কাজ অপরিহার্য, তাহা একমাত্র জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই লাভ হইতে পারে। কোন্ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে লাভ হইতে পারে। কোন জ্ঞান ?..... যে জ্ঞান দ্বারা পরকালে শান্তিদায়ক কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়; সেইদিকে ঈমান ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই ঈমান ও কাজের প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যেই যদি কেহ বিদ্যালাভের জন্য চেষ্টা করে তবে বেহেশত লাভের পথ চলা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া যায়। কেননা বিদ্যা অর্জন না করিলে, বেহেশত লাভ করা যায় যে সব কাজ করিলে, তাহা সে কিছুতেই করিতে পারে না— করেও না।

ইহার পর আল্লাহ্‌র কিতাব অধ্যয়নের গুরুত্ব এবং উহার পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ আল্লাহ্‌র কোন ঘরে কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া যদি আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে ও পরস্পরকে শিক্ষাদান করে, তবে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র রহমত গ্রাস করিয়া লয়, ফেরেশতাগণ সম্মানার্থে ঘিরিয়া ধরেন।

বস্তুত জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বর্ণনা করার পরই আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করার কথা বলায় ইহা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, প্রকৃত জ্ঞান ও জান্নাত প্রাপ্তির বিদ্যা আল্লাহ্‌র কুরআন মজীদেই নিহিত রহিয়াছে।

কুরআন মজীদ পাঠ করার পদ্ধতি বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, ইহা সমষ্টিগতভাবে কোন মসজিদ ঘরে বসিয়া পড়িতে হইবে। আর শুধু তিলাওয়াত বা সাধারণ পাঠই যথেষ্ট নয়। উহার দারস বা শিক্ষাদান করাও অপরিহার্য অর্থাৎ একজন উহা পড়িবে, উহার দারস দিবে, উহার পাঠ শিক্ষা দিবে, উহার অর্থ, ভাব, তাৎপর্য বুঝাইয়া দিবে, উহা নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য, বক্তব্য, ভাষণ এবং আদেশ-নিষেধমূলক আইন ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইবে; আর অন্যান্য লোকেরা তাহা শুনিবে, হৃদয়ঙ্গম করিবে ও তদনুযায়ী কাজ করিবে। বস্তুত ইহা করিলেই কুরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হয় বলিয়া তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়। আর আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রতি এতই সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহারা তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখেন। সর্বোপরি, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এই সব কিছু বলিবার পর শেষভাগে ছোট একটি বাক্য উল্লেখিত হইয়াছে। তাহতে বলা হইয়াছে ঃ যাহার আমল অনগ্রসর হইবে, তাহার বংশও তাহাকে দ্রুততর করিবে না। অর্থাৎ কুরআনের শুধু ইলম হাসিল করাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে তদনুযায়ী আমল করাও একান্তই অপরিহার্য। বস্তুত কুরআন শুধু পাঠ করার কিছু না কিছু গুরুত্ব আছে বটে; কিন্তু তাহা মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। উল্লেখযোগ্য হইবে তখন, যখন তদনুযায়ী আমল করা হইবে।

জনমতের মূল্য

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ مَرُّوْابِجَنَازَةٍ فَاَثْنُوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِأُخْرٰى فَاَثْنُوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ رض مَاوَجَبَتْ فَقَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَ جَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهُ فِيْ الْاَرْضِ – (بخارى، مسلم)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের একটি দল একটি জানাযার লাশের নিকট হইতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা উহাকে প্রশংসা সহকারে স্মরণ করিলেন। নবী করীম (স) (ইহা শুনিয়া) বলিলেন ঃ 'ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।' অতঃপর তাঁহারা যখন অপর এক জানাযার লাশের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা উহাকে খারাপভাবে বরণ করিলেন। নবী করীম (স) (ইহা শ্রবণ করিয়া) বলিলেন, 'অপরিহার্য হইয়াছে।' হযরত উমর ফারুক (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'কি ওয়াজিব হইয়াছে, কি অপরিহার্য হইয়াছে?' উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেন ঃ 'তোমরা যাহাকে প্রশংসা সহকারে স্মরণ করিলে, তাঁহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। আর যাহাকে খারাপভাবে স্মরণ করিয়াছ তাহার জন্য দোযখ ওয়াজিব হইয়াছে। কেননা তোমরা দুনিয়ায় আল্লাহ্র সাক্ষীদাতা।' — বুখারী মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, দুনিয়ার জীবন যাহার যেরূপ হইবে, যে ব্যক্তির যেরূপ চরিত্র ও জীবনধারা হইবে, জনসমাজে সে ঠিক সেই ভাবেই পরিচিত হইবে। যে বস্তুতই সৎ ও ভাল তাহার সততা ও ভাল হওয়া সাধারণত গোপন থাকে না। উহার ব্যাপক প্রচার ও চর্চা হওয়াই মানব সমাজের নিয়ম। পক্ষান্তরে যে প্রকৃতই ভাল নয়— চরিত্রহীন, অসৎ, তাহার এই আভ্যন্তরীণ রূপ বহিঃপ্রকাশ না পাইয়া পারে না। বাহিরে সে যতই সততা দেখাইয়া ও ভাল মানুষ হইয়া চলুক না কেন, সে নিজের আসল রূপটাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। তাহা জনগণের মধ্যে প্রচার হইবেই এবং সেই অনুসারে তাহার ব্যাপক চর্চাও স্বাভাবিকভাবেই হইবে। বিশেষত এই ব্যাপারে আদর্শ ইসলামী সমাজের জনগণের রায় আল্লাহ্র নিকটও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ হইয়া পড়ে। বরং একটি লোকের ভালমন্দ হওয়া বেহেশতী বা দোযখী হওয়ার তাহাই হয় নির্ভরযোগ্য মানদন্ড। কেননা ইসলামী সমাজের মুসলিমগণ হইতেছেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্র সাক্ষী। যাহা সত্য তাহাকে তাঁহারা সত্য বলিয়াই প্রচার করিবেন। আর যাহা মিথ্যা যাহা বাতিল— তাহাকে মিথ্যা ও বাতিল বলিয়াই তাঁহারা প্রচার

করিবেন— ইহাই স্বাভাবিক । সুতরাং ভাল-মন্দ ও বেহেশতী-দোযখী নির্ধারণে তাহাদের নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও যুক্তিভিত্তিক রায়ের বিশেষ দখল থাকা স্বাভাবিক। লোকের বাস্তব জীবনধারার একটি প্রতিফলন সমাজে হইবেই এবং সেই অনুসারে তাহাদের মনে প্রতিক্রিয়াও অবশ্যই দেখা দিবে। এইজন্য প্রখ্যাত আরবী উক্তি হইতেছে ঃ

اَلْسِنَةُ الْخَلْقِ اَقْلَامُ الْحَقِّ

জনগণের মুখের জিহ্বাই শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র লেখনী হইয়া যায়।

এখানে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে।

বস্তুত এই হাদীসকে ভিত্তি করিয়া দুনিয়ার লোকদের যাচাই করিলেও মানুষ চিনিতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বিশেষত যে সব লোক কোন দিক দিয়া কোন পর্যায়ে কোন মহল্লা, গ্রাম, দেশ ও রাজ্যের কিছু মাত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে তো ঈমানদার লোকদের মনোভাব ও ভাবাবেগ অত্যন্ত সুষ্ঠু ও নির্ভুল হইবে। কেননা তাহাদের যিন্দেগী মোটামুটিভাবে কাহারো দৃষ্টির অগোচরে থাকে না; বরং সমস্ত মানুষের সম্মুখেই তাহা সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِىَ اللّٰهُ وَاَحَبَّنِىَ النَّاسُ قَالَ اُزْهُدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَازْهُدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ - (ترمذى، ابن ماجه)

হযরত সহল ইবনে সা'য়াদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ আমাকে এমন একটি আমল বলিয়া দিন, যাহা করিলে আল্লাহ ও জনগণ উভয়ই আমাকে পছন্দ করিতে শুরু করিবে। উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি বিরাগভাজন হও, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করিবেন এবং লোকদের নিকট রক্ষিত ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হইও না। তাহা হইলে লোকেরাও তোমাকে পছন্দ করিবে। — তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা আল্লাহ ও মানুষের নিকট প্রিয়পাত্র হওয়ার উপায় জানিতে চাহিলে নবী করীম (স) একটি উত্তর দান করেন এবং সেই উত্তর এই যে, দুনিয়া সম্পর্কে বিরাগী হইলে দুনিয়ার প্রতি লোভী না হইলে আল্লাহ তাহাকে ভালবাসিবেন এবং ধন-সম্পদের লোভী না হইলে মানুষ ভালবাসিবে অর্থাৎ আল্লাহ ও মানুষের ভালবাসা লাভ করিতে হইলে দুনিয়ার সম্পর্কে বিরাগী হইতে হইবে। বস্তুত মানুষের মধ্যে আকৃষ্ট হওয়ার যে প্রবণতা রহিয়াছে, তাহাকে দুইটি দিকের মধ্যে যে কোন একটি দিকে পরিচালিত করা যাইতে পারে। হয় তাহা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করিতে হইবে; অন্যথায় তাহা দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। আর উহাকে যদি আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করিতে হয় তবে দুনিয়ার সম্পর্কে বিরাগ পোষণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়া যাইবে; মানুষও তাহাকে শ্রদ্ধা করিবে। আর আল্লাহ্‌র দিকে রুজু না হইয়া তাহা দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে আল্লাহ্‌র সন্তোস লাভ করা সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয়ত, কেহ যদি দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভে পড়িয়া কেবল তাহা হাসিল করিবার জন্যই চেষ্টিত হয়, তাহা হইলে লোকেরা তাহাকে লোভী মনে করিয়া ঘৃণা করিবে। তাহাকে বলিবে অর্থগৃধ্নু। ফলে মানুষের নিকট একবিন্দু সম্মান লাভ করা সম্ভব হইবে না। আর আল্লাহ্‌র নিকট ঘৃণিত হওয়ারও ইহাই কারণ।

রাসূলের এই দুইটি কথা মূলত একটি কথারই এ-পীঠ ও-পীঠ। আসলে কথা একটিই এবং তাহা এই যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দিকেই মনের সব লক্ষ্য ও ঝোঁক-প্রবণতা আরোপ করিতে হইবে। এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভী হওয়া উচিত হইবে না। তাহা হইলে আল্লাহ্‌ ও জনগণ সকলের নিকটই সম্মানিত হইতে পারিবে। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার মাল-মাত্তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে দুনিয়া হয়ত লাভ হইবে কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও জনগণের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করা সম্ভব হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী

মূল হাদীস গ্রন্থ

১. সহীহ আল-বুখারী
২. সহীহ মুসলিম
৩. মুসনাদে আহমাদ
৪. আবূ দাউদ
৫. ইবনে মাজাহ
৬. দারে কুতনী
৭. তিরমিযী
৮. নাসায়ী
৯. বায়হাকী
১০. শারহুস সুন্নাহ
১১. দারেমী
১২. মুস্তাদরাক হাকেম
১৩. তাবারানী
১৪. মু'জিমুস সগীর
১৫. রিয়াযুস সালেহীন
১৬. আল-আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যার সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. উমদাতুলকারী— আইনী-শরহিল বুখারী
২. আল-ফাতহুর-রাব্বানী, বুলুগুল আমানী শরহি মুসনাদে আহমাদ
৩. মায়ালিস-সুনান-শরহিল আবূ দাউদ
৪. নাইলুল আওতার— শরহি মুনতাকাল আখবার
৫. নববী— শরহি মুসলিম
৬. মুফরাদাতে রাগিব ইসফাহানী
৭. তুহফাতুল আহওয়াজী— শরহি তিরমিযী
৮. বযলুল মজহুদ— শরহিল আবূ দাউদ
৯. ফতুহুল বারী— শরহিল বুখারী
১০. আল-মিরকাত— শরহিল মিশকাত
১১. আত-তা'লী কুস-সবীহ— শরহিল মিশকাত
১২. ফতহুল মুবদী— শরহি মুখতাসার বুখারী

রাসূলে করীম (স.) বলিয়াছেন :
আল্লাহ্ তা'আলা সেই লোকের
মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত
করিবেন, চির সবুজ চির তাজা
করিয়া রাখিবেন, যে আমার
কথা শুনিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিবে
কিংবা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত
রাখিবে এবং অপর লোকের
নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবে।
জ্ঞানের বহু ধারকই প্রকৃত জ্ঞানী
নহে, তবে জ্ঞানের বহু ধারক
উহা এমন ব্যক্তির নিকট
পৌঁছাইয়া দেয়, যে তাহার
অপেক্ষা অধিক সমঝদার।
—আবূ দাঊদ
খায়রুন প্রকাশনী